কলেজ বার্ষিকী-২০১৪

College Magazine-2014

সন্দীপন

Sandipon

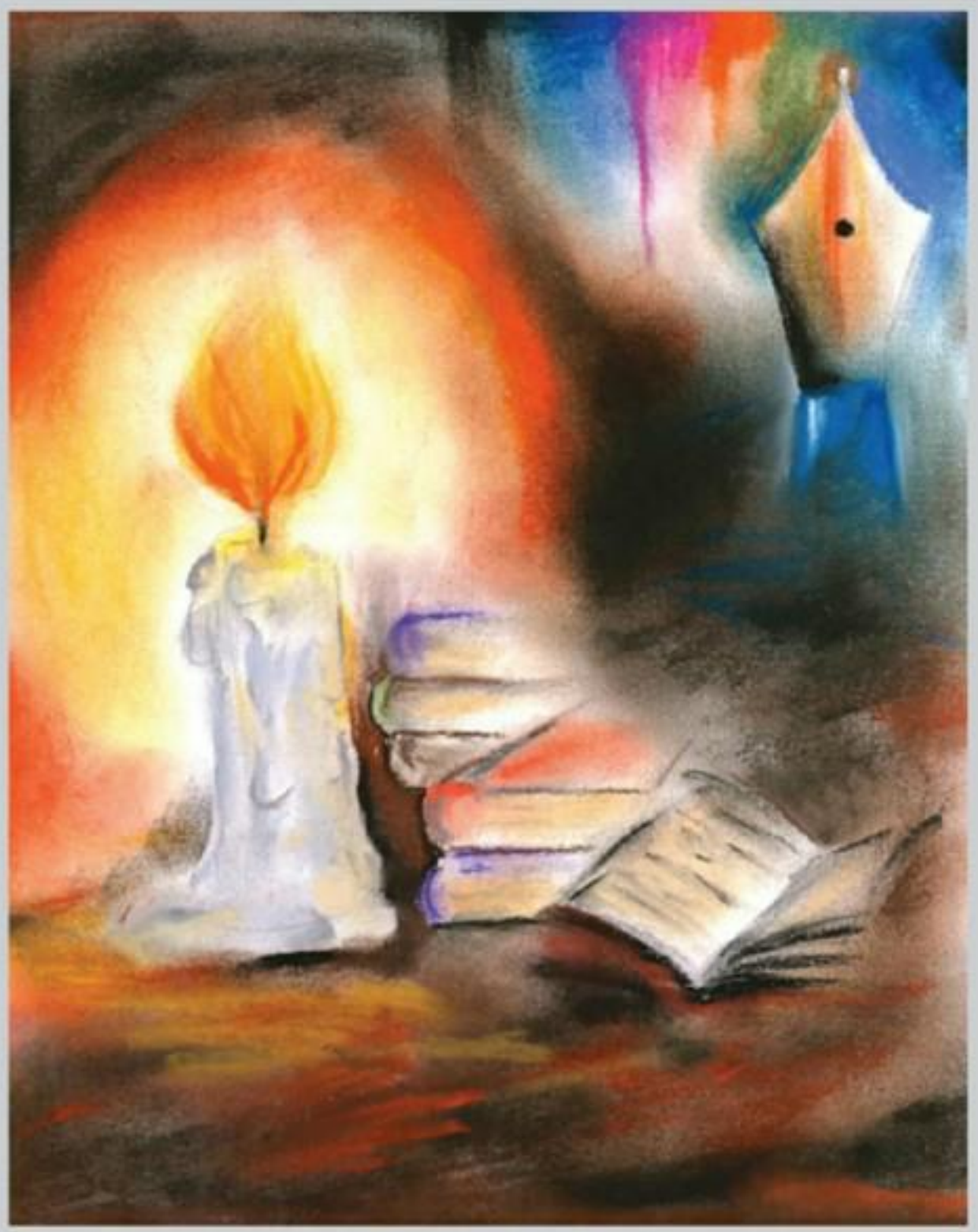

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

Dhaka Residential Model College

www.drmc.edu.bd

কলেজের পরীক্ষার ফলাফল অন-লাইনে প্রকাশে অভিভূত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়

"লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা" অংশগ্রহণে ব্রত কলেজের ছাত্রবৃন্দ

সন্দীপন

১৯৬০

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

www.drmc.edu.bd

পৃষ্ঠপোষক :

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামান সুবহানী
অধ্যক্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

সুলতান উদ্দিন আহমেদ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতী-সিনিয়র শাখা
ফেরদৌস আরা বেগম, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা
ইরশাদ আহমেদ শাহীন, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতী-জুনিয়র শাখা
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

বার্ষিকী সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ - ২০১৪

ড. সৈয়দা খালেদা জাহান, সহযোগী অধ্যাপক
মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
মোঃ মেসবাউল হক, সহকারী অধ্যাপক
রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক
মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক
রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ জাহেদুল হক, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী অধ্যাপক
মশিউর রহমান, প্রভাষক
তারেক আহমেদ, প্রভাষক
তামান্না আরা, প্রভাষক
সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী, প্রদর্শক
মাস্টার আল ইমরান অপু, দ্বাদশ শ্রেণি, প্রভাতী শাখা
মাস্টার মেঘ মল্লার বসু, দ্বাদশ শ্রেণি, দিবা শাখা

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ন	:	মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাহেদুল হক, সহকারী অধ্যাপক মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী অধ্যাপক মশিউর রহমান, প্রভাষক তারেক আহমেদ, প্রভাষক তামান্না আরা, প্রভাষক
প্রচ্ছদ	:	মুশফিকুল আলম অঙ্কুর, একাদশ শ্রেণি, শাখা-ঘ, কলেজ নম্বর-৪২২৪
আলোকচিত্র	:	মোঃ জাহেদুল হক, সহকারী অধ্যাপক
কম্পিউটার কম্পোজ	:	রোকেয়া আকতার, অফিস সহকারী হাসিনা খাতুন, অফিস সহকারী
প্রকাশকাল	:	নভেম্বর, ২০১৪
ডিজাইন	:	নির্ঝর (বিপুল)
মুদ্রণে	:	জে এম প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ফোন : ০১৮১৮-২৬৭০৫০, ০১৯২৭-৩৮৪৫০৫ ই-মেইল : jmprinting_70@yahoo.com alphaamin_70@yahoo.com

অধ্যক্ষ ও সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতির বাণী

জাতি গঠনে সুশিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা সকল প্রকার পশ্চাৎপদতা ও অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে পরিশীলিত মানুষ হতে সহায়তা করে। শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম বিদ্যার্থীকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বার্ষিকী **'সন্দীপন'** প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অঙ্কুরিত প্রতিভা বিকাশের জন্য কলেজের এ প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই।

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অপূর্ব মেলবন্ধনের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিক তৈরিতে **'সন্দীপন'** বিদ্যার্থীর বোধিসত্তার উন্মোচন ও আত্মজাগরণের হাতিয়ার হিসেবে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা সুপ্তমনের গভীর অনুরাগ আর সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে হয়ে ওঠবে আলোকিত মানুষ। প্রতিভা বিকাশে অগ্রগামী ভবিষ্যতের এ আলোকিত মানুষদের প্রতি রইল আমার অভিনন্দন ও প্রীতিময় শুভেচ্ছা।

'সন্দীপন' প্রকাশের সাথে অধ্যক্ষসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ও নিবেদিত সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

সাহিত্য জীবন অনুষঙ্গী। জীবনের যা কিছু সুন্দর তার প্রতিফলন সাহিত্যে একান্ত কাম্য। শিক্ষাজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা কোমলমতি শিক্ষার্থীর মনকে করে স্নিগ্ধ, বিকাশ ঘটে তাদের মেধা, মনন ও চিন্তার। বার্ষিকীর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় এই স্বাপ্নিক শিক্ষার্থীরা স্বপ্নের জাল বিস্তার করে এবং তারা হয়ে ওঠে কর্মচঞ্চল ও আত্মপ্রত্যয়ী। কল্পনার বিমূর্ত জগৎকে তারা শব্দ, ছন্দ ও ভাষা দিয়ে মূর্ত করে তোলে। সাহিত্যচর্চার ফলে শিক্ষার্থীরা সুন্দরকে জানতে শেখে, সুন্দরকে ভালোবেসে সুন্দরের মধ্যে বেড়ে ওঠে। এ প্রত্যয়কে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রতিবারের ন্যায় এবারও **'সন্দীপন'** প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে মুখর এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের পরিশুদ্ধ আবেগের প্রতিফলন ঘটাবে এ বার্ষিকীতে। এ ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই হয়ত বেরিয়ে আসবে ভাবী সাহিত্যিক- ডাকসাইটে লিখিয়ে।

যাদের লেখনী, শ্রম, নিষ্ঠা ও চিন্তায় **'সন্দীপন'** পূর্ণতা পেয়েছে তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

মোঃ আসাদুজ্জামান সুবহানী
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সম্পাদকীয়

নাই রাত
মুখ হাত
ধোও খুকু জাগোরে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠা ছোট্ট শিশুটি মাত্র তিন বছর বয়সে স্কুল ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে কিন্ডারগার্টেনে যায়। সেই থেকে শহরের নামকরা বিদ্যাপীঠে ভর্তির মানসে শুরু হয়ে যায় তার জীবন যুদ্ধ। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ যেমন দিন দিন বাড়ছে তেমনি আত্মিক বিকাশের সুযোগও যেন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে।

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঘনসবুজ বৃক্ষসুশোভিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ অর্ধশতক ধরে জাতিকে উপহার দিয়ে আসছে শত শত সৃজনশীল মেধাবী মানুষ। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি সুকুমারবৃত্তি চর্চারও অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তাই শিশু-কিশোর-তরুণ লেখকদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষে প্রতি বছর প্রকাশিত হয় কলেজ বার্ষিকী **'সন্দীপন'**।

'সন্দীপন' শুধু ছাত্রদের সাহিত্য চর্চার মাধ্যম নয় বরং এতে সন্নিবেশিত বর্ষব্যাপী সংঘটিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততার সচিত্র বিবরণ। পরিবেশিত হয়েছে শিক্ষা, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম, আন্তঃহাউস, আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার সাফল্য ও গৌরবময় সুসংবাদ।

পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও শিক্ষকগণ তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ লেখা দিয়ে পত্রিকার সৌকর্যবর্ধনে সহায়তা করেছেন। তাদের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

'সন্দীপন' প্রকাশের অন্তরালে নিরন্তর প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে কলেজের অধ্যক্ষ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান সুবহানীর পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বক্ষণিক নির্দেশনা। বার্ষিকী কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা, কম্পিউটারকর্মীদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্ঠার ফসল **'সন্দীপন'**। তাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. সৈয়দা খালেদা জাহান
সহযোগী অধ্যাপক
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

বোর্ড অব গভর্নরস এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ নং	সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী
১।	**মো. নজরুল ইসলাম খান,** সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	- চেয়ারম্যান
২।	**শাহাবুদ্দিন আহমেদ,** অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	- সদস্য
৩।	**প্রফেসর ফাহিমা খাতুন,** মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	- সদস্য
৪।	**প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ,** চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা	- সদস্য
৫।	**কাজী রওশন আক্তার,** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	- সদস্য
৬।	**মোঃ আবু সাঈদ শেখ,** সচিব (যুগ্ম-সচিব), ঢাকা নর্থ সিটি করপোরেশন ও অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রভাতী শাখা)	- সদস্য
৭।	**ড. এম নিয়ামুল নাসের,** অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)	- সদস্য
৮।	**মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার,** সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতী শাখায় কর্মরত)	- সদস্য
৯।	**মোঃ বাকাবিল্লাহ,** সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখায় কর্মরত)	- সদস্য
১০।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামান সুবহানী,** অধ্যক্ষ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	- সদস্য সচিব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

শিক্ষকবৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ আসাদুজ্জামান সুবহানী
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষ

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
প্রভাতী-সিনিয়র শাখা

ফেরদৌস আরা বেগম
দিবা-সিনিয়র শাখা

ইরশাদ আহমেদ শাহীন
প্রভাতী-জুনিয়র শাখা

মোঃ নজরুল ইসলাম
দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ খালেদুর রহমান
হিসাববিজ্ঞান

মোঃ আব্দুল লতিফ
গণিত

নিশাত হাসান
ইংরেজি

মোঃ মনজুরুল হক
গণিত

ড. মোঃ নূরুন নবী
ইংরেজি

জেহিন বেগম
বাংলা

আসমা বেগম
প্রাণিবিদ্যা

ফাতেমা জোহরা
ইসলাম শিক্ষা

ড. সৈয়দা খালেদা জাহান
বাংলা

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত

রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান

মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান

সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা

জে এম আরিফুর রহমান
রসায়ন

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
শারীরিক শিক্ষা

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারু

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারু

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস

অনাদি নাথ মণ্ডল
গণিত

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটার শিক্ষা

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়ন

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গণিত

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা

আসাদুল হক
ইংরেজি

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলাম শিক্ষা

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়ন

খোদেজা বেগম
অর্থনীতি

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা

নার্গিস জাহান কনক
উদ্ভিদবিদ্যা

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা

ফাতেমা নূর
ইংরেজি

নুরু ন্নাহার
চারু ও কারু

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি

প্রভাষক

মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল

শাবরিনা শরমিন
ভূগোল

এ কে এম বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান

খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ ফারুক হোসেন
রসায়ন

মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
রসায়ন

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা

মুহাম্মদ আব্দুলাহ আল-মামুন
ইসলাম শিক্ষা

মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়ন

অসীম কুমার দাস
ভূগোল

দেওয়ান শামছুদ্দোহা
ইংরেজি

মোঃ শামসুজ্জোহা
শারীরিক শিক্ষা

জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নুরুল ইসলাম
কৃষিশিক্ষা

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিশিক্ষা

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষিশিক্ষা

মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলাম শিক্ষা

মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত

হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলা

মোঃ হিসাব আলী
গণিত

মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত

মোঃ শফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা

মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান

জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান

মোঃ সাইফুল ইসলাম
বাংলা

মশিউর রহমান
বাংলা

মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলাম শিক্ষা

মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলাম শিক্ষা

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষি শিক্ষা

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান

রাসেল আহমেদ
কম্পিউটার শিক্ষা

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়ন

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল

আবদুল কুদ্দুস
যুক্তিবিদ্যা

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
ইংরেজি

হরি পদ দেবনাথ
রসায়ন

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা

আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটার শিক্ষা

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি

মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটার

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়ন

মোঃ খলিল মিয়া পাঠান
রসায়ন

ওমর ফারুক
গণিত

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক
গণিত

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা

মোঃ আবু সালেহ
গণিত

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
ইংরেজি

তারেক আহমেদ
বাংলা

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি

তামান্না আরা
বাংলা

সহকারী শিক্ষক ও প্রদর্শকবৃন্দ

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ইসলাম শিক্ষা

আব্দুল মোমেন খান
প্রদর্শক,ভূগোল

মোঃ ছানাউল হক
প্রদর্শক, জীববিদ্যা

মোঃ কামাল হোসেন
প্রদর্শক, কম্পিউটার শিক্ষা

ভারত চন্দ্র গৌড়
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
প্রদর্শক, কম্পিউটার শিক্ষা

মোঃ ফোরকান
প্রদর্শক, রসায়ন

ফারহানা আক্তার
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

পরেশ চন্দ্র রায়
প্রদর্শক, গণিত

ওয়াহিদা সুলতানা
প্রদর্শক, ভূগোল

মোঃ রমজান আলী
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

প্রণব হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক, হিন্দু ধর্ম

বর্নালী ঘোষ
সহকারী শিক্ষক, সঙ্গীত

মোঃ তাজ-আল তানভীর
প্রদর্শক, রসায়ন

অধ্যক্ষ ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ

অধ্যক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নামের তালিকা

প্রশাসন শাখা

১.	নিয়াজ আব্দুলাহ্	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২.	রওশন আরা বেগম	পি.এ টু প্রিন্সিপাল
৩.	মোসাম্মৎ তহমিনা খানম	প্রধান সহকারী
৪.	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	উচ্চমান সহকারী
৫.	মোঃ সানাউলাহ	উচ্চমান সহকারী
৬.	আব্দুর রহিম	উচ্চমান সহকারী
৭.	ফারহানা আফরোজ	অফিস সহকারী
৮.	মোঃ মহসিন আলম	অফিস সহকারী
৯.	হাসিনা খাতুন	অফিস সহকারী
১০.	আল-মামুন	অফিস সহকারী
১১.	হেমায়েত হোসেন	এমএলএসএস

মেডিকেল

২৩.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মেডিকেল অফিসার
২৪.	মোঃ রবিউল ইসলাম	ফার্মাসিষ্ট
২৫.	মেথিউ রবীন্দ্র মুহুরী	নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট
২৬.	আবদুস সালাম মিয়া	নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট
২৭.	মোসাম্মৎ লাইলী আক্তার	সুইপার (মেডিকেল)
২৮.	আকলিমা বেগম	সুইপার (মেডিকেল)

স্টোর শাখা

৩৪.	মোঃ অছিউর রহমান	সহকারী স্টোর কর্মকর্তা
৩৫.	সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ	স্টোর কিপার
৩৬.	মোঃ সুহেল রানা	স্টোর এ্যাসিসটেন্ট
৩৭.	মোঃ মোকলেচুর রহমান	স্টোর অর্ডারলি

হাউস

৩৮.	রওশন আরা সাথী	মেট্রন
৩৯.	মুনিরা বেগম	মেট্রন
৪০.	মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার	স্টুয়ার্ড
৪১.	মোহাম্মদ লোকমান হোসেন	স্টুয়ার্ড
৪২.	দিলীপ কুমার পাল	স্টুয়ার্ড

হিসাব শাখা

১২.	মোহাম্মদ মশিউর রহমান	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১৩.	ফরিদ আহমেদ	সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১৪.	মোঃ আমীর সোহেল	সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১৫.	আব্দুলাহ মুর্শিদ	হিসাব রক্ষক
১৬.	তানজিম হাসান	হিসাব রক্ষক
১৭.	মুহাম্মদ শহিদুর রহমান	অফিস সহকারী
১৮.	মোঃ খাইরুল ইসলাম	হিসাব সহকারী
১৯.	হাবিবুর রহমান	হিসাব সহকারী
২০.	মোঃ শহীদুল ইসলাম	হিসাব সহকারী
২১.	রিপন মিয়া	হিসাব সহকারী
২২.	মোঃ খালেদ পারভেজ	এমএলএসএস

লাইব্রেরি, টেক্সটবুক ও স্টেশনারী শাখা

২৯.	মোঃ মতিয়ার রহমান	সহঃ লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার
৩০.	মোঃ আফজাল হোসেন	টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড (স্টেশনারি)
৩১.	মোঃ আহসানুল হক	টেক্সটবুক বেয়ারার (স্টেশনারী)
৩২.	মোঃ লিটন মিয়া	লাইব্রেরি এটেনডেন্ট
৩৩.	মোঃ আবু সায়েদ	লাইব্রেরি এটেনডেন্ট

হাউস

৪৩.	আবু সাইদ	বাবুর্চি
৪৪.	মোঃ ইয়ার আলী	বাবুর্চি
৪৫.	মোঃ আব্দুর রশিদ	বাবুর্চি
৪৬.	মোঃ আব্দুল জলিল	বাবুর্চি
৪৭.	মোঃ মোস্তফা	সহকারী বাবুর্চি
৪৮.	মোঃ কামাল হোসেন	সহকারী বাবুর্চি
৪৯.	মোঃ নূরুল ইসলাম	সহকারী বাবুর্চি
৫০.	মোঃ আবজাল হোসেন	সহকারী বাবুর্চি
৫১.	মোঃ আব্বাস আলী	সহকারী বাবুর্চি
৫২.	মোঃ সোহরাব হোসেন	সহকারী বাবুর্চি
৫৩	মোঃ আবু সাঈদ মোলা	হাউস মালি

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নামের তালিকা

হাউস

৫৪. মোঃ শহীদুল ইসলাম	হাউস মালি
৫৫. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন	হাউস মালি
৫৬. মোঃ নাসির উদ্দিন	হাউস মালি
৫৭. মোঃ রহমত উলাহ	মেট
৫৮. মোঃ শহীদুল ইসলাম	মেট
৫৯. মোহাম্মদ বদিউর রহমান	মেট
৬০. মোঃ নূরে আলম সিকদার	মেট
৬১. মোঃ মহিরুল হক	মেট
৬২. মোঃ সাইফুল ইসলাম (মহিউদ্দিন)	মেট
৬৩. মোঃ আমজাদ হোসেন	টেবিলবয়
৬৪. মোঃ রহমত উলাহ	টেবিলবয়
৬৫. মোঃ শাহজাহান প্রধানিয়া	টেবিলবয়
৬৬. আমিনুল হক	টেবিলবয়
৬৭. মোঃ জাকির হোসেন মনু	টেবিলবয়
৬৮. মোঃ সেলিম	টেবিলবয়
৬৯. মোঃ আমিনুল ইসলাম	টেবিলবয়
৭০. গাজী মস্তফা কামাল	টেবিলবয়
৭১. মোঃ মোকছেদুল হক	টেবিলবয়
৭২. মোঃ আব্দুল বাছেদ	টেবিলবয়
৭৩. মোঃ আব্দুলাহ	টেবিলবয়
৭৪. আকিবুল ইসলাম	টেবিলবয়
৭৫. মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম	টেবিলবয়
৭৬. সেলিম মিয়া	টেবিলবয়
৭৭. মোঃ জাকির হোসেন	ওয়ার্ডবয়
৭৮. মোহাম্মদ শফিকুর রহমান	ওয়ার্ডবয়
৭৯. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন	ওয়ার্ডবয়
৮০. মোহাম্মদ শাহ আজিজুল হক	ওয়ার্ডবয়
৮১. মোঃ মজিবুর রহমান	ওয়ার্ডবয়
৮২. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	ওয়ার্ডবয়
৮৩. মোঃ আল-আমিন খোন্দকার	ওয়ার্ডবয়
৮৪. মোঃ সাহাদাত হোসেন	ওয়ার্ডবয়

হাউস

৮৫. আবদুল জলিল মিয়া	ওয়ার্ডবয়
৮৬. দৌলত আলী	হাউস গার্ড
৮৭. মোঃ আছাদুজ্জামান হাওলাদার	হাউস গার্ড
৮৮. মোঃ গোলাম মোস্তফা	হাউস গার্ড
৮৯. মোঃ আবদুল হক	হাউস গার্ড
৯০. মোঃ আব্দুর রহমান	হাউস গার্ড
৯১. মোঃ শহিদুজ্জামান	হাউস গার্ড
৯২. মোঃ রাসেল বেপারী	হাউস গার্ড
৯৩. মোসাম্মাৎ জরিনা খাতুন	আয়া
৯৪. মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বাবু	হোস্টেল সুইপার
৯৫. মোসাম্মৎ শিউলি আক্তার	হোস্টেল সুইপার
৯৬. এ জেড এম মাইনুল আকবর	হোস্টেল সুইপার
৯৭. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	হোস্টেল সুইপার

একাডেমিক শাখা

৯৮. মোছাঃ রোকেয়া আখতার	অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর
৯৯. মোঃ হারুন-অর-রশীদ	ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট
১০০. মোঃ মোতালেব	ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট
১০১. মোঃ জাকির হোসেন	ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট
১০২. মোঃ রুস্তম আলী	এমএলএসএস
১০৩. মোঃ আবুল কালাম	এমএলএসএস
১০৪. আব্দুল মালেক দেওয়ান	এমএলএসএস
১০৫. মোহাম্মদ আলী খান	এমএলএসএস
১০৬. মোঃ খলিলুর রহমান	এমএলএসএস
১০৭. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	এমএলএসএস
১০৮. মোঃ জিন্নাহ	এমএলএসএস
১০৯. মোঃ মঞ্জুরুল হক	এমএলএসএস
১১০. মোঃ আব্দুর রশিদ	এমএলএসএস
১১১. মোঃ দেলোয়ার হোসেন	এমএলএসএস
১১২. মোঃ আব্দুল কাদের	এমএলএসএস
১১৩. মোঃ আব্দুর রশিদ শেখ	এমএলএসএস

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নামের তালিকা

একাডেমিক শাখা

১১৪.	মোঃ আব্দুল কাদের	এমএলএসএস
১১৫.	মোঃ হানিফ	সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২
১১৬.	মোঃ স্বপন হোসেন	সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২
১১৭.	মোঃ রিপন আলী	সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২
১১৮.	জীবন কুমার মালাকার	সুইপার, একাডেমিক ভবন-১,২

গ্রাউন্ড শাখা

১১৯.	মোঃ মঈনুল হাসান	গ্রাউন্ডস সুপারিনটেনডেন্ট
১২০.	মোঃ ফারুকুল ইসলাম হাওলাদার	মালি (সেন্ট্রাল)
১২১.	মোঃ মনির হোসেন	মালি (সেন্ট্রাল)
১২২.	মোঃ মন্টু মোলা	মালি (সেন্ট্রাল)
১২৩.	মোঃ আজমল হোসেন	গ্রাউন্ডসম্যান
১২৪.	মোঃ শহিদুল ইসলাম	গ্রাউন্ডসম্যান
১২৫.	মোঃ শামীম মিজি	গ্রাউন্ডসম্যান
১২৬.	মোঃ জাহিরুল ইসলাম	গ্রাউন্ডসম্যান
১২৭.	মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)	গ্রাউন্ডসম্যান
১২৮.	মুহাম্মদ শরীফ হোসেন	গ্রাউন্ডসম্যান

নিরাপত্তা শাখা

১২৯.	মোঃ জুলফিকার আলী ভূট্টো	কেয়ারটেকার
১৩০.	মোঃ নজরুল ইসলাম	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩১.	মোঃ কুদ্দুস মোলা	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩২.	খোন্দকার আমিনুল ইসলাম	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৩.	মোঃ আনোয়ারুল হক	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৪.	মোঃ মোকছেদ আলী খাঁ	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৫.	মোঃ কামাল হোসেন	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৬.	মোঃ ফারুক সিকদার	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৭.	মোঃ জহুরুল ইসলাম সেখ	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৮.	মোঃ জালাল উদ্দিন	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৩৯.	মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁন	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৪০.	মোঃ সুমন মিয়া	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৪১.	মোঃ নবীজল ইসলাম	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)

নিরাপত্তা শাখা

১৪২.	মোঃ রাসেল আলী	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৪৩.	মোঃ খলিলুর রহমান	নাইট গার্ড (সেন্ট্রাল)
১৪৪.	মোঃ রেজাউল ইসলাম	গেইট দারোয়ান
১৪৫.	মোহাম্মদ মজিবুর রহমান	গেইট দারোয়ান
১৪৬.	হাফিজ মোলা	গেইট দারোয়ান
১৪৭.	শ্রী সাম্বিয়া	সুইপার (সেন্ট্রাল)
১৪৮.	মোঃ ইউনুস	সুইপার (সেন্ট্রাল)
১৪৯.	মোঃ আইয়ুব আলী	সুইপার (সেন্ট্রাল)
১৫০.	শ্রী কৃষান দাস	সুইপার (সেন্ট্রাল)
১৫১.	তিমথী পেনাপেলী (সবুজ)	সুইপার (সেন্ট্রাল)

মেইনটেনেস শাখা

১৫২.	মোঃ চাঁদ মিয়া	পাম্বার
১৫৩.	মোঃ ছাদেক আলী	কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী)
১৫৪.	মোঃ ছাবেদ আলী	পেইন্টার (রং মিস্ত্রী)
১৫৫.	মোঃ মমতাজ উদ্দিন মজুমদার	সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান
১৫৬.	মোঃ আব্দুল মবিন	সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান
১৫৭.	নূর মোহাম্মদ কাজল	সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান
১৫৮.	নাছির উদ্দিন আহমেদ	ওয়্যারম্যান
১৫৯.	মোঃ ওসমান আলী	ওয়্যারম্যান
১৬০.	মোঃ মফিজুল ইসলাম	ওয়্যারম্যান
১৬১.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	পাম্প অপারেটর
১৬২.	মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার	পাম্বার হেল্পার
১৬৩.	মোঃ রেজাউল আলম খান	মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেল্পার

এমটি শাখা

১৬৪.	মোঃ আব্দুল খালেক	ড্রাইভার (লাইট)
১৬৫.	শহীদ উল্যাহ	ড্রাইভার (লাইট)

সূচিপত্র

বিষয়-শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১। হাউজ প্রতিবেদন	২১
২। টিচার্স কর্নার	২৭
৩। গল্প ও প্রবন্ধ	৫৭
৪। ছড়া ও কবিতা	৯১
৫। ধাঁধা, কৌতুক, সাধারণজ্ঞান ও জানা-অজানা	১০১
৬। ইংলিশ সেকশন	১১১
৭। স্মৃতির এ্যালবাম	১৩৫
৮। আর্ট গ্যালারি	১৪৮
৯। কোলাজ	১৫১

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার
আসমা বেগম

হাউস টিউটর
আসাদুল হক

হাউস এন্ডার
আবদুলাহ আবু ওসামা

হাউস প্রিফেক্ট
এস এম হাসান শফি

প্রতিষ্ঠানের প্রথম হাউস হল কুদরত-ই-খুদা হাউস। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এ হাউসের প্রথম নাম ছিল 'জিন্নাহ হাউস'। স্বাধীনতার পর এ হাউসের নামকরণ করা হয় '১ নম্বর হাউস' এবং পরবর্তীতে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামানুসারে এ হাউসটির নামকরণ করা হয় 'কুদরত-ই-খুদা হাউস'। শুরুতে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করত এ হাউসে। বর্তমানে এ হাউসে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। কুদরত-ই-খুদা হাউসের অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। হাউসের অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির অপরূপ মোহনীয় একটি বাগান। হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর এর বাসগৃহ। এছাড়াও হাউস পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন ১ জন মেট্রন, ২ জন বাবুর্চি, ১ জন ম্যাট, ২ জন ওয়ার্ডবয়, ২ জন টেবিলবয়, ১ জন দারোয়ান, ১ জন মালি ও ১ জন সুইপার। ছাত্রদের মাঝে নের্তৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতি চর্চা, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বিকশিত করার জন্য রয়েছে ১০ জন ছাত্র-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

পড়াশুনা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্রদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ২০১৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র এ পাস (A^+) পেয়েছে এবং জে.এস.সি. পরীক্ষায় ৩২ জনের মধ্যে ২৮ জন এ পাস (A^+) পেয়েছে। তাছাড়া বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস ২০১১ সাল থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে। উলেখ্য, ২০১২ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রেকর্ড পরিমাণ পয়েন্ট নিয়ে(৮৪ পয়েন্ট) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ হাউস সাম্প্রতিককালে ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়। আন্তঃহাউস মঞ্চ প্রতিযোগিতায়ও এ হাউসের সাফল্য অসাধারণ।

সকলের সার্বিক সহযোগিতার সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

জয়নুল আবেদিন হাউস

হাউস মাস্টার
ফাতেমা জোহরা

হাউস টিউটর
সামীয়া সুলতানা

হাউস এন্ডার
সায়েম হোসেন এজাজ

হাউস প্রিফেক্ট
মোঃ আব্দুল কাহ্হার
সিদ্দিকী অঙ্কুর

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসকে বলা হয় ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তার মধ্যে অন্যতম জয়নুল আবেদিন হাউস। এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৬১ সালের ১লা মে থেকে 'আইয়ুব হাউস' নামে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের মহান শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এর নামানুসারে-এর নামকরণ করা হয়।

লাল সিরামিক ইটের দোতলা এ হাউসটি দেখতে অত্যন্ত মনোরম। বর্তমানে প্রায় ১১০ জন ছাত্র হাউসটিতে অবস্থান করছে। এখানে ছাত্রদের থাকার জন্য রয়েছে বিভিন্ন নামের আটটি বড় সেকশন বা ডরমিটরি এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য শ্রেণি ভিত্তিক চারটি বিশেষ কক্ষ। এখানে আরো রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধাসহ একটি কমনরুম, একটি প্রেয়াররুম বা নামাজ ঘর এবং নানা জাতের দেশি-বিদেশি ফুলে ভরা একটি চমৎকার বাগান।

ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটরের বাসভবন। এছাড়া রয়েছে দশজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী এবং একজন মেট্রন। কর্মচারীদের প্রায় সবাই হাউসে বাস করে। শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনার জন্য ছাত্রদের মধ্য থেকে গঠন করা হয়েছে নয় সদস্যের একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়ায় এ হাউসের ছাত্রদের ধারাবাহিক সাফল্য লক্ষণীয়। ২০১২ সালের জে.এস.সি. পরীক্ষায় এ হাউসের চারজন ছাত্র এবং ২০১৩ সালের জে.এস.সি. পরীক্ষায় একজন ছাত্র বৃত্তি লাভ করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে জয়নুল আবেদিন হাউসের ছাত্রদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৩ সালে আন্তঃহাউস ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস বির্তক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

'কর্মভার-নবপ্রভাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান।'

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাস্টার
মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার

হাউস টিউটর
মোঃ নুরুল ইসলাম

হাউস এন্ডার
মোঃ কামরান চৌধুরী

হাউস প্রিফেক্ট
রিদওয়ান আহমেদ রূপক

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যের প্রতিভূ ফজলুল হক হাউসে বর্তমানে প্রায় ১১৬ জন ছাত্র অবস্থান করছে। হাউসে রয়েছে ছোট বড় আটাশটি রুম। রয়েছে কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিং রুম।

হাউসে ছাত্রদের দেখাশোনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর, একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালী ও বাবুর্চিসহ অন্যান্য-কর্মচারী। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপ'-এ সংস্কৃত শোকে এই হাউসের ছাত্ররা মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রই A^+ অর্জন করে থাকে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় এই হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রেকর্ড পরিমাণ পয়েন্টের ব্যবধানে এই হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়াও আন্তঃহাউস দলীয় নাটক প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হওয়া সহ ফুটবল, ভলিবল ও ইনডোর গেম প্রতিযোগিতাতেও অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার
জে এম আরিফুর রহমান

হাউস টিউটর
মুহাম্মদ ওমর ফারুক

হাউস এন্ডার
অসীম ফাইয়াজ

হাউস প্রিফেক্ট
শাহরিয়ার প্রান্ত

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবাসিক ছাত্রদের জন্য এখানে ছয়টি হাউস আছে। হাউসগুলোর মধ্যে 'নজরুল ইসলাম হাউস' অন্যতম। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে এ হাউসের সকল ছাত্র তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাঁর গুণাবলি নিজেদের মধ্যে বিকশিত করার স্বপ্ন দেখে। নজরুল ইসলাম হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর, একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালী ও বাবুর্চিসহ অন্যান্য কর্মচারী। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় এ হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভোরবেলার পিটি থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সকল কাজই হাউসের ছেলেরা রুটিন মাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। তাই দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফলও হয় প্রশংসনীয়। এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষাতেও এ হাউসের ছাত্ররা প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে।

৫৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০১৪, আন্তঃহাউস ফুটবল-২০১৪, আন্তঃহাউস কুইজ ও ইংরেজি বানান প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৪ ও দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতাতে এ হাউস রানার্স আপ হয়। উলেখ্য ২০১০ সালে কলেজের ৫০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং তিনি এ হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন।

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্ররা হাউসের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে কঠোর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে। বিদ্রোহী কবির আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত এবং উজ্জীবিত।

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার
শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী

হাউস টিউটর
জি এম এনায়েত আলী

হাউস এন্ডার
আল ইমরান অপু

হাউস প্রিফেক্ট
ফরহাদ গাজী

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ছয়টি সুবৃহৎ ছাত্রাবাস - যেগুলো হাউস নামে পরিচিত। লালন শাহ হাউস সেগুলোর অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত লালন শাহ্ হাউসের ভবনটি কলেজের মেডিকেল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৯৭৭ সাল থেকে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি ৩ নম্বর হাউস নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক লালন শাহ্ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ্ হাউস'।

পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বিত ও প্রকৃতি- পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ্ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষাভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের জন্য রয়েছে ২৯টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১০২ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই অবস্থান করে এ হাউসে। ছাত্রদের বসবাসের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে ১টি অফিসরুম, কমনরুম, ডাইনিংরুম, কিচেন স্টোর, ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আছেন ১ জন হাউস মাস্টার, ১জন হাউস টিউটর, ১ জন স্টুয়ার্ড, ১জন ওয়ার্ডবয়, ১ জন বাবুর্চি, ১ জন সহকারী বাবুর্চি, ১ জন ম্যাট, ২ জন টেবিলবয়, ১ জন মালী, ১ জন দারোয়ান ও ১ জন সুইপার। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন আছে গভীর হৃদ্যতা তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে হাউসের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই A^+ ও A গ্রেড অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা ও চরিত্র গঠনে তারা সদা সচেতন ও আন্তরিক। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে ও লালন শাহ্ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস মঞ্চ প্রতিযোগিতা-২০১৪, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বহিরাঙ্গণ প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। সাধারণজ্ঞান ও দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

হাউস মাস্টার
মোঃ লোকমান হাকিম

হাউস টিউটর
মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা

হাউস টিউটর (বর্ধিত ভবন)
মোঃ খলিল মিয়া পাঠান

হাউস এন্ডার
হাবিবুর রহমান বিজয়

হাউস প্রিফেক্ট
ইফতেখার নূর তামীম

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে এ কলেজের ছয়টি হাউস। চারটি সিনিয়র হাউসের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয় 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস'। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এ হাউসটি একেবারেই নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে ২০ মার্চ ২০০৮ তারিখে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। এ হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত দিবা শাখায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের আবাসন চাহিদা অনুযায়ী হাউসের আসন সংখ্যা একেবারেই সীমিত। গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের বর্ধিতাংশ (যা পুরাতন ব্যাংক ভবন নামে পরিচিত) চালু করা হয়। এ শাখায় মোট আসন সংখ্যা ২৮। এ হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রয়েছেন ১ জন হাউস মাস্টার, ২ জন হাউস টিউটর, ১ জন স্টুয়ার্ড, ২ জন ওয়ার্ডবয়, ১ জন বাবুর্চি, ১ জন সহকারী বাবুর্চী, ১ জন ম্যাট, ২ জন টেবিলবয়, ২ জন দারোয়ান ও ২ জন সুইপার। ছাত্রদের যে কোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য এ হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট।

হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করতে এ হাউসের রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। হাউসের সামনে রয়েছে ফুলবাগান ও একটি সুবিশাল মাঠ, পশ্চিমে একটি আমবাগান ও পেয়ারাবাগান, পূর্বে ফুলবাগান ও পেঁপেবাগান এবং পিছনে রয়েছে আর একটি পেয়ারাবাগান। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায় ও শান্তির আশ্বাস মেলে। এ মনোরম পরিবেশ ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধি করে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ হাউসের ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা, মাটি ও মানুষের ভালোবাসা এবং ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক; এটাই মহান স্রষ্টার কাছে আমাদের প্রত্যাশা। ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পর পর তিন বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

টিচার্স কর্নার

শিক্ষা, সহশিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সাবেরা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার শেরে বাংলা নগরের পাশে ৫০ একর জমির উপর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল (পরবর্তীকালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ) প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করে এবং প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার অর্পণ করে। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। এ সময় এ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে শিক্ষা সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি নতুন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করা হয়। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণনীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট খোলা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ৪৫০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গঠন করা এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সমস্ত শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে অত্র কলেজের শিক্ষা, সহশিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

একাডেমিক কার্যক্রম, ছাত্রদের পাঠোন্নতির নিয়মিত মনিটরিং, প্রাইমারি ও জুনিয়র বৃত্তি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিশেষ শ্রেণিপাঠদানের ব্যবস্থাকরণ, একাধিক মডেল টেস্ট গ্রহণ, ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন প্রভৃতির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রাইমারি ও জুনিয়র বৃত্তি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে। নিম্নে কলেজের বিগত কয়েক বছরের ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হল :

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	জিপিএ-৫	ট্যালেন্টপুল বৃত্তি	সাধারণ বৃত্তি	মোট বৃত্তি
২০১০	২৮৮	২৮৮	২৮৮	-	২৬ জন	০৩ জন	২৯ জন
২০১১	৩০৫	৩০৫	-	২২০	০৭ জন	১০ জন	১৭ জন
২০১২	৩০১	৩০১	-	২৯০	২৯ জন	০১ জন	৩০ জন
২০১৩	৩০১	৩০১	-	৩০০	০৮ জন	০২ জন	১০ জন

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পাশের হার	ট্যালেন্টপুল বৃত্তি	সাধারণ বৃত্তি	ঢাকা বোর্ডে স্থান
২০১০	৩৮৫	৩৮৫	৭৯	১০০%	০৯ জন	০৮ জন	-
২০১১	৪১৪	৪১৪	২১৩	১০০%	১৬ জন	০২ জন	পঞ্চম
২০১২	৪১৬	৪১৬	২৭৯	১০০%	১০ জন	১৭ জন	ষষ্ঠ
২০১৩	৩৯৩	৩৯৩	৩৭৫	১০০%	০৮ জন	১৩ জন	ষষ্ঠ

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পাশের হার	ঢাকা বোর্ডে স্থান
২০১০	৩৭১	৩৭১	৩৩২	১০০%	দ্বিতীয়
২০১১	৩৮৩	৩৮৩	৩৩২	১০০%	চতুর্থ
২০১২	৩৮২	৩৮২	৩২০	১০০%	পঞ্চম
২০১৩	৪৮৭	৪৮৭	৩৭৫	১০০%	চতুর্থ
২০১৪	৪৬৭	৪৬৭	৪৩১	১০০%	ষষ্ঠ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পাশের হার	ঢাকা বোর্ডে স্থান
২০০৯	৪৬০	৪৫৭	২১৭	৯৯.৩৫%	দশম
২০১০	৬৩৪	৬৩১	৩০৯	৯৯.৫৩%	পঞ্চম
২০১১	৬৪৩	৬৪২	৩৫০	৯৯.৮৪%	নবম
২০১২	৭২০	৭২০	৫০২	১০০%	ষষ্ঠ
২০১৩	৬৬২	৬৬০	৪৮৭	৯৯.৭%	চতুর্থ

সহশিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা সবসময়ই বিভিন্ন ধরনের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে প্রসংশনীয় সাফল্য অর্জন করে। ২০১৩-১৪ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

- ১৩ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম আলো কর্তৃক আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ের 'গণিত অলিম্পিয়াড-২০১৩'-এ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম, নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে দ্বিতীয়, মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম ও তৃতীয়, Rubik's Cube প্রতিযোগিতায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে তৃতীয় এবং কলেজ পর্যায়ে দ্বিতীয় ।
- ২৩ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত "English Language Festival- 2013"-এ একাদশ শ্রেণির ছাত্র সেলিম সরকার প্রথম স্থান লাভ করে।
- গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত 'ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৩'-এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এর বিতর্ক দলকে পরাজিত করে এবং শিহাব রশীদ শ্রেষ্ঠ বক্তা হবার গৌরব লাভ করে।
- ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত স্কলাস্টিকা স্কুল কর্তৃক আয়োজিত 'আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৩'-এ প্রজেক্ট ডিসপ্লে প্রতিযোগিতায় রানার আপ।
- ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিসিএসআইআর কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৩'-অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ৩০,০০০/- টাকা মূল্যমানের পুরস্কার লাভ করেছে।
- ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত United International University (UIU) কর্তৃক আয়োজিত 'তৃতীয় বিতর্ক উৎসবে' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ।

- ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম আলো কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় গণিত উৎসব'-এ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আহমেদ ইত্তিহাদ প্রাথমিক পর্যায়ে Champion of the Champion হয়। এছাড়া দশম শ্রেণির ছাত্র সাদমান সাকিব মাধ্যমিক পর্যায়ে রানার আপ হবার গৌরব লাভ করে।
- ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৩'–এ কুইজ প্রতিযোগিতায় স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হবার সৌভাগ্য লাভ করে।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের সূর্যসেন হল কর্তৃক আয়োজিত 'বিতর্ক উৎসবে' রানার আপ হয়।
- ০৫ মার্চ ২০১৩ থেকে ০৭ মার্চ ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঢাকা ইমপেরিয়াল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত "5th Inter City Science Fair"–এ উপস্থিত বক্তৃতায় স্কুল পর্যায়ে প্রথম ও তৃতীয়, কলেজ পর্যায়ে প্রথম হয়।
- ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ" প্রতিযোগিতায় থানা পর্যায়ে ভাষা ও সাহিত্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রথম, গণিত ও কম্পিউটারে কলেজ পর্যায়ে প্রথম, বিজ্ঞানে স্কুল পর্যায়ে প্রথম, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রথম হয়।
- ১৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩ তম জন্মদিবস ও জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রাকিবুল হাসান প্রথম স্থান অধিকার করে।
- ২০ মার্চ ২০১৩ থেকে ২৩ মার্চ ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হল কর্তৃক আয়োজিত 'বিতর্ক উৎসবে' রানার আপ হয়।
- ৫ এপ্রিল ২০১৩ অনুষ্ঠিত প্রথম আলো কর্তৃক বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত 'ভাষা প্রতিযোগ-২০১৩'-এ প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বিতীয়, নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান।
- গত ১৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ" জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।
- ১৮ এপ্রিল ২০১৩ থেকে ২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল কর্তৃক আয়োজিত "7th Laboratorians Festival – 2013"–এ কুইজ ও Mixed Up প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং Individual পর্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়, অলিম্পিয়াড (Science)–এ দ্বিতীয় ও তৃতীয়, অলিম্পিয়াড (Math)-এ দ্বিতীয়, Sudoku Contest–এ প্রথম এবং ওহু এবংঃ -এ দ্বিতীয় ও তৃতীয়, কলেজ পর্যায়ে প্রথম ও তৃতীয় এবং Rubik's Cube–এ কলেজ পর্যায়ে প্রথম হয়।
- ২২ মে ২০১৩ থেকে ২৮ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃ কলেজ 'বিতর্ক উৎসবে' রানার আপ ।
- ২৬ মে ২০১৩ থেকে ৩০ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'বিতর্ক উৎসবে' রানার আপ।
- ২৭ জুন ২০১৩ থেকে ২৯ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল কর্তৃক আয়োজিত "Scientilla Science Festival – 2013"–এ কুইজ প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং কলেজ পর্যায়ে রানার আপ, অলিম্পিয়াড (Chemistry) ও অলিম্পিয়াড (Physics)–এ প্রথম, অলিম্পিয়াড (Math)–এ স্কুল পর্যায়ে প্রথম এবং কলেজ পর্যায়ে অলিম্পিয়াড (Biology)–এ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়; অলিম্পিয়াড (Astronomy)–এ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়; উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম ও তৃতীয়।

- ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মনীপুর স্কুল কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃস্কুল ও কলেজ "Science Festival–2013"–এ স্কুল পর্যায়ে অলিম্পিয়াড (Math) প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়, অলিম্পিয়াড (Physics)–এ দ্বিতীয় এবং কলেজ পর্যায়ে Project Display–এ চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিয়াড (Math)–এ প্রথম এবং অলিম্পিয়াড (Biology)–তে প্রথম ।
- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত 'মা ও শিশু বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৩' এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এর বিতর্ক দলকে পরাজিত করে। উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাফওয়াত মোনতাসীর শ্রেষ্ঠ বক্তা হবার গৌরব লাভ করে।
- ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলিক্রস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত "প্রাণ ফ্রুটো হলিক্রস কলেজ Science Festival–2013"–এ কুইজ প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে রানার আপ, Project Display–এ চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিয়াড (Physics)–এ রানার আপ, অলিম্পিয়াড (Green)–এ প্রথম ও তৃতীয়, অলিম্পিয়াড (Sudoku)–এ তৃতীয়, উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম এবং Wall Magazine–এ দ্বিতীয়।
- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত East West Universit কর্তৃক আয়োজিত 'কুইজ প্রতিযোগিতা-২০১৩'-এ রানার আপ।
- ০৪ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ০৬ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Islamic University of Technology (IUT) কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় 'কুইজ প্রতিযোগিতা-২০১৩'-এ চ্যাম্পিয়ন।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ০৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ সাধারণ জ্ঞান ও ধাঁধা প্রতিযোগিতায় রানার আপ।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ০৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শহীদুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ' বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৪' -এ চ্যাম্পিয়ন।
- গত ০৬ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় শিশু প্রতিযোগিতা-২০১৪' এ থানা পর্যায়ে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা সাধারণ জ্ঞান ও ধাঁধা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ।
- ০৭ মার্চ ২০১৪ তারিখ থেকে ০৯ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হারমেন মেইনার কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃকলেজ 'বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা-২০১৪'-এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্কুল কলেজ পর্যায়ে রানার আপ এবং কুইজে কলেজ পর্যায়ে রানার আপ।
- ০৭ মার্চ ২০১৪ তারিখ থেকে ০৮ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ উৎসবে Concept Presentation -এ চ্যাম্পিয়ন।
- ০৭ মার্চ ২০১৪ থেকে ০৯ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঢাকা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ কুইজে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম, অলিম্পিয়াড (Biology)-তে প্রথম, Rubik's Cube-এ প্রথম, Wall Magazine-এ দ্বিতীয়, প্রজেক্ট (Biology)-তে দ্বিতীয় এবং প্রজেক্ট (Chemistry)-তে দ্বিতীয়।
- ১৭ মার্চ ২০১৪ থেকে ১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ স্কুল পর্যায়ে কুইজে চ্যাম্পিয়ন, General Knowledge Olympiad-এ প্রথম, কলেজ পর্যায়ে কুইজে চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিয়াড (Biology)-এ প্রথম ও দ্বিতীয় এবং General Knowledge Olympiad-এ প্রথম।

- ২১ মার্চ ২০১৪ থেকে ২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবং কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'ভাষা উৎসব-২০১৪'–এ স্কুল পর্যায়ে বাংলা কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তৃতীয়, ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি-তে তৃতীয়, ইংরেজি উপস্থিত বক্তৃতায় তৃতীয় এবং ইংরেজি পঠনে দ্বিতীয়; কলেজ পর্যায়ে বাংলা কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়, English Quiz and Olympiad-এ দ্বিতীয় এবং দেয়াল পত্রিকায় তৃতীয়।
- ২৭ মার্চ ২০১৪ থেকে ২৯ মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিসিএসআইআর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ অসাধারণ সাফল্য অর্জন। স্কুল ও কলেজ উভয় পর্যায়েই চ্যাম্পিয়ন হয়ে ৬০,০০০/- টাকা পুরস্কার লাভ করে।
- ০২ মে ২০১৪ থেকে ০৪ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত গভঃমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ কুইজে কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, গণিত অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় এবং যুক্তি কুইজ স্কুল পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন।
- ১১ মে ২০১৪ থেকে ১৩ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মনিপুর হাই স্কুল কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ প্রজেক্ট উপস্থাপনে চ্যাম্পিয়ন।
- ০৫ জুন ২০১৪ অনুষ্ঠিত প্রথম আলো কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় ভাষা প্রতিযোগ-২০১৪'-এ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ওয়াসী কবীর সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বিতীয় ।
- ০৬ জুন ২০১৪ থেকে ০৭ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দৈনিক সমকাল কর্তৃক আয়োজিত 'বিএফএফ জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৪' সমগ্র বাংলাদেশের ৫২১ টি দল ও ১৫৬৩ জন বিতার্কিকের মধ্যে শাওন চৌধুরী শ্রেষ্ঠ বক্তা ও বিতর্ক দল চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব লাভ করে।
- ১১ জুন ২০১৪ থেকে ১৩ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সেন্ট গ্রেগরী স্কুল কর্তৃক আয়োজিত 'বিজ্ঞান মেলা-২০১৪'-এ স্কুল পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় রানার আপ, Olympiad (English)-এ তৃতীয়, Criminal Case Challenge-এ দ্বিতীয়, কলেজ পর্যায়ে কুইজে রানার আপ, কুইজ (Sports)-এ প্রথম ও দ্বিতীয়, কুইজ (Bangladesh)-এ দ্বিতীয়, কুইজ (Art)-এ দ্বিতীয়, Olympiad (Physics)-এ দ্বিতীয়, Olympiad (Chemistry)-এ তৃতীয়, Olympiad (English)-এ দ্বিতীয় ও তৃতীয়, Criminal Case Challenge-এ প্রথম এবং Scrap Book-এ প্রথম।
- ২৬ জুন ২০১৪ থেকে ২৮ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'প্রথম আলো আরডিএস জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৪'-এ স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন।
- ১১ জুলাই ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত Marks All Rounder প্রতিযোগিতায় কুইজে এ কলেজের ছাত্র রেদওয়ান উদ্দিন আহমেদ সারা বাংলাদেশের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোল্ড মেডেল লাভ করেছে।
- ০৯ জুলাই ২০১৪ থেকে ১১ জুলাই ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৪'-এ স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে রানার আপ।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মিন্টম্যান আয়োজিত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ৪টি গ্রুপে ১৫টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা খ গ্রুপ হতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং গ গ্রুপের চ্যাম্পিয়নকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয় ও রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রদের নামের তালিকা

চতুর্থ শ্রেণি
*মোঃ সাজিদুর রহমান

পঞ্চম শ্রেণি
* আহমেদ ইত্তিহাদ হাসিব
* আকিফ রহমান

সপ্তম শ্রেণি
* রুবাইয়াত ইকোলো
* শেখ হাসিবুর রহমান
* মেহেদী হাসান শোভন
* মারুফ হোসেন

অষ্টম শ্রেণি
* মল্লিক সাহা
* ইরাজ আদিব
* মোঃ সাকিফ আল ওয়াসি
* মোঃ মাহমুদুল ইসলাম
* এস.এম.হাসান শফি
* মোঃ ইয়াসির আরাফাত
* আব্দুল্লাহ আল জাবের

নবম শ্রেণি
* সাদমান সাকিব
* শাওন চৌধুরী
* রায়হান উদ্দিন
* রাফাতুল ইসলাম রাফি
* শাফকাত ইসলাম সাকিফ
* সামির মোহাম্মদ মুবীন
* রোদোয়ান উদ্দিন আহমেদ
* আদনান উল ইসলাম
* নীলাদ্রী রাইয়ান
* নাফিস কাজী
* আদনান উল ইসলাম
* মুশফিক উদ্দিন আহমেদ
* মোনতাসির ইসলাম

দশম শ্রেণি
* সুহার্ত জান্নাত
* মিফতা ফারদিন রহমান
* তাহমিদ ইয়াসার
* জাওয়াদ আবদুল্লাহ
* সাফওয়াত মোনতাসীর
* শেখ ফাইয়াজ মাহমুদ
* সামিউল ইসলাম
* সাইফ আব্বাস
* প্রিয়ম দাশ
* আরিয়ান জাবি
* আসকারি রহমান
* আপন লৌহ
* সাফকাত ইসলাম সাকিফ
* সুদীপ্ত রওশন চৌধুরী
* সাদমান সাকিব
* শাহরিয়ার স্বপ্নীল
* শাওন চৌধুরী
* সেজান মাহমুদ প্রান্ত
* আসিফ সাঈদ
* প্রান্তল রায়
* মেহেদী আবরার
* শৈশব খান

একাদশ শ্রেণি
* সাকিব মাহমুদ জাকারিয়া
* এস. কে. হাসিন ইনান
* নাসিফ হোসেন
* শাহরিয়ার রহমান
* নূর-এ-সাফী আহনাফ
* আশিকুর রহমান
* শাহরিয়ার প্রান্ত
* তানভীর লাবিব চৌধুরী
* অসীম ফাইয়াজ
* তৌফিকুল আলম
* মুক্তাদির আল নাহিয়ান
* রাকিবুল ইসলাম
* রাফিউ আহমেদ
* আকিব ইনতিসার সিয়াম
* তাওসিফ আহমেদ
* মাহাজিব হোসেন ইমন
* নাসিফুল হুদা
* সাকিক খান প্রতীক
* এ জেড ফাত্তাহ
* জাবিউল্লাহ সোয়াদ
* মোহাম্মদ তামিম
* আশরাফুল ইসলাম

দ্বাদশ শ্রেণি
* মেঘমল্লার বসু
* আল ইমরান অপু
* আয়মানুল ইসলাম
* এইচ এম সাবির নূর
* অতনু মুখার্জী
* তামজীদ রহমান অরণ্য
* এস. কে. হাসিন ইনান
* ওয়াসি উদ্দিন আহমেদ
* মোঃ রাজীন মাখদুম খান
* রাফিদ মুসাব্বির রহমান
* তানভীর আহমেদ
* হাসান নাহিয়ান
* তানজিল হাসান খান
* আবেশ ঘোষ
* আনান আশরাফী অনন্য
* রাতুল রায়
* মুবিন মোহাম্মদ
* জালাল মোঃ আশফাক
* এম. আর. আই নাদিম প্রধান
* সাকিব আনোয়ার
* রেদোয়ান আহমেদ রিজভী
* কে.এম. রাফসান রাব্বি
* নাসিফ তানজিম
* শিহাব রশীদ
* সাজিদ অদ্রি
* রেহমান রাদ
* অভি অধিকারী
* তীর্থ সাহা
* সাদমান সাকিব
* মেশাল মোনেম
* কাজী রেদোয়ান আহমেদ
* মোস্তফা মনসুর
* রাকিব হাসান আনুপ
* রায়হান উদ্দিন শাহীন
* আজওয়াদ আওসাফ
* মারুফ আরেফিন
* রুদ্রনীল দত্ত
* মোস্তাজের বিল্লাহ
* কৌশিক সরকার

এক নজরে কলেজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত

হাউস ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

১. কলেজের আবাসিক ছাত্রদের জন্য নতুন খাট ও লকার তৈরি এবং পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত।
২. লালন শাহ হাউসের পানির সমস্যা সমাধানে নতুন পানির রিজার্ভ ট্যাংক ও মটর স্থাপন।
৩. লালন শাহ হাউসের মোট ৩৭০ ফুট নতুন সুয়ারেজ লাইন তৈরিকরণ।
৪. কলেজের জুনিয়র হাউসের জন্য নতুন টেবিল টেনিস বোর্ড ক্রয়।
৫. জয়নুল আবেদীন হাউসের হাউস মাস্টারের অফিস আধুনিকায়ন এবং বাথরুমের টাইলস স্থাপন।
৬. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের সংস্কার ও রংকরণ।
৭. সকল হাউসের ডাইনিং টেবিলের টপ ও ফরমিকা প্রতিস্থাপন।
৮. লালন শাহ হাউসের পুরাতন স্যুয়ারেজ লাইন সংস্কার ও নতুন স্যুয়ারেজ লাইন তৈরিকরণ ।
৯. সকল হাউসে নিয়ন সাইনযুক্ত নামফলক স্থাপন।
১০. জুনিয়র হাউসের বাথরুমে টাইলসকরণ।
১১. শীতকালে ছাত্রদের গরম পানি সরবরাহের জন্য জুনিয়র হাউসে গিজার স্থাপন।

প্রশাসনিক ভবন, অডিটোরিয়াম এবং বাস্কেট বল গ্রাউন্ড

১. কলেজের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের বাস্কেট বল বোর্ড ও গ্রাউন্ড সংস্কার।
২. কলেজের অডিটোরিয়ামের গ্যালারীর ৪৮ টি চেয়ার মেরামতকরণ।
৩. কলেজের প্রশাসন ভবন ও অডিটোরিয়াম রঙকরণ।
৪. প্রশাসন ভবনের নিচতলায় উপাধ্যক্ষ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অফিস কক্ষে টাইলস স্থাপন, সংস্কার ও রঙকরণ।
৫. প্রশাসন ভবনের জলছাদ সংস্কারকরণ।

ক্যাম্পাস এর উন্নয়ন কর্মকান্ড

১. কলেজের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থাকরণ ।
২. কলেজের ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন স্থানে ০৮ টি হ্যালোজেন লাইট স্থাপন।
৩. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য লালন শাহ হাউসের সংলগ্ন স্থানে ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন ।
৪. অভ্যন্তরীণ পানির লাইন সংস্কার ও চাবি স্থাপন।
৫. টিচার্স কোয়ার্টার এর সামনের রাস্তা নির্মাণ।
৬. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন ও স্থানান্তরকরণ।
৭. অধ্যক্ষের বাংলোর বেষ্টনী গেইট নির্মাণ ও রঙকরণ।

শিক্ষাভবন এর উন্নয়ন কর্মকান্ড

১. শিক্ষাভবন-১ এর শ্রেণিকক্ষগুলো সংস্কারকরণ।
২. টিচার্স লাউঞ্জ আধুনিকায়ন।
৩. শিক্ষাভবন-৩ এ একটি বৃহৎ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রস্তুতকরণ (স্পিকার ও প্রজেক্টর এবং স্ক্রিন সহ)।

ক্লাব এর উন্নয়ন কর্মকান্ড

১. আর্ট ও ফটোগ্রাফি ক্লাবের জন্য একটি ডিএসএলআর/ (D90) ক্যামেরা ক্রয়।

ওরা এবং আমরা

ফেরদৌস আরা বেগম
উপাধ্যক্ষ (দিবা-সিনিয়র)
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ওরা ওদের জীবনের এক একটা টুকরো এই অঙ্গনে ফেলে রেখে যায়। ওরা বার বার ফিরে আসে। ওদের দুরন্ত শৈশব, ওদের রহস্যময় কৈশোর, ওদের উজ্জ্বল দৃপ্ত তারুণ্য এখানকার ঘাসে-মাটিতে, পত্রে-পুষ্পে, নিস্প্রাণ স্থাপনার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ওরা সে সবের পরশটুকু পেতে চায় বলে ফিরে ফিরে আসে। ওরা বড় হয়ে যায়, বিকশিত হয়ে ওঠে। সম্পর্কের ডালপালা গজায়, কিন্তু সঙ্গোপনে লালন করে এই স্মৃতিময় প্রাণময় টুকরোগুলোকে, হয়তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। ফিরে আসার আর ছুঁয়ে দেখার ব্যাকুলতায় আকুল হয়। এ এক অদ্ভুত সম্মোহনময় পিছুটান। জানি না পৃথিবীর আর কোথাও ছেলেবেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্কুল বেলা এভাবে নাড়ির টান হয়ে টানে কি না। ওদের গৌরব আর অহঙ্কার, ওদের গর্ব আর সম্মান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। ওরা যখন প্রাক্তন হয়ে যায়, তখন যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু আদর্শ, সব এখানে প্রত্যাশা করে; যদিও যখন ওরা বর্তমান থাকে তখন বয়সোচিত চপলতায় সব আদর্শের পথে, সব মঙ্গলের পথে নিজেকে হয়তো সব সময় সুস্থির রাখতে পারে না।

আর আমরা? আমরা তারুণ্যের উষালগ্নে এখানে আসি। এখানকার গাছের সবুজ আর আকাশের নীল, এখানকার বিস্তৃত মাঠ আর প্রকৃতির সুপরিকল্পিত বিন্যাস– সর্বোপরি ওদের নিষ্পাপ শৈশব আর প্রদীপ্ত তারুণ্য, ওদের সৃষ্টিশীল মেধাবী মানস আমাদের গ্রাস করে, নেশাগ্রস্ত করে। আমরা পূর্ণতার আনন্দ আর প্রাপ্তির ঐশ্বর্য অনুভব করি। তথাকথিত ক্যারিয়ারের হাতছানি, প্রতাপশালী পেশার প্রলোভনে ব্যর্থ হই। আমরা যখন যাই একেবারেই যাই। বাতিল হয়ে যাই। ওরা বলে, আমার.....আমাদের ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। আমরা কখনও বলিনা, বলতে পারি না। আমরা বলি আমি ওখানে ছিলাম, চাকরি করতাম.....। চাকর+ই = চাকরি। খুব কি রূঢ় হয়ে গেল? নিজের কানেই খট করে লাগলো, চাকরি? কী জানি? শুরু থেকে এই পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত এই তেত্রিশ বৎসর কখনও কী মনে হয়েছে চাকরি করছি? বরং যেন জীবন কখনও বা এমন কী জীবনাধিক হয়ে উঠেছে DRMC। ঝাঁক ঝাঁক পবিত্র শুভ্র তারুণ্যের মধ্যে, কচিকণ্ঠের কল্লোলের মধ্যে প্রাণ ডুবিয়ে প্রাণ আহরণ করেছি। পরের সন্তানের জন্য বুকের মধ্যে এমন মমতার বারিধারার অবিরাম বর্ষণ নিজেকে আমূল স্পন্দিত করে কেমন করে জানি না। এ বোধহয় কেবল এখানেই সম্ভব। আর কত আদিগন্ত বিস্তৃত ঐশ্বর্যময় মুহূর্ত ওরা উপহার দিয়েছে। তুচ্ছ জীবনের না পাওয়ার বেদনাগুলো ভুলিয়ে দিয়েছে। এতটা কি প্রাপ্য ছিল? নাহ্। এতটা প্রাপ্য ছিল না, এতটা কাম্যও ছিল না।

ওরা যখন এই অঙ্গন ছেড়ে বিদায় নেয়, তখন সামনে থাকে উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি। এই অঙ্গনের সীমা ছাড়িয়ে ওরা বড় হয়, বিকশিত হয়। ওদের বড় হওয়া, ওদের জীবনের ঔজ্জ্বল্য আমাদের গর্বিত করে, আমরাও যেন আকাশ ছুঁই। ওরা যখন আসে তখন দৃপ্ত এবং দীপ্তিময় হয়ে আসে। আর আমরা যখন যাই তখন যেন জীবনের সব সুন্দর, সব ঐশ্বর্য পেছনে ফেলে, আত্মাটাকে এই অঙ্গনে ফেলে রেখে যাই। যেতে চাই না। যেতে হয় বলে যাই। জীবনের শিকড় গাঁথা হয়ে গেছে এই মাটিতে। তাকে উপড়ে নিয়ে যেতে হয়। মাটি কতটুকু কেঁপে ওঠে জানি না। আমরা চৌচির হয়ে যাই.....।

একটি, দুটি, তিনটি মালবাহী গাড়ি, পেছনে পরিবার পরিজনসহ আমরা। পশ্চিমের তোরণ খুলে দেয় দ্বার প্রহরী। গাড়িগুলো একটা একটা করে বের হয়ে যায়। আমরাও। তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মছেঁড়া টান। আহ! কেন অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে? এমনটিই তো হওয়ার কথা ছিল। বন্ধ হয়ে যায় তোরণ। রুদ্ধ দরজার ওপাশে ডিআরএমসি। এ পাশে আমি। ওপাশে ফেলে আসা আমার উজ্জ্বল সুন্দর জীবন। এ পাশে? কী? জানি না।

এবার ফিরাও মোরে

জেহিন বেগম, সহযোগী অধ্যাপক ও
বিভাগীয় অধ্যাপক ও
বিভাগীয় প্রধান (বাংলা)

আস্সালামু আলাইকুম।
ওয়া আলাইকুমুস সালাম।
চিনতে পারছেন? ঐ যে ভর্তি পরীক্ষার দিন গান করেছিলাম? শ্যামবর্ণ গোলগাল একজন বললেন। ও আচ্ছা। কেমন আছেন আপনি? ভালো। মিস, আপনি কোন শিফটের?

মর্নিং। কই, আপনাকে তো কোনদিন দেখি না! আমিও তো মর্নিং এ কাস থ্রিতে পড়ি। সত্যি তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। একই শিফটের শিক্ষক-ছাত্র আমরা, অথচ কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় না। সিনিয়রিটির মোহে সঞ্জীবনীর এই সুধাভাণ্ড থেকে ধীরে ধীরে কীভাবে দূরে সরে গেছি! সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে। মাস কয়েক পর এক বুধবার সাপ্তাহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিবসে জুনিয়র উইং এর বিচারকের দায়িত্ব পেলাম আমি আর রওশন আরা চৌধুরী। আমরা বিগত শতাব্দীতে চাকরির শুরুতে যেভাবে শিখেছিলাম, ঠিক সেভাবে জাজমেন্ট শুরু করলাম। প্রথমে ছাত্রদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা দাঁত-নখ-চুল-জুতা-মোজা-প্যান্ট-শার্ট-আন্ডারগার্মেন্ট-ব্যাজ-নেইমট্যাগ-বইখাতা সব ঠিক আছে কী না। তারপর শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা। ফ্লোর মুছে কী রকম ঝকঝক করছে। ডেস্ক-চেয়ার বেঞ্চ থেকে কেমন ধুলো ঝেড়েছে। ব্লাকবোর্ড আপ টু ডেট কী না ইত্যাদি ইত্যাদি। নবীন ক্লাস টিচাররা তটস্থ। ম্যাডাম, এ কী! এরকম জাজমেন্ট তো কোনো দিন দেখি নি। আমাদের ছাত্ররা তো ভয়ে অস্থির। মিস, আমাদের তো অনেক নম্বর কাটা যাবে ব্যক্তিগত এবং শ্রেণিগত পয়েন্টে! পরের সপ্তাহে ছুটির পর মসজিদের পথে ছোট ছোট কয়েকজন একযোগে পাকড়াও করল আমাদের। মিস, এ সপ্তাহে ক্লাস জাজমেন্টে এলেন না যে? আমরা গত সপ্তাহের সব ভুল শুধরে নিয়েছিলাম। অনেক পরিষ্কার করে ক্লাস গুছিয়েছিলাম। বললাম বাবা,ওটা তো বাইরোটেশন সবাইকে করতে হয়। প্রতিবার তো একই বিচারক যেতে পারেন না।

তবে যাই হোক, মন বলতে লাগলো এবার ফিরাও মোরে। উৎসের কাছে ফেরার সময় হয়েছে। বিগত দুবছরে জুনিয়র উইংটা অনেকটাই বিশ পঁচিশ বছর আগেকার আবহে ফিরে গেছে। তাই এ বছর একদম ছোটদের ক্লাস নিচ্ছি আবার। ভালো লাগছে। কিছুই না-হাতের লেখা-বানান-শ্রুতলিপি লেখানো। অভিধান দেখতে শেখানো। সেই ফাঁকে একটু গান, একটু গল্প। এটা সেটা শেখানো। ক্লাসের মাঝে উঠে দাঁড়িয়েই একজন প্যান্টের ভেতর শার্ট ইন করতে লেগে গেল। তখন তাঁকে নিবৃত্ত করে সারা ক্লাসকে নসিহত করা। কোন কোন কাজ অন্যের সামনে করতে নেই। মানুষের ব্যক্তিগত কাজ বলে কিছু থাকে যা অন্যের সামনে করতে হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিচির মিচির, অবিশ্রাম কথা, নালিশ। তার মাঝেও কী যে মাধুর্য! বোর্ডে লিখেছি। একজন এসে পিঠে মৃদু মৃদু চাপড় দিয়ে মিস মিস, এটা কি এরকম করে লিখবো? চোখ পিট পিট, গালফোলা আরেকজন এসে শালের প্রান্ত ধরে মিস এটা কি এরকম? স্কুলের বাইরে এক অনুষ্ঠানে টুকটুকে লাল পাঞ্জাবি পরা একজন সালাম দিয়ে-ম্যাডাম আমাকে চিনেছেন? আপনি আমাদের ক্লাস নেন। যেন এই আইডেনটিটিটা খুব জরুরি। মন ভালো হয়ে যায়। কয়েকজন সহকর্মীর পুত্র ভর্তি হয়েছেন এবার। গত বছর পহেলা বৈশাখেই একজন চমৎকার একটি কার্ড নিজ হাতে বানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমায়। ভর্তি হয়ে বাসায় মিষ্টির বাক্স নিয়ে উপস্থিত। আরেকজন ছোটবেলা আমাকে 'ম্যাডাম-নানু' বলে ডাকতেন। তিনিও আমার ছাত্র হয়ে বাসায় দই-মিষ্টি পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারপরও মনে প্রশ্ন জাগে। এই মাটির নরম ঢেলার মতো শিশুগুলো আমাদের হাতে আসে। ধীরে ধীরে কীভাবে এমন করে বদলে যায় তারা? কাদার তালকে ছাঁচে ঢেলে ইট বানানো হয়। রোদে শুকানো হয়। তারপর ভাঁটায় পোড়ানো হয়। তৈরি হয় শক্ত ইট। কোনো দাগই আর ওতে পড়ে না।

জুনিয়র উইং থেকে যখন ক্লাস নাইনের ছাত্রগুলো সিনিয়রে যায় বহু বছরের অভিজ্ঞতায় সেই সময় আর এই সময়ের ছাত্রদের পার্থক্যটা লক্ষ করি। আগে সিনিয়র উইং এর সবচেয়ে ছোট ক্লাস বলে এক ধরণের নম্রতা থাকতো ওদের মধ্যে। এখন দেখি একটা উগ্র হামবড়া ভাব। কাউকে কেয়ার নেই। শুধু কথা বলে যাওয়া। অবিশ্রাম অপ্রয়োজনীয় কথা। ক্লাস নাইনের ছাত্রদের আচরণে মর্মাহত আমি। এক সময় এই নাইনের ছেলেদেরই সাহিত্য কী, এর ভাষা নান্দনিকতা ইত্যাদি খুব সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছি। ওরা চুপচাপ শুনেছে। ড. আহমদ শরীফ স্যার বলতেন হাঁটার জন্য বিঘত খানেক পথই যথেষ্ট। কিন্তু নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে হাঁটার জন্য যথেষ্ট চওড়া পথের দরকার। যে কারণে পাঁচিল বা কার্নিশের ওপর দিয়ে হাঁটা অনিরাপদ। তাই টেক্সট এর বাইরেও অনেক রেফারেন্স জানা দরকার। তো, সাহিত্য বঙ্কিম দূরে থাক পাঠ্য বইয়ের পড়াটুকুও স্বচ্ছন্দে ওদের সামনে তুলে ধরা যায় না, আজকাল। বহু দেনদরবার করেছি নিজের সঙ্গে, কী এর কারণ? আজকালকার ছাত্ররা কি বেশি ব্রিলিয়ান্ট?

নাকি নিঃশেষ হয়ে গেছি আমি? আবার কিছু জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাওয়া মুশকিল। তবে পরীক্ষার খাতার পৃষ্ঠা ভরা থাকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ-সঠিক নানা কথায়। ভুল বানান, বাক্য নির্মাণ শৈলীর কথা কহতব্য নয়। কিন্তু নম্বর না দিয়ে যাবো কোথায়? এ যে সৃজনশীল সিস্টেম! ভাবি লেখাপড়ার প্রতি এই অনীহার কারণ কী মডেল টেস্ট? অষ্টম শ্রেণিতে আট দশটা মডেল টেস্ট নিয়ে তোতা পাখি বানানো হয় একেক জনকে। তাই পড়াশোনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ওরা? কে জানে। আবার কোনো রকমেই শাসন করা যাবে না এই নির্দেশেরও ষোলআনা সুযোগ গ্রহণ করে ওরা। শিক্ষকদের যেন হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলা হয়েছে সাঁতার কাটতে। মনে পড়ছে আগে আমাদের এখানে 'অবিরাম গল্পবলা' নামে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। কিছু নিয়ম কানুন বেঁধে দিয়ে একজন শিক্ষক একটি গল্প শুরু করে দিতেন। প্রতিযোগীরা পর্যায়ক্রমে তাকে একটা পরিণতিতে নিয়ে যেত। কাহিনি নির্মাণে ছাত্রদের দৈন্য দেখে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বলেছিলেন আপনাদের ছাত্রদের মাঝে সৃজনশীলতার বড় অভাব। আগে ওদের কল্পনার ঘোড়াকে দৌড় করাতে শেখান। তেপান্তরের মাঠে যতদিন না ওরা কল্পনার পঙ্খিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে শিখবে, ততদিন এধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন বৃথা। সঙ্গত কারণেই প্রতিযোগিতাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। তেপান্তর আর পঙ্খিরাজের স্থান দখল করে নিয়েছে ফেসবুক ইন্টারনেটের সীমাহীন জগৎ আর মোবাইল ফোনের 'আনলিমিটেড' টক টাইম। কিছু ভাবতে হয় না। সৃষ্টি করতে হয় না। কল্পনা করতে হয় না। শুধু মাউস ঘোরাও, বাটন ক্লিক করো আর অভীষ্ট বস্তুটি পেয়ে যাও..... ব্যস। এ প্রসঙ্গে নিজের একটি লজ্জাকর ব্যর্থ মিশনের কথা বলি। মাইক্রোসফটের এক ট্রেনিং প্রোগ্রামে কলেজ থেকে শিক্ষক পাঠানো হচ্ছিলো। বয়স্ক শিক্ষকরা কেউ যাচ্ছিলেন না। আমি প্রবল উৎসাহে কম্পিউটার বিভাগের আমিরীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম আমাকে পাঠানোর জন্য। ভাবলাম এই সুযোগে আমার কম্পিউটার শেখা ঠেকায় কে! কিন্তু হা হতোস্মি! ওটা ছিলো ক্লাসরুম প্রেজেন্টেশনের জন্য স্লাইড তৈরির ট্রেনিং। আমি তো কম্পিউটারের অ আ-ও জানি না। আমিরীকে জানালাম আর যেতে চাই না। কিন্তু যেহেতু অফিসিয়ালি নাম চলে গেছে তাই কনটিনিউ করতেই হবে। আমিরী আশ্বাস দিল আপনাকে কিছুই করতে হবে না আপা। আপনি শুধু যাবেন আর আসবেন। আমি শফিককে বলে দেব। যিনি ট্রেইনার তিনি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। অত্যন্ত দক্ষ এবং সহৃদয়। বয়সে আমার ছাত্রের সমান। আমার সন্তান স্থানীয় কয়েকজন সহকর্মী, যারা ইতিমধ্যে ট্রেনিং সম্পন্ন করেছে তারা বার বার ফোন করে জানালো আমাদের ম্যাডাম যাচ্ছেন। একটু খেয়াল রাখবেন, যত্ন করে শেখাবেন। লজ্জায় মারা যাই আর কি। স্যার বার বার বললেন, ম্যাডাম কোনো সমস্যা নেই। আপনি এই বয়সে যে আমাদের সঙ্গে এসেছেন এটাই অনেক বড় ব্যাপার। তা কী আর করা কম্পিউটারে এটা সেটা টিপেটুপে দেখি আর বসে বসে সহকর্মীদের কর্মতৎপরতা দেখি। কেমন সুন্দরভাবে নানাকিছু শিখে নিয়ে স্লাইড তৈরি করছে। কারোটা ষড়ঋতুর বর্ণময় ফুলের সম্ভার। কেউ আলোর প্রতিসরণের ওপর কাজ করছে। কেউ বাণিজ্য বা মার্কেটিং এর ক্লাসের উপযোগী উপকরণ জড়ো করছে। কেউ এইডস সংক্রান্ত চিত্র দিয়ে সাজাচ্ছে তার স্লাইড। তৃতীয় দিন স্যার বললেন তাড়াতাড়ি আপনাদের প্রেজেন্টেশনের কাজ শেষ করে ফেলুন এবং টপিকের নাম বলুন। এন্ট্রি করতে হবে। সাতজন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে আমি 'দুধভাত'। সবাই যন্ত্রকুশলী। আমি একমাত্র অযান্ত্রিক। তবুও তৈরি করতে হবে। একমাত্র অস্ত্র কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম। ৪৭এর দেশভাগ, ৫২র ভাষা আন্দোলন আর ৭১এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে চমৎকার তিনটি গল্প রয়েছে। মনে মনে সেগুলো ঘেটে-ঘুটে বাঙালির অস্তিত্ব সংকটের উপর একটা কী দাঁড় করলাম। নাম দিলাম 'তবুও জীবন।' সহৃদয় স্যার নিজেই তাঁর এই বয়স্ক ছাত্রীর স্লাইডটি তৈরি করে দিলেন। আমার ফরমাশ মোতাবেক কতগুলো ছবি ক্লিক ক্লিক করে নামালেন প্যান্ডোরার বাক্স থেকে। ছেলের বয়সী গুরুর কাছে মাফ চাইলাম বার বার। এবার প্রেজেন্টেশন। স্যার বার বার বলে দিলেন প্রথমত এবং প্রধানত নিজ স্লাইড প্রদর্শন করতে। বেশি কথা না বলতে। আমাদের কাজগুলো নাকি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। কী আর দেখাবো আমি। দর্শনীয় প্রায় কিছুই নেই আমার। তাই বলা শুরু করলাম। সবার পেছনে নিজের ডেস্কে কি যেন কাজে ব্যস্ত ছিলেন স্যার। প্রথম মুখ তুলে একটু তাকালেন। তারপর শুনতে থাকলেন। বলা শেষ করে সিটে গিয়ে বসলাম। তিনি বালকের মতো চঞ্চল পায়ে ছুটে সামনে এসে বললেন বাহ! সুন্দর! খুব সুন্দর হয়েছে। আমি যে মহাকাব্যিক বর্ণনা দিয়েছি তা নয়। আসলে কম্পিউটার যন্ত্রের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত সুন্দর এক রঙিন জগতে বিচরণ করা যায় ঠিক। এতে চোখের তৃপ্তি হয়। বহু তথ্য জানা যায়। কিন্তু মন বা আত্মা? সে থাকে তৃষিত উপবাসী। ! তাই যুগের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে অক্ষম, কম্পিউটারে ফেল এক সাধারণ শিক্ষকের ততোধিক সাধারণ সাহিত্য আলোচনা তাঁর এতোটা ভালো লেগেছে যে বাধ্য হয়ে তিনি কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। 'পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি'..... কিন্তু তারপরও মনে হয়েছে যেন এলদোরাদোর দেশে পৌঁছে গেছি। দ্বার বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা রোখার কোনো ইচ্ছে নেই আমাদের। একই সঙ্গে রোবট মানবও কাঙ্ক্ষিত নয় আমাদের। মানব সন্তানের ভেতর যে স্বাভাবিক সৌজন্য-শিষ্টাচার-মূল্যবোধ-সামাজিকতা-শোভনতা-শালীনতা চিন্তায়-কর্মে যে সৃজনশীলতা কাম্য, তা যেন বিসর্জিত না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে শিক্ষক, পরিবার, সমাজ, সর্বোপরি মা-বাবাকে। কোনো কিছুর বিনিময়েই উদ্ধত উন্নাসিক ইস্পাত ঝকঝকে অথচ মানবিক বোধ বর্জিত প্রজন্ম কাঙ্ক্ষিত নয় আমাদের।

বাংলা কবিতার ছন্দপরিচয়

মুহম্মদ হায়দার আলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের কবিতা পড়াতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে পাঠ্য কবিতাগুলোর 'পাঠ-পরিচিতি' অংশে সংশ্লিষ্ট কবিতার ছন্দ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয়া হয়েছে, তা ছন্দ বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই কবিতা পাঠদানকালে ছন্দ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি অশেষ কৌতূহল লক্ষ করেছি। কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তাদের জানার এ কৌতূহল নিবৃত করার প্রয়োজনীয়তাবোধই আমার এ লেখার প্রেরণা। কৌতূহলী শিক্ষার্থীরা কিছুটা উপকৃত হলে আমার এ লেখার উদ্দেশ্য সফল হবে।

প্রথমেই জানা দরকার ছন্দ কী? অনেকেরই ধারণা যে, ছন্দ হল কবিতার পংক্তিগুলোর শেষ ধ্বনির মিলবিন্যাস, যেমন– "কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল।" অথবা "যেসবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।" এ ধরনের 'ডাল' ও 'কাল' এবং 'বাণী' ও 'জানি' এর অন্ত্যধ্বনিগত মিলবিন্যাস প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতা রচনার রীতি–যা ছন্দ নয়। ছন্দ হল কবিতায় ধ্বনি ও মাত্রা বিন্যাসের সৌষম্য। ছন্দের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবহারের ফলে কবিতায় যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা কবিতাকে করে তোলে শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।

বাংলা কবিতার ছন্দ প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা– স্বরবৃত্ত ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। এসব ছন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য যেসব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন, প্রথমে সেগুলোর পরিচয় দেয়া যাক।

ধ্বনি : মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার– স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও না কোথাও বাধা পায়।

অক্ষর : এক প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দমধ্যস্থ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে অক্ষর বলে। অক্ষর বর্ণ নয়। ইংরেজিতে Syllable বলতে যা বোঝায় বাংলায় অক্ষর তাই। অক্ষর দুই প্রকার–মুক্তাক্ষর (Open Syllable) ও বদ্ধাক্ষর (Closed Syllable)।

মুক্তাক্ষর : যে অক্ষর উচ্চারণকালে আটকে যায় না, বরং মুক্ত বা স্বাধীনভাবে টেনে উচ্চারণ করা যায়, তাকে মুক্তাক্ষর বলে। যেমন : "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" পংক্তিতে 'আ', 'সো', 'লা', 'আ', 'মি', 'তো', 'ভা', 'ল', 'বা', 'সি' হল মুক্তাক্ষর।

বদ্ধাক্ষর : যে অক্ষর উচ্চারণকালে আটকে যায়, মুক্ত বা স্বাধীনভাবে টেনে উচ্চারণ করা যায় না, তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন : "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" পংক্তিতে 'মার', নার', 'বাং', 'মায়' হল বদ্ধাক্ষর।

অক্ষরচিহ্ন : কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণের জন্য অক্ষর নির্দেশের ক্ষেত্রে অক্ষরের উপরে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্ষরচিহ্ন বলে। মুক্তাক্ষর নির্দেশের জন্য 'V' চিহ্ন এবং বদ্ধাক্ষর নির্দেশের জন্য '–' চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা : একটি অক্ষর উচ্চারণের নিম্নতম কালপরিমাণকে মাত্রা বলে। প্রধান তিন শ্রেণির ছন্দে মাত্রা গণনার রীতি তিন রকমের। মুক্তাক্ষর তিন প্রকার ছন্দেই ১ মাত্রা গণনা করা হয়। বদ্ধাক্ষর স্বরবৃত্ত ছন্দে সর্বদা ১ মাত্রা, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্বদা ২ মাত্রা এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের আদিতে ও মাঝে ১ মাত্রা এবং শেষে ২ মাত্রা গণনা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'বাংলাদেশ' শব্দটি স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় ৩ মাত্রা, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় ৫ মাত্রা এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় ৪ মাত্রা গণনা করা হয়। মূলত বদ্ধাক্ষরের মাত্রা গণনার রীতিভেদের জন্যই বাংলা কবিতার ছন্দ বৈচিত্র্যময়।

মাত্রাচিহ্ন : কবিতায় মাত্রা গণনার জন্য অক্ষরচিহ্নের উপরে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে মাত্রাচিহ্ন বলে। ১ মাত্রা নির্দেশের জন্য 'i' এবং ২ মাত্রা নির্দেশের জন্য 'ii' ব্যবহার করা যেতে পারে।

পংক্তি বা চরণ : কবিতার প্রতিটি লাইন বা সারিকে পংক্তি বা চরণ বলে। ছন্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পংক্তি বা চরণের মাত্রাসংখ্যা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

পর্ব : কবিতা আবৃত্তি করার সময় পংক্তির মধ্যে এক বা একাধিক স্থানে উচ্চারণবিরতি দিতে হয়। পংক্তির শুরু থেকে বিরতিস্থান পর্যন্ত এবং এক বিরতিস্থান হতে পরবর্তী বিরতিস্থান পর্যন্ত কবিতাংশকে পর্ব বলে। পর্ব তিন প্রকার, যথা : পূর্ণপর্ব, অপূর্ণপর্ব ও অতিপর্ব।

পূর্ণপর্ব : কবিতার পংক্তিতে কোনো ছন্দের স্বাভাবিক মাত্রাসংখ্যার পর্বকে পূর্ণপর্ব বলে। যেমন :

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান ৪+৪+৪+১

স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত একটি ছড়ার উল্লিখিত পংক্তির ৪ মাত্রার প্রথম তিনটি পর্ব পূর্ণপর্বের উদাহরণ।

অপূর্ণপর্ব : কবিতার পংক্তির শেষে অবস্থিত পূর্ণপর্বের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রাসংখ্যার পর্বকে অপূর্ণপর্ব বলে। যেমন:

শিব ঠাকুরের / বিয়ে হবে / তিন কন্‌নে / দান। ৪+৪+৪+১

স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত একটি ছড়ার উল্লিখিত পংক্তির ১ মাত্রার শেষ পর্বটি অপূর্ণ পর্বের উদাহরণ।

অতিপর্ব : কবিতার পংক্তির শুরুতে অবস্থিত পূর্ণপর্বের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রাসংখ্যার পর্বকে অতিপর্ব বলে। যেমন:

মহা– / বিদ্রোহী রণ –/ ক্লান্ত ২+৬+৩

আমি / সেই দিন হব / শান্ত, ২+৬+৩

যবে / উৎপীড়িতের / ক্রন্দন –রোল / আকাশে–বাতাসে / ধ্বনিবে না, ২+৬+৬+৬+৪

অত্যাচারীর / খড়্গ কৃপাণ / ভীম রণ–ভূমে / রণিবে না। ৬+৬+৬+৪

উল্লিখিত প্রথম তিনটি পংক্তির শুরুতে ব্যবহৃত ২ মাত্রার পর্বই অতিপর্বের উদাহরণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাংশটিতে অতিপর্ব, পূর্ণপর্ব ও অপূর্ণপর্বের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার ও চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।

মধ্যখণ্ডন : কবিতার পংক্তিতে পর্ববিভাগ দেখানোর জন্য কখনো কখনো কোনো শব্দকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন হয়, একে মধ্যখণ্ডন বলে। যেমন :

গাহি সাম্যের / গান – ৬+২

মানুষের চেয়ে / বড় কিছু নাই / নহে কিছু মহী/য়ান। ৬+৬+৬+২

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত উল্লিখিত কবিতাংশের দ্বিতীয় পংক্তিতে ৬ মাত্রার তিনটি পূর্ণপর্ব ও ২ মাত্রার একটি অপূর্ণপর্ব রয়েছে। শেষ পূর্ণপর্ব ও অপূর্ণপর্ব দেখানোর জন্য 'মহীয়ান' শব্দটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে হয়েছে।

ছন্দ সম্পর্কে উল্লিখিত প্রাথমিক ধারণা প্রদানের পর নিম্নে প্রধান তিন শ্রেণির ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

স্বরবৃত্ত ছন্দ

স্বরবৃত্ত ছন্দ বাংলা কবিতার আদি ছন্দ হিসেবে পরিচিত। এ ছন্দে মূলত ছড়া ও সঙ্গীত রচিত হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর সর্বদা ১ মাত্রা ধরে গণনা করা হয় বলে এটি দ্রুতলয়ের ছন্দ। এ ছন্দের মাত্রা গণনার সাধারণ রীতি হল পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রা এবং অপূর্ণপর্ব ২ মাত্রা। অবশ্য কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে পূর্ণপর্ব ৩ মাত্রার ও অপূর্ণপর্ব ১ মাত্রার হয়ে থাকে।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'কাজলা দিদি' কবিতার পংক্তিতে ৪ মাত্রার তিনটি পূর্ণপর্ব এবং ১ মাত্রার একটি অপূর্ণপর্বের স্বরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ লক্ষণীয় :

বাঁশ বাগানের / মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে / ঐ — ৪+৪+৪+১

মাগো আমার / শোলক বলা / কাজলা দিদি / কৈ? — ৪+৪+৪+১

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'আমি হব' ছড়ার পংক্তিতে মাত্রাসংখ্যার অসম বিন্যাস স্বরবৃত্তের নির্মাণশৈলীতে এনেছে অভিনবত্ব:

আমি হব / সকাল বেলার / পাখি — ৪+৪+২

সবার আগে / কুসুমবাগে — ৪+৪

উঠব আমি / ডাকি। — ৪+২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'ঝর্ণার গান' কবিতায় স্বরবৃত্ত ছন্দের ৩ মাত্রার দুটি করে পূর্ণপর্বের পংক্তিগঠনের ব্যতিক্রমী উদাহরণ লক্ষণীয় :

চপল পায় / কেবল ধাই, — ৩+৩

কেবল গাই / পরীর গান, — ৩+৩

পুলক মোর / সকল গায়, — ৩+৩

বিভোল মোর / সকল প্রাণ। — ৩+৩

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

মাত্রাবৃত্ত মধ্যলয়ের গুরুগম্ভীর ছন্দ। এ ছন্দে সাধারণত মহাকাব্য ও গীতিকবিতা রচিত হয়ে থাকে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তাক্ষর ১ মাত্রা ও বদ্ধাক্ষর সর্বদাই ২ মাত্রা ধরে গণনা করা হয়। সাধারণত এ ছন্দের পূর্ণপর্ব ৬ মাত্রা ও অপূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার হয়ে থাকে। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সেক্ষেত্রে পূর্ণপর্ব ৫, ৭ বা ৮ মাত্রার ও অপূর্ণপর্ব ২ মাত্রার হয়ে থাকে।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ব্যাপক বৈচিত্র্য এনে প্রবহমানতা সঞ্চার করেছেন। তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক মাত্রার পর্ববিভাগ ও অসম মাত্রার পংক্তিগঠনের উদাহরণ লক্ষণীয় :

গাহি সাম্যের / গান – ৬+২
যেখানে আসিয়া / এক হয়ে গেছে / সব বাধা-ব্যব/ধান, ৬+৬+৬+২
যেখানে মিশেছে / হিন্দু – বৌদ্ধ / মুসলিম / ক্রিশ্চান। ৬+৬+৬+২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতায় ৮+৫ মাত্রার ব্যতিক্রমী মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসাথে পংক্তিগঠনেও এসেছে বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা :

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই / - ছোট সে তরী ৮+৫
আমারি সোনার ধানে / গিয়েছে ভরি। ৮+৫
শ্রাবণ গগন ঘিরে ৮
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে, ৮
শূন্য নদীর তীরে ৮
রহিনু পড়ি – ৫
যাহা ছিল নিয়ে গেল / সোনার তরী। ৮+৫

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক ছন্দ। এ ছন্দ ধীরলয়ের ধ্বনিতরঙ্গে বিন্যস্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মুক্তাক্ষর সর্বদা ১ মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষর শব্দের প্রথমে ও মাঝে ১ মাত্রা এবং শব্দের শেষে ২ মাত্রা ধরে গণনা করা হয়। ১৪ মাত্রার পংক্তির দুটি পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাধারণত ৮+৬ হয়ে থাকে। অবশ্য কখনো কখনো এ ছন্দের পর্ববিভাগ ৮+১০ বা ৮+৮+১০ মাত্রার হতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পয়ার কবিতার গতানুগতিক অন্ত্যমিলরীতি পরিবর্তন করে অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ৮+৬=১৪ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দে আধুনিক বাংলা কবিতা রচনা করেন। মধুসূদন প্রবর্তিত এ ছন্দই অক্ষরবৃত্ত নামে পরিচিত। মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের হাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অসীম বৈচিত্র্যে বিকশিত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অংশবিশেষ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় অমিত্রাক্ষর তথা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক মাত্রার পর্ববিন্যাস লক্ষণীয় :

এতক্ষণে – অরিন্দম / কহিলা বিষাদে, ৮+৬
জানিনু কেমনে আসি / লক্ষ্মণ পশিল ৮+৬
রক্ষপুরে ! হায়, তাত / উচিত কি তব ৮+৬
এ কাজ? নিকষা সতী / তোমার জননী! ৮+৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঐকতান' কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ১৪ ও ১৮ মাত্রার অসম পংক্তি নির্মাণ করে বৈচিত্র্য এনেছেন :

বিপুলা এ পৃথিবীর / কতটুকু জানি। ৮+৬
দেশে দেশে কত-না / নগর রাজধানী – ৮+৬

মানুষের কত কীর্তি, / কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, ৮+১০
কত-না অজানা জীব, / কত-না অপরিচিত / তরু ৭+৭+২
রয়ে গেল অগোচরে / বিশাল বিশ্বের আয়োজন; ৮+১০
মন মোর জুড়ে থাকে / অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ। ৮+১০

স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত – বাংলা কবিতার এই প্রধান তিন প্রকারের ছন্দ ছাড়াও রয়েছে 'মুক্তক ছন্দ' নামে একটি আধুনিক ছন্দধারা। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই অত্যাধুনিক কাঠামো মুক্তক ছন্দের মূল উৎস। বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের কবিতায় স্বাধীন পার্বিক ও স্বাধীন মাত্রিক পংক্তি নির্মাণের যে অভিনব রীতির উদ্ভব ঘটে তাই 'মুক্তক ছন্দ'। বাংলা কবিতায় মুক্তক ছন্দের পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ মাত্রা থেকে ১৮ মাত্রার মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'শাজাহান' কবিতার কয়েকটি পংক্তি লক্ষণীয় :

তাই ২
চিহ্ন তব পড়ে আছে, / তুমি হেথা নাই। ৮+৬
যে প্রেম সম্মুখ পানে ৮
চলিতে চালাতে নাহি জানে, ১০
যে প্রেম পথের মধ্যে /পেতেছিল নিজ সিংহাসন, ৮+১০
তার বিলাসের সম্ভাষণ ১০
পথের ধুলার মতো / জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে – ৮+১০
দিয়েছে তা ধূলিরে ফিরায়ে। ১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালে এবং পরবর্তীকালে আধুনিক কবিগণ মুক্তক ছন্দের গদ্য কবিতা রচনায় বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব এনেছেন। এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান প্রমুখ কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি আহসান হাবীব রচিত 'সেই অস্ত্র' কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে মুক্তক গদ্যছন্দের অসম পর্ববিন্যাস লক্ষণীয় :

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে/দাও ১০+২
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি ১০
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র ১০
আমাকে ফিরিয়ে দাও। ৮

প্রকৃতপক্ষে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত – বাংলা কবিতার এ প্রধান তিন প্রকার ছন্দের রূপ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। অক্ষরের মাত্রা গণনার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ায় ছন্দত্রয়ের লয়, ধ্বনিতরঙ্গ এবং উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যও স্বকীয়তামণ্ডিত। বাংলা কবিতায় প্রধান তিন প্রকার ছন্দেরই প্রাধান্য থাকলেও আধুনিক কবিদের নিকট প্রিয় ছন্দ হল স্বাধীন পার্বিক অপ্রবহমান অক্ষরবৃত্ত তথা মুক্তক ছন্দ। আধুনিক কবিগণ এ ছন্দকেই দান করে চলেছেন বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও শৈল্পিক তাৎপর্য।

অতীত দিনের স্মৃতি/ কেউ ভুলে না কেউ ভুলে

কামরুন্নাহার খানম
সহযোগী অধ্যাপক (অবঃ)
বাংলা বিভাগ

৫ জুন, বৃহস্পতিবার ২০১৪। সকাল ১১.০০ টায় অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান সুবহানী কর্তৃক নিমন্ত্রণে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়েছি। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই উপস্থিত। সাজানো-গোছানো। কিন্তু বিউগলে করুণ সুর বাজছে। সবাই চুপচাপ। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আজ সাপ্তাহিক মঞ্চ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘদিনের নিয়মানুযায়ী সমবেত হয়েছি। এই মঞ্চে বিগত ২০ বছরে আমি শত শত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সমাবেশ থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক ও বার্ষিক মঞ্চ প্রতিযোগিতা, নবীনবরণ উৎসব, বিদায় সংবর্ধনা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের মত বিনিময় অনুষ্ঠান, বর্ষবরণ, বর্ষবিদায়, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের সম্মিলিত অনুষ্ঠান, পহেলা বৈশাখ, বির্তক অনুষ্ঠান, মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, সেমিনার কত কী? আজ আর কোন প্রতিযোগিতা নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের আয়োজনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আমি আবেগাপ্লুত। নিজেকে আজ কর্ম অবসানের সম্রাজ্ঞী মনে হচ্ছে।

নষ্টালজিয়া আমাকে বার বার পিছনে নিয়ে যায়। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। ভেসে ওঠে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখের দিনটি। যথারীতি ক্লাস চলছে। আমি নিজেও ক্লাসে যাই। হঠাৎ করেই পড়াতে পড়াতে আমার কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। ক্লাসের সব ছাত্র হতবাক হয়ে যায়। ছাত্রদের প্রশ্নবাণে আমি হক-চকিয়ে যাই।

ম্যাডাম আপনার কি হয়েছে? আপনার কি শরীর খারাপ? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমি নিজেকে সংবরণ করে বলি, আর তো মাত্র কটা দিন। এরপর আর তোমাদের কোন ক্লাস নিতে আসবো না। ছোট ছোট শিশু, কিশোর ও তরুণদের বায়না আমার হৃদয় স্পর্শ করে যায়। আমার হৃদয়ে কান্নার ঝর্ণা বইতে থাকে।

ক্লাস শেষ করে জুনিয়র বিল্ডিং-এ এসে দেখি আমার প্রিয় নারী সহকর্মীরা খাওয়া-দাওয়ার এক বিশাল আয়োজন করেছে। উপলক্ষ ৩০ সেপ্টেম্বর আমার কর্মজীবনের শেষ দিন। সহকর্মীরা এক এক জন এক এক আইটেম রান্না করে এনেছে। এ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ পত্নী, উপাধ্যক্ষবৃন্দ সহ দিবা শাখার অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের এই আন্তরিকতা ভুলবার নয়।

এরপর ১২ সেপ্টেম্বর দিবা শাখার একাদশ শ্রেণির ছাত্ররা আর একটি বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। সেখানে দিবা শাখার অনেক পুরনো ছাত্র উপস্থিত ছিল। তাদের এই আয়োজিত অনুষ্ঠান দেখে মনে হয়েছে অনেক পরিপক্ব হয়েছে ছাত্ররা। ওরা কলেজ অডিটোরিয়ামে বড় করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা শ্রেণিকক্ষে বেশ বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অরিত্র, লুব্ধক, জায়েদ, রণন, মেহেদী এবং রায়হানসহ আরো অনেকে সকল ছাত্রের পক্ষে দিনে রাতে খেটে এ অনুষ্ঠান তৈরি করেছে। আমার জীবন বৃত্তান্ত ও কর্ম জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সিডি এবং স্যুভেনির তৈরি করেছে। এসব ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিকভাবে যিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তিনি হলেন রফিকুল ইসলাম সেলিম স্যার। তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারপর ২৬শে মার্চ ২০১৪ তারিখে শিক্ষক মিলনায়তনে দিবা শাখার সকল শিক্ষক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ছাত্র এবং সহকর্মী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এত ভালোবাসা আমার বাকী জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবাসিক এবং অনাবাসিক ছাত্র দ্বারা পূর্ণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হলো মাতৃতুল্য ও পিতৃসম শিক্ষকের। যাঁদের নিবিড় তদারকিতে এই প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র হয়ে উঠবে আদর্শ শিক্ষিত ও সুনাগরিক। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রায় সকল শিক্ষকই শিক্ষাদানের পাশাপাশি নিয়ম-শৃঙ্খলা, মানবিক গুণাবলি ও প্রতিভা বিকাশের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাইতো বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই কলেজ অন্যতম। আজ কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠানে এসে ভাবছি এ কলেজে চাকুরিতে যোগদানের গোড়ার কথা।

সে আজিকে হল কতকাল,
তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল।

বিশ বছর আগে ১৯৯৩ সালের ১৮ই জুলাই যেদিন প্রথম ১২

জন শিক্ষক ঢাকা রেডিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দিবা শাখায় যোগদান করি, আমি সেদিনের কথা বলছি। উপাধ্যক্ষ স্যার সহ ১৩ জনের একটি পরিবার। কোন কোন দিন এক একজন শিক্ষক-কে ৭টি পিরিয়ড নিতে হতো। প্রত্যেক শিক্ষককেই ৭/৮ সেট খাতা দেখতে হতো টার্মিনাল পরীক্ষায়। তবু সবার মুখে হাসি যেন লেগেই থাকত। ক্লান্তির কোনো ছাপ দেখিনি কোন শিক্ষকের মুখে। তখন আমরা দিবা শাখার শিক্ষকেরা বাসা থেকে রান্না করে টিফিন নিয়ে এসে একসাথে খেতাম। শুধু চা বানানো হত স্টাফ রুমে। এক একজনের এক একদিন দায়িত্ব ছিল। উপাধ্যক্ষ কাজী রেজাউল ইসলামও এই দায়িত্ব থেকে বাদ পড়েন নি। একটি সুন্দর ছিমছাম পরিবার। ১৯৯৩ সালের মার্চে প্রভাতী শাখার শিক্ষকদের নিয়ে দিবা শাখার ক্লাস শুরু করা হলেও, দিবা শাখার ক্লাস পুরোদমে শুরু হয় ১৮ জুলাই ১৯৯৩ সাল থেকে।

তারপর থেকে চলতে থাকে দিবা শাখার এই শিশু প্রতিষ্ঠানের বিনির্মাণের কাজ। আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে একনিষ্ঠ ভালোবাসা দিয়ে দিবা শাখার বেড়ে উঠতে আত্মনিয়োগ করি। ক্লাস টাইমের বাইরে প্রায় প্রতিদিনই ৩-৪ ঘন্টা সময় দিয়েছি। কখনো অতিরিক্ত কোচিং ক্লাস নিয়েছি। আবার কখনো বাইরের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র তৈরি, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য অনুশীলন করিয়ে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জনে মায়ের ভূমিকায় কাজ করেছি। এই কাজগুলো একেবারে নির্বিঘ্নে করতে পেরেছি তা নয়। কখনো কখনো অনেক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমি দমে যাই নি। আর আমাকে যারা সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন তারা হচ্ছেন ম্যাডাম আসমা পাঠান, আসমা বেগম, ফাতেমা জোহরা ও শহীদ উল্লাহ্ স্যার প্রমুখ। ১৯৯৫ সালের দিবা শাখার প্রথম এস এস সি ব্যাচে ২৫ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের মধ্যে ২১ জন স্টার ও বাকী ৪জন প্রথম বিভাগে পাশ করে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। দিবা শাখার রেজাল্ট প্রভাতী শাখার সমপর্যায়ে হতে থাকে। কখনো প্রভাতী শাখাকেও ছাড়িয়ে যায় দিবা শাখার রেজাল্ট।

১৯৯৪ সাল থেকে কলেজের ঐতিহ্য অনুযায়ী দিবা শাখায়ও শুরু হয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। প্রথম দিকে আলাদা আলাদা মাঠে ও মঞ্চে হত। সবই প্রভাতী শাখার অনুকরণে। কিন্তু নিজস্ব প্রযোজনায়। একটা কথা না বললেই নয়, কাজ করতে গিয়ে যখন যেখানে ঠেকে গেছি তখনই ছুটে গেছি ফেরদৌস আপার কাছে। তিনি আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছেন। হাত বাড়িয়েছেন বন্ধুত্বের। আমি তাঁর কাছে ঋণী। দিবা শাখার বেড়ে উঠার পেছনে প্রভাতী শাখার শিক্ষকদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। দিবা শাখার শিক্ষক প্রতিনিধি বাকাবিল্লাহ স্যার এবং সাবেক অধ্যক্ষ কর্নেল কামরুজ্জামান স্যারের নিরন্তন প্রচেষ্টা ও আন্তরিক প্রয়াসে DRMC একই বৃন্তে দুটি ফুল প্রভাতী ও দিবা শাখা আজ সমন্বিত হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই একাকার হয়ে গেছে। বৈষম্য দূর হয়ে গেছে।

আমরা আজ এখানে এক দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উপস্থিত হয়েছি। ইতোমধ্যে অনেকের বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে মঞ্চে ডাকবে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। এবার আমার ডাক পড়েছে। আমি উঠে মঞ্চে যেতে যেতে ভাবছি।

আজ কোন মোর মাঝে / কোন দৈন্য কোন শূন্য নাই.....। আসা আর যাওয়ার খেলা চলছে এই পৃথিবীতে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই এখানে জীবনের ধারাবাহিকতায় শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের লীলাভূমি তৈরি হয়েছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের প্রয়োজনে ধর্ম এসেছে। তখন থেকেই ধর্ম মানুষকে কর্মক্ষেত্রে সততার বাণী শুনিয়েছে। আর এই কর্মক্ষেত্রে আমরা যখন প্রবেশ করি, তখন কেউ ভুলেও ভেবে দেখিনি যে, এই কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটবে। কর্মীর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে একটি নাম। পৃথিবীর নিয়মের এই ধারাবাহিকতায় নতুন মানুষেরা দখল করে নিবে পুরনোদের স্থান। তবু কোনো কোনো মানুষ তাঁর কর্মের মাধ্যমে এমন এক অবস্থান সৃষ্টি করেন যে, নতুনেরা শত শত বছর ধরে তাদের অনুসরণ করেন। প্রকৃতির নিয়মে একদিন গাছের পুরানো পাতা ঝরে যায় বসন্তের আগমনে। বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতারা জন্ম নেয়। কিন্তু প্রতিটি বোঁটায় থেকে যায় পুরনো পাতার চিহ্ন।

আমার শিক্ষকতা জীবনের বড় একটা সময়, DRMC এর শ্রেণিকক্ষ, অডিটোরিয়াম, বটতলা, কলেজপ্রাঙ্গণ, বিহঙ্গনীড় ও খেলার মাঠে কাটিয়েছি। এই কলেজ থেকে আমি শিখেছি এবং পেয়েছি অনেক। সাধ্যানুসারে দেবারও চেষ্টা করেছি। সন্তানতুল্য ছাত্রকে কখনো শাসন করেছি। আবার ভালোবেসেছি। কোনো কোনো ছাত্র কখনো ময়লা শার্ট, প্যান্ট পরে এলে বকেছি। তারপর নতুন শার্ট, প্যান্ট, বেল্ট কিনে পরিয়ে দিয়েছি। কখনো কাছে নিয়ে এসে ব্যাগ থেকে খাবার খাইয়েছি মুখে তুলে। সহকর্মীদের অনেক কটু বলেছি আবার ভালোবেসে কাছেও টেনে নিয়েছি। কর্মচারীদের ধমক দিয়েছি আবার স্নেহও দিয়েছি।

তবুও সময় হল শেষ..... চলে যেতে হবে। এই ঘাট থেকে আমাকে নোঙর তুলতে হবে। যেতে হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনো খানে।

মেঘ বালিকা (৩)

রতন সরকার
সহকারী অধ্যাপক
চারু ও কারুকলা

নানা রঙের মেঘের ভেলায়
কে যাও তুমি মেয়ে?
আমি তোমার সঙ্গে যাব
যাবে আমায় নিয়ে?
মেঘের দেশের মেয়ে আমি
মেঘের দেশেই ঘর
মেঘ বালিকা নামটি আমার
মেঘমল্লা বর।
বাংলাদেশের ছেলে তুমি
থাক শ্যামল গাঁয়
আমার ভেলায় তোমার জন্য
জায়গা খালি নাই।

মেঘ বালিকা (৪)

মেঘ বালিকা মেঘ বালিকা
মেঘের দেশে ঘর
মেঘের সাথেই বিয়ে তোমার
মেঘমল্লা বর।
নীল মেঘেরই শাড়ীর সাথে
হলুদ মেঘের পাড়
বধূবেশে লাগবে তোমায়
ভারী চমৎকার।
লাল মেঘেরই ফিতায় বাঁধা
কালো মেঘের চুল,
পরিয়ে দেব কানে তোমার
হরিৎ মেঘের দুল।
তারার মেলা চাঁদের টিপ
সাজবে বধূবেশে
হাতটি ধরে নিয়ে যাবে
মেঘমল্লা এসে।

বি. দ্র. মেঘ বালিকা (১) ও (২) ২০১২ সালের সন্দীপনে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি: একটি সরল বীক্ষণ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

প্রাক্ কথন:

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাংলাদেশে একটি নবতর পদ্ধতি। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষা বাংলা প্রথমপত্র সৃজনশীল প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি নামকরণ করা হলে অভিভাবকগণ এই নতুন পদ্ধতি মেনে নিতে চাননি বরং শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে তারা এই পদ্ধতির ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েন। পরে অভিভাবকগণকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজনে একে 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি' নামে নামকরণ করা হয়।

ফিরে দেখা:

পাঠক এই প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জানেন মেনে নিয়েই আলোচনা করছি। বর্তমানে আমরা যে সৃজনশীল প্রশ্নের সঙ্গে পরিচিত শুরুতে তা এমন ছিল না। তখন বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলপাঠের যে কোনো অনুচ্ছেদ উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যেত। বিষয়টি ছিল সত্যিই বিরক্তিকর। কারণ এ ধরনের উদ্দীপকের অধীনে যে প্রয়োগমূলক প্রশ্ন প্রণয়ন করা হতো তা ছিল হাস্যকর। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের কথা বলা যেতে পারে। গল্পটি থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োগমূলক প্রশ্নে বলা হতো- ফটিকের মতো এমন কোনো চরিত্রের কথা তোমার জানা থাকলে বর্ণনা দাও। শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছেমত ফটিকের মত চরিত্র দিয়ে গল্প ফেঁদে বসতো। উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের অবস্থা ছিল আরো করুণ। কারণ উদ্দীপকের একটি বাক্য উদ্ধৃত করে তাকে বিশ্লেষণ করতে বলা হতো। যাই হোক পরবর্তীতে আমরা দেখলাম শিক্ষাবোর্ড এসএসসি পরীক্ষা-২০১০ এর প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন সারাদেশে সরবরাহ করেছে এবং সেখানে সম্পূর্ণ ইউনিক (অনন্য) উদ্দীপকের অধীনে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের প্রশ্ন করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার যে বোর্ডপ্রশ্ন দেখি তা আর সেই সময়ের প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নে ছিল প্রায় অভিন্ন। পার্থক্য এতটুকু যে

বর্তমানে বোর্ডপ্রশ্নে যেমন বিভিন্ন চিত্র উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সময় এমন ছিল না।

সনাতন পদ্ধতি বনাম সৃজনশীল পদ্ধতি:

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশে যে প্রশ্নপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা ছিল এক অর্থে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ এবং নানা দোষে দুষ্ট। মুখস্থ বিদ্যার জোর ছিল তখন বেশি। যার যত মুখস্থ ক্ষমতা সে ছিল তত ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যারা পঠিত বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত কিন্তু মুখস্থ করতে পারত না তারা ছিল একরকম পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা মূল বই ছেড়ে দিয়ে ভালো নোটের সন্ধানে ব্যস্ত থাকত বেশি। কোন প্রকাশনীর নোট ভালো বা কোন শিক্ষকের হ্যান্ড নোট ভালো তা সংগ্রহ করা ছিল শিক্ষার্থীদের অন্যতম কাজ। এমন কি কোনো কোনো ভালো ছাত্রের করা উন্নতমানের নোটের খোঁজে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ছাত্ররা ধরনা দিত হামেশায়। বোর্ডের প্রশ্নের ধরনও এমন ছিল যে পুরো বই না পড়ে মুষ্টিমের হাতে গোনা কয়েকটি অধ্যায়ের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর আত্মস্থ করতে পারাই ছিল যথেষ্ট। পরবর্তীতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রবর্তিত হওয়ার পর (১৯৯২) ছাত্ররা মূল বইয়ের দিকে ধাবিত হয়। তবে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রবর্তনের প্রথম কয়েক বছর বোর্ড কর্তৃক প্রশ্ন ব্যাংক সরবরাহ করায় ছাত্ররা শুধু প্রশ্ন ব্যাংকের উপরই নির্ভর করত। কারণ তখন প্রশ্ন ব্যাংকের ভিতর থেকেই বোর্ডের প্রশ্ন করা হত। পরবর্তীতে বোর্ড এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে সময়ের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বর্তমানের মত উন্নতমানের ছিল না। বেশির ভাগই ছিল জ্ঞানমূলক ক্বচিৎ অনুধাবনমূলক। প্রশ্নের ধরনও ছিল একেবারেই সাধারণ। এখন যেমন চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরই বহুনির্বাচনি প্রশ্নে যাচাই করা হয় তখন তা ছিল না। প্রশ্নের ধরনের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেরূপ সাধারণ, বহুপদী সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয় তখন তা ছিল চিন্তাতীত। ফলে বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যেমন মূলপাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো বুঝে বুঝে আয়ত্ত করতে বাধ্য হয় তখন এর প্রয়োজন ছিল না। কিছু তথ্য-উপাত্ত আয়ত্ত করাই তখন যথেষ্ট ছিল। প্রায়োগিক দিক তো একেবারেই ছিল না। বিশেষ করে বর্তমানে যেমন অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক ব্যবহার করে যেভাবে মূলপাঠকে সংশ্লিষ্ট করা হয় এবং শিক্ষার্থীর প্রায়োগিক দিকটি যাচাই করা হয় তখন তা ছিল অচিন্তনীয়। সুতরাং বর্তমানে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শ:

সৃজনশীল পদ্ধতিতে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরে ভালো করতে হলে শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু নিয়ম মেনে পড়াশুনা করতে হবে। প্রথমেই আসে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের প্রসঙ্গ। জ্ঞানমূলক প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার সবচেয়ে নিম্নস্তর। জানাতথ্য স্মরণ করে লিখতে বা বলতে পারাই হচ্ছে এ পদ্ধতিতে জ্ঞান। সুতরাং তোমার পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসভুক্ত মূলপাঠের মধ্যে মূলপাঠ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় যত তথ্য আছে তা আয়ত্ত করতে হবে। চরিত্রের নাম, চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, স্থানের নাম, সাল, তারিখ ইত্যাদি মুখস্থ করতে হবে। এগুলো মুখস্থের কোনো বিকল্প নেই। এরপর অনুধাবনমূলক প্রশ্ন। অনুধাবনমূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থীর কোনো বিষয় অনুধাবন করা বা বুঝতে পারার দক্ষতাকে যাচাই করা হয়। মূলপাঠের সকল অনুষঙ্গকে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত অর্থেই বুঝতে পেরেছে কিনা তা ই এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক এবং উপন্যাসে লেখক অনেক সময় দু এক বাক্যে অনেক কথা বলতে চান। সে কথাগুলো তাঁরা প্রসঙ্গ ক্রমেই বলেন। শিক্ষার্থীদের সেই পূর্বাপর প্রসঙ্গগুলো জানতে হবে। এক্ষেত্রে মূলপাঠ বারবার পড়ার কোনো বিকল্প নেই। মূলপাঠ বারবার পড়লেই ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ স্পষ্ট হতে থাকবে। এরপর প্রয়োগমূলক প্রশ্নের প্রসঙ্গ। প্রয়োগমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে ভিন্নতর ও নতুন কোন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে কী না তাই যাচাই করা হয়। সাধারণত সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও মূলপাঠের কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে এ ধরনের প্রশ্ন এ স্তরে করা হয়। তাই প্রয়োগমূলক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানের সক্ষমতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের মূলপাঠের চরিত্রগুলো সম্পর্কে অনুপুঙ্খভাবে জানতে হবে যাতে তারা উদ্দীপকের চরিত্রের সাথে মূলপাঠের চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারে। অধিকন্তু মূলপাঠে যে দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তাও তাদের জানতে হবে। এতে তারা উদ্দীপকে মূলপাঠে কোন দিকটি নির্দেশিত হয়েছে তাও বের করতে পারবে এবং যথার্থ উত্তর লিখতে পারবে। সবশেষে উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন। উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এ ধরনের প্রশ্নে যুগপৎ উদ্দীপক ও মূলপাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট একটি মৌল ধারণাকে বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে বলা হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূলপাঠ ও উদ্দীপক ছাড়াও সংশ্লিষ্ট আরো বিস্তৃত

জ্ঞান প্রয়োজন হয় যা তাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

শিক্ষার্থীদের আরও একটি সম্পূরক নির্দেশনা :
বাংলা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরে ভালো করতে হলে ছাত্রদের শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্য সম্পর্কে জানতে হবে। আমরা জানি সাহিত্য সমাজের দর্পণ ও ইতিহাসের উপাদান। সাহিত্যের জানালা দিয়ে আমরা আমাদের অতীতকে জানতে পারি, জানতে পারি আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাও বের হয়ে আসবে আমাদের অতীত সাহিত্য গভীর ও নিবিড় অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম থেকে শুরু করে হাল আমলের হুমায়ুন পর্যন্ত মাস্টার পিসগুলো ছাত্ররা আনন্দচ্ছলে পড়তে পারে। এতে করে তারা বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্তনও জানতে পারবে। কোনো জাতির ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইতিহাস ও ভাষার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া কেউ সে জাতির প্রকৃত স্পন্দন জানতে পারে না। সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরে ভালো করতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সে নাড়ীর স্পন্দন জানতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের উচিৎ ছাত্রদের পথনির্দেশ দেওয়া।

বোর্ড বইয়ে যে পাঠগুলো সংকলন করা হয়েছে সেই পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সিলেবাস বহির্ভূত অন্য পাঠও শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে হবে। কারণ একটি কবিতা বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট আরো দশটি কবিতা পড়তে হয়। সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের ক্ষেত্রেও তাই। যেমন 'আম আটির ভেঁপু' গল্পটি বুঝতে হলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারপিস 'পথের পাঁচালী' পড়তে হবে। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' বা 'অপরিচিতা' বুঝতে হলে গল্পগুচ্ছের 'হৈমন্তী'ও পড়তে হবে। এক্ষেত্রে বোর্ড বইয়ের পাঠশেষে পাঠ সহায়িকা শিরোনামে একটি তালিকা থাকতে পারে অথবা শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ বা নির্দেশনা দিতে পারেন।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ক সমালোচনা :
সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে অনেকেই তার সমালোচনা করে থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে এই সমালোচনা অমূলক নয়। যেমন অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তরের কথাই ধরা যাক। বলা হয়েছে চিন্তন দক্ষতার স্তর অনুসারে নম্বর দিতে হবে। অনুধাবনে দুই স্তর : জ্ঞান ও অনুধাবন, প্রয়োগে তিন স্তর জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতায় চারটি স্তর:জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক দক্ষতার জন্য ১ নম্বর করে বরাদ্দ। জ্ঞান তো হল জানা তথ্য স্মরণ করে লিখতে পারা। এতে নম্বর হেরফের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে। সকল শিক্ষার্থীর অনুধাবন ক্ষমতা, প্রায়োগিক দক্ষতা ও বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণের যোগ্যতা সমান নয়। ফলে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে তাদের চিন্তন দক্ষতার বহিঃপ্রকাশে তারতম্য লক্ষ করা যায়। কেউ হয়ত অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর সুন্দর করে ব্যাখ্যা করল অন্যজন হয়ত তেমন সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে পারল না। প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে কেউ হয়ত বেশ কয়েকটি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখলো আবার আর একজন দু'একটি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখিয়েই উত্তর শেষ করল। উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রেও একই কথা। বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেউ হয়ত অনেকগুলো পয়েন্ট উল্লেখ করল আবার কেউ দুই একটি পয়েন্ট উল্লেখ করেই উত্তর শেষ করল। সুতরাং সকলকেই একই পাল্লায় মাপা ঠিক হবে না। তাই ভগ্নাংশ নম্বর প্রবর্তন করা জরুরি। এক্ষেত্রে হয়ত যুক্তি দেখানো হতে পারে যে সকলেই তো দক্ষতার স্তরগুলে ছুঁয়েছে সুতরাং পূর্ণ নম্বর দিতে সমস্যা কোথায়? কিন্তু কথা হচ্ছে স্পর্শ করা আর শক্ত করে ধরা এক কথা নয়। কারণ ভালো জাতের বীজ আর সাধারণমানের বীজ দিয়ে একই রকম ফলন হয় না ।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় হলো সময়ের সংক্ষিপ্ততা। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসির খাতাগুলো মূল্যায়নের জন্য এতো কম সময় নির্ধারণ করে দেয় যে পারতপক্ষে খাতার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই খাতা মূল্যায়নের সময় বৃদ্ধি করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের মানসিক সমর্থনেরও প্রয়োজন। খাতা মূল্যায়নের সম্মানী বাড়ালে শিক্ষকগণ যথার্থভাবে খাতা মূল্যায়ন করতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

শিক্ষক হিসেবে আত্মসমালোচনা:
শিক্ষকগণ অনেক সময় এমন মানের প্রশ্ন প্রণয়ন করেন যা তাদের উচ্চতর পড়াশুনার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান দ্বারাই উত্তর দেয়া সম্ভব। শিক্ষার্থীরা, যারা সে জ্ঞান অর্জন করেনি তারা, কীভাবে এত উচ্চমানের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? তাই সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্তর বিবেচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজন শিক্ষক নিজের স্তর বিবেচনা করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন না বরং তাকে লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষার্থী কোন স্তরের? তারা কী জেএসসি, এসএসসি নাকি এইচএসসি স্তরের। সেই স্তর বিবেচনা করেই তাকে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে

হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা ভীতির শিকার হবে এবং তারা এ পদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

সৃজনশীল শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাগ্রে:
সৃজনশীল শিক্ষক ব্যতীত সৃজনশীল ছাত্র তৈরি করা কখনই সম্ভব নয়। সৃজনশীল শিক্ষক তৈরি করতে হলে সর্বস্তরের সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি এর আলোকে শ্রেণিপাঠদানে দক্ষ করে তুলতে হবে। সনাতন পদ্ধতির চাইতে এখন প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শ্রেণিপাঠদান যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। শিক্ষকতা পেশায় এখন প্রাণবন্ত, মেধাবী ও কর্মচঞ্চল নবীনদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এ পেশা তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে অবশ্যই সরকারকে বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে। শিক্ষকদের কাজের ভার পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে শিক্ষকতা পেশা নবীন চাকরি প্রার্থীদের কাছে এক ভীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এ ভীতি কাটাতে হবে এবং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন তাঁরা নিশ্চিন্তে জাতিকে সৃষ্টিশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রান্ত কথন:
সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মেধাকে শানিত করা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানো। বলা হয় Style is the man. সুতরাং একজনের Style এর সঙ্গে অন্য জনের Style এক হতে পারে না। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই স্বকীয় Style কে বের করে আনা সম্ভব এবং সর্বোপরি সম্ভব জাতির সৃজনীশক্তির উন্মেষ ঘটানো। তাই এ পদ্ধতির পরিচর্যা আবশ্যক। এর উৎকর্ষের জন্য চাই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলেরই নিরন্তর প্রচেষ্টা।

পতঙ্গপর্ব: আমাদের চক্রজাল

সৈয়দ তৌফিক জুহরী
প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন প্রভাষক
বাংলা বিভাগ

কিছু স্বপ্ন

অন্ধকার টানেলের একপ্রান্তে, কয়েক বিন্দু আলো পাওয়া
একগুচ্ছ দূর্বাঘাসের মতো জ্বলে আছে
আমার সমস্ত আকাশ। কী অপরূপ চাঁদ উঠেছে আজ...
হায়! দূর্বা কী বাঁচে চাঁদের আলো খেয়ে;
কিংবা জোছনার জল ভিজিয়ে যাবার পর সে-কি বিছিয়ে রাখে
ঘাসের পাপোশ?

তবুও এ মাঠের বুকে শুয়ে– দেখি, চাঁদ হেঁসে ওঠে।
দেয়ালবিহীন শূন্য ছাদে আর আমায় রেখো না আগুন;
ডানা আছে ভেবে পতঙ্গতৃষ্ণায় কখন যে ঝাঁপ দেই...
আরও শূন্যে উড়তে দেখে রুপোলি পালক...

...কিছু স্বপ্ন!

করতলে রেখে দেয়া একমুঠো চোখ যদি সাপের ডিমের মতো উষ্ণ হয়ে ওঠে,
জলপাত্রে ভিজিয়ে রাখা একগুচ্ছ ভুল যদি শয়তান শিয়ালের মতো করে চিৎকার,
তবে কী আর রইল বলো আমাদের; আমার?

এখন ডুবিয়ে কয়লাগুড়োয় এগারো আঙ্গুল, বের করে দেখে নেই পুড়ে যাওয়া ভুল-ক্ষতের মাশুল!

তবু বিপন্ন বাতাসে ভাবি-নদীগুলো বয়ে যাক, সারা রাত ঝরে যাক, নদীবুকে জমে থাক শুধু চাঁপাফুল....

হৃদয় নাড়ানো মৃত্যু

মোঃ ফারুক হোসেন
প্রভাষক, রসায়নবিজ্ঞান

ঠিক রাস্তাটি ঐ জায়গাতেই ছিল, যেখানে লাশ ছিল পড়ে
জানা নেই শবটি কার হতে পারে,
কিছু লোক জড়ো হল, ধীরে ধীরে বেলা গড়ায়
অচেনা জন হঠাৎ বলে উঠল, আরে!
এ তো পাশের বাড়ির, যার বাবা-মাকে হত্যা করেছে
একদল সৈন্য, সরকারি খরচে যারা ছিল পুষ্ট।
বর-কনে-ছেলে এই তিন জন মিলে
সুখ তারা পায় নি, সুখী করতে চেয়েছিল স্ব-বাছাকে
কিন্তু; তাকেও হারাতে হয়েছিল ক্ষুধার তাড়নায়,
যদি সেই বাহিনী হত্যা করে দিত বাবা-মার সাথে
তারা কষ্ট পেলেও তা নিভে যেত অস্ত্রের ডগায়।
ঠাঁই থেকে নেমে এল সাথে আছে কী?
ছিল শুধু তার বাবার স্মৃতিচিহ্ন একজোড়া জুতো।
বাবা নেই, মা নেই, নেই কোনো আত্মীয়,
বাঁচাটাই হয়ে গেল তার কাছে মন্ত্রীয়।
রাস্তায় নেমে খোঁজে
খাবার কোথায় পাবে, সে?
খুঁজল, খুঁজল অনেক পরে পেল সে।
ততক্ষণে মৃত্যুদূত তার দিকে হাত বাড়াল
সে রুটির বাক্স খোলার চেয়ে-
যমদূতকেই গ্রহণ করতে পছন্দ করল
হাত বাড়াতেই সে চলে গেল অনন্ত কালের ঠিকানায়.....।

স্বাধীনতা তুমি

মিরাজুল ইসলাম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

স্বাধীনতা তুমি
জীবনের জয়গান যৌবনের মুখপাত্র
এক সাগর রক্তভেজা সবুজ মানচিত্র।
স্বাধীনতা তুমি
রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের
জাতীয়তাবাদী চেতনা, ভাষা আন্দোলন
স্বাধীনতা তুমি
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয়দফা
বাঙালি জাতির মুক্তির দলিল।
আগরতলা মিথ্যা মামলার তীব্র প্রতিবাদ।
স্বাধীনতা তুমি
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আসাদের আত্মাহুতি
স্বাধীনতা তুমি
সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির বিজয় উল্লাস।
স্বাধীনতা তুমি
৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
পাকহানাদার বাহিনীর বর্বর শাসন-শোষণ
জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ও
লুণ্ঠনের কত স্মৃতিময় ছবি।
স্বাধীনতা তুমি
বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অদম্য প্রেরণা।
স্বাধীনতা তুমি
ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে কেনা
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
রক্তভেজা স্বাধীন পতাকা।

ঈশ্বর এবং জননীর গল্প

তানিয়া বিলকিস শাওন
প্রভাষক, বাংলা

মা, মাগো জননী আমার
তোমাকে নিয়ে কোনো কবিতা লেখা হয়নি আজো জীবনে বহুবার, বহু কবিতা লিখেছি নানা বিষয় ছিল তার মধ্যে কখনো প্রেম, কখনো বিরহ .....
মাঝে মাঝে নস্টালজিয়া ভর করত তখন পুরনো বন্ধু, আড্ডা, টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি এসব নিয়ে লিখতাম। একদিন অলস দুপুরে-
অচেনা এক মিষ্টি পাখির গানে মুগ্ধ হয়ে তাকেও একটা কবিতা উপহার দিয়েছিলাম সমাজের অবহেলিত নারীদের উৎসাহ দেবার জন্য; নারীবাদী কবিতাও আমার কম লিখা হয়নি আমার অনাগত ভবিষ্যৎ, স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়া নিয়ে স্বপ্নে দেখা স্বপ্নগুলোকে কতবার কত ভাবে কবিতার অক্ষরে সাজিয়েছি! অথচ মা তোমাকে নিয়ে এখনো কোনো কবিতা লেখা হলো না! কোনটা লিখব বল?
আমার জন্মের আগে আমারই কারণে দুর্ঘটনায় যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে, সে সময়ের কবিতা?
নাকি নতুন পরিবেশে অচেনা মানুষগুলোর সমস্ত চাহিদা পূরণ করে সারাদিনের ফাঁকে যখন আমার মুখে একটু অমৃত সুধা ঢেলে দিতে, সে সময়ের কবিতা?
নাকি সারাজীবন ধরে প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে যুদ্ধ জয়ের যে মন্ত্র শিখিয়েছো, তা নিয়ে কবিতা?
মা, তোমাকে নিয়ে শেক্সপীয়রও পারবে না একখানা এমন নাটক লিখতে যা পাল্লায় তোমার সমান হবে। ম্যাকবেথ, ওথেলো আর হ্যামলেটরা হয়তো হাসতো-এ প্রস্তাবে, তাই বেচারা আর সাহসই করে নি!
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এলিয়ট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস্ পৃথিবীর কোনো প্রান্তের কোনো কবিরই দুঃসাহস নেই তোমাকে নিয়ে তোমার মতো শ্রেষ্ঠ একখানি কাব্য রচনা করে। তুমি তো তুমি, তুমিময় এ পৃথিবীতে তোমার তুলনা কি কাব্য দিয়ে হয়?
কবিতায় কী সব ভাষা, অনুভূতি তুলে আনা যায়?
আমার কবিতা তাই অসমাপ্তই রয়ে গেল।
মাগো, আমার এ অসমাপ্ত কাব্যই আজ তুমি বুঝে নিও
যেখানে মিশে আছে কত না সমাপ্তির চিহ্ন!
উৎসর্গ : 'পৃথিবীর সমস্ত মা'-কে

স্বপ্নপূরণ

মোঃ আশিকুল ইসলাম
প্রভাষক
বাংলা বিভাগ

মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। আর এই জীবন নামের নদীটিকে চলতে হয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিবেচনা করে। মানবকূলে জন্মগ্রহণ করার পর যদি এ সুন্দর মধুময় পৃথিবীতে অতি সচেতনতার সাথে সম্মানের সাথে বিচরণ করতে পারা না যায়, তাহলে এ জীবনের যেন কোনো মূল্যায়ন হয় না। ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে যে অভাবনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে তারই ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য করে মোহাম্মদপুর গ্রামের হবিবর নামের একেবারে সহজ-সরল, সাদামাটা রকমের নিরক্ষর মানুষটির পথ চলা। বলতে গেলে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যাচার নেই, নেই কোনো মানুষ ঠকানোর কু-প্রবৃত্তি। সারাদিন শুধু মাঠে-ঘাটে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। এর ফলে ধন-সম্পদেরও কমতি নেই তার।
কিন্তু বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সে হবিবরের বংশের পূর্ব-পুরুষ থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মেও কোনো শিক্ষিত লোকের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। এদেশের মানুষ যেভাবে শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হবিবর অশিক্ষিত, মূর্খ হলেও মাঠের কাজকর্ম সেরে মাঝে মধ্যে গ্রামের চায়ের দোকানে ভিড় জমায়। সেই সাথে দোকানে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখে বিষয়টি অনুভব করতে পারে। এবার সে মনে-প্রাণে দৃপ্ত শপথ নিয়েছে আমার বংশের পূর্ব-পুরুষতো মূর্খ ছিল, আবার বর্তমানে আমরা যে ডজন খানেক ভাইবোন আছি সবাই তো মূর্খ। এবার যেমন করেই হোক আমার ছেলে শাহিনকে পড়াশুনা করাবোই।

এ শপথ নিয়েই হবিবর তার পথচলা শুরু করল। ছেলে শাহিনের বয়স যখন ছয় বছরও পূর্ণ হয়নি, ঠিক সেই সময়েই হবিবর ছেলেকে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করল। ছেলের প্রথম শ্রেণি পেরিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতেই যেন অনেক বেগ পেতে হয়। কটি বছর এভাবে কোন রকম পাস করে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এবার তো শাহিনের পক্ষে পাস করা আরো বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এসএসসি পরীক্ষার মতো পরীক্ষা দিয়ে অর্থাৎ প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। নতুবা আবার ডাবল করে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তে হবে।

হবিবরের মনে নতুন করে স্বপ্ন জেগে ওঠে তার ছেলে এবার হাইস্কুলে পড়তে যাবে। এবার সে যেকোনো জায়গায় গল্পের ছলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে- আমার ছেলে হাইস্কুলে পড়ে।

যাক, এবার হবিবরের আশা পূর্ণ হলো। পরীক্ষার হলে তার ছেলের পাশে এক ভালো ছাত্রের সিট পড়ায় তার সহযোগিতা পেয়ে সর্বনিম্ন মার্ক নিয়ে পাস করেছে। হবিবর তো মহাখুশি। গ্রামে একটি হাইস্কুল আছে, সেখানে লেখাপড়ার মান অবশ্য নিচের দিক থেকে প্রথম স্থানে থাকে। নতুন স্কুল হিসেবে শিক্ষকেরা অনেক সময় ছাত্রের খোঁজে বের হয়। এবার এসে তারা হবিবরের বাড়িতে ভিড় জমায়। আর বলে, 'আপনার ছেলেকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করে দেন, আমরা বিনা বেতনে পড়াব, কোনো বেতন দিতে হবে না। এমনকি পরীক্ষার ফিস পর্যন্ত দিতে হবে না।' হবিবরের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তার বাড়িতে হাইস্কুলের মাস্টাররা এসে ভিড় জমাচ্ছে। এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে। গ্রামে রাজনীতি করে এমন পাতি নেতা হলো ওই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। সেও যেন হবিবরের বাড়ির উঠানের মাটি দাবিয়ে নিচু করছে, 'তোমার ছেলেকে আমার স্কুলে ভর্তি করাও। তোমার ছেলে মানেই আমার ছেলে। চিন্তার কোন কারণ নেয়, আমি আছি তোমার পাশে।'

হবিবর তো খুশিতে গদগদ করছে। আর মনে মনে ভাবছে তার এখন কত দাম! গ্রামের নেতা বাড়িতে আসছে এতো চাট্টিখানেক কথা নয়! হবিবর মূর্খ হলেও তার পৈত্রিক সম্পত্তিসহ নিজের শ্রম দিয়ে কেনা সম্পত্তির দিক দিয়ে গ্রামের মধ্যে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে। আর শিক্ষা-দীক্ষায় শূন্যস্থানে। সে নেতার কথা শুনে বিনা বেতনে পড়ানোর সুযোগে ছেলেকে তার হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলে।

শাহিন ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বাবা-মায়ের অতি আদর যত্ন পেয়ে তার স্বাধীনতা আরো বেড়ে গেল। কীভাবে বাবা মায়ের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করে নিতে হয় এই বয়সেই সে শিখে নিয়েছে। আর সেই সাথে অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কীভাবে মিথ্যা কথা বলে বাবা-মাকে বিশ্বাস করানো যায়, তার যেন এক নব প্রশিক্ষণ নিতে থাকে শাহিন। সে প্রতিদিন গড়ে এক ডজন করে বন্ধু বাড়িতে নিয়ে আসে। হবিবর ও তার স্ত্রী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ছেলে আমার হাইস্কুলে পড়ছে, সেহেতু বন্ধুতো আসবেই এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই কেটে গেল দুটি বছর। ক্লাসে পড়া না পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি পরীক্ষায় পাস না করলেও এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উঠার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না শাহিনের। সে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণিতে আবার সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে গতানুগতিক ভাবেই উত্তীর্ণ হলো।

স্কুলের সভাপতি বা শিক্ষকেরা জানেন যদি ক্লাসে কিছু বলা যায় বা পরীক্ষায় ফেল দেখানো হয় তাহলে আমাদের স্কুলের বারোটা বাজবে। ছাত্রতো আসবেই না সেই সাথে দুর্নামের শতভাগ সাদরে গ্রহণ করতে হবে। সুনামের কূল-কিনারায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। হবিবর অবশ্য মাঝে মধ্যে শিক্ষকদের তো বটেই সভাপতির কাছেও ছেলের পড়াশুনার খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে। জবাবে তারা বলে, 'কোনো সমস্যা সেই, শাহিন খুব ভালো ছাত্র। সে এবার জেএসসি পরীক্ষায় 'এ' প্লাস সহ বৃত্তি পাবে। আমরা ধরেই নিয়েছি এই স্কুল থেকে যতজন ছাত্র জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে তার মধ্যে শাহিন এক নম্বরে থাকবে।'

হবিবর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফেরে। আর স্ত্রীকে বলে- 'শুনছো, আমার শাহিন নাকি ওর স্কুলে এক নাম্বার। ওর ওপরে আর কোনো ছাত্র নাই। আমার মাঠের জমিগুলান বন্ধক আর গাছ-গুলান বেচা হইলে কী হবে, আমার তো একটাই ছাওয়াল। ওর পেছনে সব দেব। এক নাম্বারে পতিবছর থাকলিই হয়। জানো, ওই স্কুলের যে সভাপতি আছে না, সেই আমাকে বুলছে তোমার কোনো সমিস্যা নাই, তোমার ছাওয়ালের চাকরি লাগবে আমি আছি। সব ঠিক করে দেব। আচ্ছা বলো, এই রকম মানুষ থাকতি দুনিয়াতে আর কিইবা লাগে। জমি যায় যাক, আমার ছাওয়ালের চাকরি হইলেই হয়, ছাওয়াল আমার জ্ঞানী-গুণী হইলেই হবে, কী বলো, তাই না।'

হবিবরের কথায় তার স্ত্রীও খুশিতে আটখানা। কল্পনার সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে চলে হবিবরের স্ত্রী। শুধু মনে-প্রাণে ভাবতে থাকে কেন তারা গ্রামে বাড়ি করল। আর কদিন পরে তো ছেলের সাথে শহরে যেতে হবে। ছেলে তো অনেক টাকা বেতনের চাকরি করবে। সেখানেই বড় বাড়ি করলে ঠিক হতো। এ রকম চিন্তা-চেতনাই হবিবর ও তার স্ত্রীর মনের মধ্যে সব সময়।

ওদিকে অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে চলার ফলে শাহিন মিথ্যাচার করা, মাদক সেবন করা এবং এই বয়সেই কীভাবে মেয়েদের পটিয়ে প্রেম করা, স্কুল পালানো, আড্ডা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। সামনে জেএসসি পরীক্ষা, পড়াশুনার নাম-গন্ধ নেই। পরীক্ষা শুরু হলো, অবশ্য প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই শাহিন অংশগ্রহণ করে। বলা যায় এটি তার মধ্যে অতিমাত্রায় ভালোগুণ। সে পরীক্ষা দিয়ে আসার পরেই হবিবর জিজ্ঞেস করে, 'বাবা তুমার পরীক্ষা ক্যামুন

হইল?' শাহিন উত্তরে বলে, 'এক নম্বর।' হবিবর তো ছেলের কথা শুনে আরো বেশি আনন্দিত হয়। কারণ সে স্কুলের মাস্টারের কাছেও শুনেছে তার ছেলে এক নম্বরে। সব সময় ছেলের মাথা যেন ঠিক থাকে সেজন্য ডিম সিদ্ধ, দুধ, ঘি, মাখন প্রস্তুত করে রাখে। কারণ ছেলের পরীক্ষা চলছে। এদিক দিয়ে শাহিনের বাবা-মা খুব সচেতন।

এবার জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। হবিবর তো মনে মনে অঙ্ক কষতে থাকে কমপক্ষে এক মণ মিষ্টি তো পাড়া-গ্রামের মধ্যে বিলাতেই হবে। স্ত্রী ও তার সঙ্গে একমত। ছেলে যেহেতু স্কুলের এক নম্বর ছাত্র সেহেতু এক মণে হবে কি না সেটাই ভাবার বিষয়। কিন্তু ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, ছেলে শাহিনের খবর নেই। পরে হবিবর জানতে পারে তার ছেলে পাঁচ বিষয়ে ফেল করেছে। হবিবর তো চোখে অন্ধকার দেখে বারবার মূর্ছা যেতে থাকল। ছেলের খবর নেই। সে যে কোথায় হাওয়া হয়েছে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। ওদিকে স্কুলের স্বার্থবাদী মাস্টাররা হবিবরের বাড়িতে এসে বোঝাতে থাকে, 'এরকম হয়েই থাকে। অনেক ভালো ছাত্র ফেল করে। এবার এমন হয়েছে, সামনের বার ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে।' হবিবর অবশ্য ওই স্কুলের শিক্ষকদের খুব ভক্ত। তাদের কথা শুনে হবিবর নিজেকে সামলিয়ে নিলো। ছেলে শাহিন একদিন পরেই বন্ধুদের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে উপস্থিত হলো। বাবা হবিবর বাক-বিতণ্ডা না করে বরং ছেলেকে আদর যত্ন করতে লাগল। আর বোঝাতে লাগল, 'এ রকম হয়ি থাকে বাবা, আবার তুমি সামনের বছরে পরীক্ষা দিবা তাইলেই হবে।' শাহিন সেই সাথে একটু মুখ থেকে থুথু নিয়ে কান্নার ভান করে। আর বাবার কথায় অবাক হলো- সে যা মনে মনে ভেবেছিল তার ঠিক উল্টোটা হলো, সে নিজেকে বিশ্বাসই করতে পারল না যে তার বাবা ক্ষিপ্ত না হয়ে এমনভাবে এতো মধুর হতে পারে। কারণ সে কম বয়সেই অনেক টাকা-পয়সা হাওয়ায় উড়িয়েছে। তার উপরে পাঁচ বিষয়ে ফেল, সে যেন স্বপ্ন দেখছে এমনটিই তার ভাবনা হলো।

স্কুলের শিক্ষকদের কথার ওপর নির্ভর করে হবিবর তার ছেলেকে নিয়ে আবারও স্বপ্ন দেখতে থাকে। ছেলে সামনের বছর পরীক্ষায়তো পাস করবেই সেই সাথে এসএসসিও পাস করবে তারপরে কলেজে ভর্তি হবে। গ্রামের মানুষ তাকে অনেকটা সম্মানের সাথে দেখবে। অন্তত এটুকুতো বলবে কলেজ পড়ুয়া ছেলের বাবা। আর যখন চাকরি করবে, মানুষের মতো মানুষ হবে, দেশ ও জাতির কল্যাণে রত থাকবে, তখন তো আর কথাই নেই। এমনই চিন্তা-চেতনা বুকে ধারণ করে হবিবর চলতে থাকে, আর নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রি করে ছেলে যে আবদার করে সেই আবদারই পূরণ করতে থাকে। কিন্তু ছেলে যা হবার তা হচ্ছেই।

আবার বছর গড়িয়ে পরীক্ষার সময় হলো- শাহিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলো এবং আল্লাহর রহমতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার মতো জেএসসি পরীক্ষায়ও পাস করল। নবম শ্রেণিতে অন্তত পক্ষে পড়াশুনার সুযোগ পেল, হবিবর তো মনে মনে ভাবতে লাগল যাক ছেলে আমার শিক্ষিত হচ্ছে। আর মাত্র কয়েকটি বছর পরেই তাকে কলেজে পাঠাতে হবে এই চিন্তায় এবার হবিবর ও তার স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মোটর সাইকেল না হোক বেশি দামের বাই-সাইকেল তো কিনে দিতে হবে। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকল। অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই বলা যায় ছেলে শাহিন এসএসসি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন মার্ক নিয়ে পাস করল। হবিবরের তো আর আনন্দের অন্ত নেই। সে এবার মণ খানেক মিষ্টি বিতরণ করল গ্রামের মানুষের মধ্যে। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ অবশ্য অনেকটা বাহবাই দিতে লাগল। কিন্তু কিছু শিক্ষিত লোকজন হবিবরের এরকম কাহিনী দেখে বিস্মিত হয়। তারা ভাবতে থাকে এতো অবাক কাণ্ড! এরকম তো জীবনে কোনো দিন দেখা যায় না।

শাহিন এবার কারিগরি কলেজের ছাত্র। সে তার মিথ্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বাবা হবিবরের ওপর। হবিবর শুধু এটুকুই জানে আমার ছেলে কলেজে পড়ে, টাকা পয়সা তো আগের চেয়ে বেশি দিতেই হবে। এই ভেবে সে সম্পত্তি বন্ধক বাদ দিয়ে এবার বিক্রি করা শুরু করল। এদিকে শাহিন মনে মনে চিন্তা করতে থাকে আমি কলেজে পড়ি। কলেজের বইপত্র কেনার জন্য এবার বাবার কাছে অনায়াসে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। আর তাছাড়া হাইস্কুলের চেয়ে কলেজে কারিগরি পড়তে যে অনেক টাকা পয়সা লাগে তা সবারই জানা। 'গুড আইডিয়া' এবার মাথায় এসেছে। এক বই কেনার জন্য বাবার কাছ থেকে কমপক্ষে দশবার টাকা নেওয়া যাবে। কারণ বাবা তো অশিক্ষিত, মূর্খ, বোকা টাইপের। বাবাকে যা বলি তাই শোনে। না হলে এতো জমি-জমা বিক্রি করে কেউ টাকা দেয়। বাবার সাথে শাহিন এবার চাল চালতে লাগল। যে বইটার দাম একশ টাকা, সেই বইটার দাম বাবার কাছে পাঁচশ টাকা বলে, যেটার দাম একশ পঞ্চাশ টাকা সেটার দাম ছয়শ পঞ্চাশ টাকা বলে। এভাবে মাসের পর মাস বই কেনার কথা বলে বাবা হবিবরের কাছ থেকে টাকা লুফে নেয় শাহিন। মাঠে যত প্রকার গাছপালা ছিল সে তো বিক্রি অনেক আগেই হয়েছে। সেই সাথে জমি-জমাও বিক্রি

চলছে অস্বাভাবিকভাবে। ওদিকে শাহিন বইপত্রের টাকা দিয়ে বাজিখেলা ও মদ্যপানসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে খুব ভালো ভাবেই দিন কাটাচ্ছে। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হবিবরের এবার বোধোদয় হলো। কী ব্যাপার! আমার ছেলে এত্তো দামী পড়া পড়ে! যে ছেলেকে টাকা দিয়ে কূল-কিনারা পাচ্ছি না। গ্রামে তো অনেক ছেলে মেয়েই পড়াশুনা করে। একথা ভাবতে ভাবতে সেদিন মাঠের কাজ বন্ধ রেখে গ্রামের কিছু অনার্সসহ এমএ পাস করা ছেলে-মেয়েদের কাছে খোঁজ-খবর নিতে যায়। তাদের কেমন খরচ হয়েছে পড়াশুনা করতে। খবর নিতে যেয়ে হবিবরের মাথা হেঁট হয়ে গেল। প্রথম শ্রেণি থেকে এমএ শ্রেণি পাস করা পর্যন্ত যে টাকা খরচ হয়, হবিবর তার ছেলেকে অনেক আগেই তা প্রায় দিয়ে ফেলেছে। হবিবর শুধু উচ্চ শিক্ষিতদের কাছেই খবর নেয় নি, গ্রামের একেবারে গরিবের ছেলে মেয়েদের কাছেও খবর নিয়েছে। তা থেকে জানতে পারে শাহিন লেখাপড়ার জন্য যে টাকা নেয় তার একশ ভাগের এক ভাগও গরিব ছাত্রের খরচ হয় না। তাদের বাবা-মা বলে, 'আমরা গরিব মানুষ ছেলেকে টাকা দেব কোথা থেকে। কোন রকম দুই-চারশ টাকা টিউশনি করে যা হয় তা দিয়েই ওদের খরচ চলে।' আর এ খবর নিতে যেয়েই গ্রামের মানুষের মুখে মুখে জানতে পারলো ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সম্বল নিজ ছেলের অস্বাভাবিক, অমানবিক, অন্যায় আচরণের কথা। আর এ সমস্ত কারণেই গ্রামের মানুষ হবিবরকে ধিক্কার জানাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।

গ্রামের মানুষের কাছে এমন অভিযোগ শোনার পর হবিবরের আর দুঃখের সীমা রইল না। সে বুঝতে পারল তার ছেলে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমা অতিক্রম করেছে। তাই আজ গ্রামের, সমাজের মানুষের কাছে হতে হচ্ছে তাকে ঘৃণার পাত্র। সে ভগ্নমনোরথ হয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। আর চোখের সামনে কল্পনায় ভেসে উঠে তার সন্তানের দুষ্কর্মের বীভৎস রূপ। ভবিষ্যতে নিজ বংশে যে সন্তানকে দিয়ে শিক্ষার প্রদীপ জালাবার স্বপ্ন দেখল, যাকে অন্ধের মতো স্নেহ ভালোবাসার চাঁদরে আবৃত করে রেখেছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিলতিল করে যাকে বড় করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যে সন্তানকে নিয়ে গর্বের সাথে শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে একজনের পিতা হওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করেছিল, সেই সন্তান কিনা আজ তার জীবনে এক কলঙ্কের কালিমা লেপন করে চলেছে। এটাই কী জগতের নিয়ম!!!!!

আদর্শ প্রজন্ম গড়তে হলে অভিভাবকদের সচেতনতা অত্যাবশ্যক

ফরিদ আহমেদ
সহঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

সামাজিক, শিক্ষিত ও সভ্য পরিবারকে কে না ভালোবাসে! কিন্তু সামাজিক, শিক্ষিত ও সভ্য পরিবার তৈরি করার জন্য আমরা কতটা সচেতন? বিভিন্ন সমস্যার অজুহাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেতে চাই। অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে আমরা নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে গা ভাসিয়ে দেই। আসলে সামাজিক, শিক্ষিত ও সভ্য পরিবার তৈরি করা কোনো দুরূহ কাজ নয়। যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি থেকেও সামাজিক পরিবার তৈরি করা সম্ভব। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বসবাস করলেও একটা সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে আমরা নিজেরা এগিয়ে আসতে পারি। কিন্তু এর জন্য সর্বপ্রথম দরকার আমাদের নৈতিক চরিত্র, সৎপথে চলা। প্রবাদ আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' কিন্তু বাংলাদেশে এখন কোন খাদ্যের অভাব নেই। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্যের অভাবে বাংলাদেশের কোথাও কোনো লোক মারা যাচ্ছে না। আমাদের স্বভাব নষ্ট হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে। কারণ, কেউ অবৈধ আয়ে কোটিপতি, আবার কেউ মৌলিক অধিকার বঞ্চিত। দেশে অভাব নেই, কিন্তু দুর্নীতি আছে। দুর্নীতি আমাদের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের নৈতিক চরিত্র হরণ করছে। আমরা অনেকেই নিজেকে সৎ, সামাজিক, শিক্ষিত ও সভ্য মনে করলেও প্রকৃত অর্থেই কি আমরা সামাজিক, সৎ, সভ্য, নিরহঙ্কার, সহনশীল ও সুশিক্ষিত হতে পেরেছি? আমরা বাস্তবে দেখি একটা, নিজেরা করি আরেকটা আর অপরকে উপদেশ দেই অন্যটা। ফলে সমন্বয়ের অভাবে কোনো কিছুতেই আমাদের সাফল্য আসছে না।

আমাদের সকলেরই জেনে রাখা উচিত শিশুরা কিন্তু অনুকরণপ্রিয়। তারা সবটাই মা-বাবা, ভাই-বোন ও বড়দের অনুসরণ করে থাকে, তার কয়েকটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি। আমি পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুকে তার আব্বু ও আম্মুর নাম জিজ্ঞেস করছিলাম। তখন শিশুটি তার আব্বুর নাম বলার পর আম্মুর নাম বলল, 'এই যে শুনছ'। ঐ শিশুটির বাবা তার আম্মুকে 'এই যে শুনছ' বলে ডাকলেই তার আম্মু ডাকে সাড়া দেয়। এজন্য ঐ শিশুটি ধরে নিয়েছে এটাই তার আম্মুর নাম।

আবার এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাদের গ্রামের নাম কি ও পোস্ট অফিস কোথায়? তখন মেয়েটি গ্রামের নাম বলার পর বলছিল পোস্ট অফিস দাদুদের বাসায়। পরে জানা গেল ঐ শিশুটির দাদা পোস্ট অফিসের জন্য ঘর ভাড়া দিয়েছিল তাদেরই বাড়ির একটি ঘরে। কিছু কিছু অসচেতন অভিভাবকের কারণেও সন্তানেরা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন: একজন পিতা তার সন্তানকে নিয়ে রিক্সা থেকে নেমে সন্তানের হাতে টাকা দিয়ে দোকানীকে সন্তানের হাতে সিগারেটের প্যাকেট দিতে বললেন। আর পিতা রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটাচ্ছেন বা অন্য কারো সাথে কথা বলছেন। আবার ঘরে শার্টের প্যাকেটে বা টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট ও এ্যাশট্রে সন্তানকে এনে দিতে বলছেন। এতে হয়তো বা ঐ পিতার একটু পরিশ্রম কম হলো। অনেক সময় দেখা যায় পিতার ফেলে রাখা সিগারেট কোনো অবুঝ সন্তান মুখে দিয়ে কামড়াচ্ছে। আবার কোনো পাওনাদার যার সাথে আমরা ওয়াদা ভঙ্গের কারণে এই মুহূর্তে দেখা করতে চায় না, এরকম কেউ আসল বা টেলিফোন/মোবাইল কল আসল। তখন আমরা অভিভাবকরা লুকিয়ে থেকে সন্তানকে দিয়ে বলাই যে, বল আব্বু বাসায় নেই। কিন্তু ঐ মুহূর্তে সন্তানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাকে কে বলতে বলেছে আব্বু বাসায় নেই? তখন ঐ সন্তান নির্দ্বিধায় বলবে আব্বু বলতে বলেছে।

কোনো মেয়ে সন্তান স্কুলে বা প্রাইভেট পড়তে অথবা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। মা, বাবা বা কোনো অভিভাবক সাথে আছেন। দেখা যায়, মেয়ের গায়ে ওড়না নেই। থাকলেও তা গলার সাথে ঝুলানো। স্কিন টাইট গেঞ্জি, প্যান্ট বা টাইটস বা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিধান করা, যে দৃশ্য সাধারণ দর্শনার্থীদের কুদৃষ্টি অর্জন করতে পারে। আবার বিত্তশালী পরিবারের অসচেতন অভিভাবকরা সন্তানের বায়না পূরণের জন্য কম বয়সেই সন্তানদের ডিজিটাল মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিনে দেন এবং মোবাইলে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ দেন। আবার কেউ সন্তানদের নাচ, গান ও মডেলিং এ ভর্তি করে দেন। ফলে কোমলমতি সন্তানেরা বাইরের নোংরা সংস্কৃতির সাথে মিশে অল্প বয়সেই পেকে যায়। এর ফলে এই সন্তানেরা অভিভাবকদের শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। অভিভাবকদের এসব অসচেতনার কারণে আদরের এই সন্তানেরা পরবর্তীতে বখাটে যুবক-যুবতীদের খাতায় তালিকাভুক্ত হয়। এসব বখাটে যুবক-যুবতীদের কারণে আজ আমাদের সমাজে এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নোংরা প্রেম, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, এসিড নিক্ষেপ, নারী ধর্ষণ, ইয়াবা সেবন, অসামাজিক ব্যবসা ইত্যাদি বিরাজমান। শুধু অভাব এ সমস্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য একমাত্র দায়ী নয়। এজন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী অভিভাবক ও বড়দের অসচেতনতা, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, অতিমাত্রায় লোভ, দুর্নীতি, অহঙ্কার, প্রতিহিংসা ইত্যাদি। শুধু নিম্নবিত্তের ঘরেই অভাব অশান্তি একথা বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। উচ্চবিত্তের ঘরে আরো বেশি অশান্তি বিরাজমান।

এ পৃথিবীতে কে না সুখী হতে চায়? কিন্তু সুখ তো টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। সুখ তৈরি করে নিতে হয়। লোভ ও অহঙ্কার ত্যাগ করে নিজেকে সৎ চরিত্রবান, সুশিক্ষায় শিক্ষিত, সহনশীল, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছাড় দেওয়ার মনোভাব তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে, কোনো কোনো সৎ ও সচেতন অভিভাবক তাদের সন্তানদের সুশিক্ষাও দিয়ে থাকেন। যেমন: সন্তানদের বলে দেন বড়দের এবং ঘরে কোন মেহমান আসলে তাদের সালাম দিতে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লিজ, সরি, থ্যাংক ইউ, সালাম করা, টাটা দেওয়া ইত্যাদি করতে বলা হয়। এসব বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অভিভাবকরাই হচ্ছে সন্তানের সর্বোত্তম প্রশিক্ষক। অভিভাবকরা প্রথম থেকে সন্তানদের যেভাবে পরিচালিত করবে এবং অভিভাবকরা নিজে যেভাবে চলবে সন্তানরাও সে সব বিষয় অনুকরণ এবং সেভাবেই চলবে। বর্তমানে আমরা যারা অসচেতন অভিভাবক আছি তারা যদি আরো সচেতন হয়ে সন্তানদের সুশিক্ষা দেই তাহলে আমাদের সন্তান, সংসার, সমাজ ও দেশ আরো সুখের ও শান্তির হতে পারে। সন্তান, সংসার ও সমাজকে আরো সুন্দর করার জন্য আমাদের অভিভাবকদের যা করা উচিত:

১। সন্তানদের সামনে বাবা-মায়ের ঝগড়া না করা। ২। সন্তানদের সামনে ধূমপান না করা। ৩। মেয়ে সন্তানদের পোশাক নির্বাচন ও পরিধানে মায়েদের নিয়ন্ত্রণ থাকা। ৪। ভবিষ্যৎ জীবনের সুবিধা অসুবিধা সমন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া। ৫। পারিবারিক আলোচনা ও সমালোচনা থেকে সন্তানকে দূরে রাখা। যাতে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোনো বৈষম্য তাদের কে স্পর্শ করতে না পারে। ৬। খাওয়া- দাওয়া ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে অতি আদর না করা। সংসারে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ৭। সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ না করা। ৮। সর্বদা তাদের বায়না পূরণ না করা। যুক্তিসঙ্গত বায়না পূরণের জন্য লেখাপড়ার উপর কোনো টার্গেট দেওয়া। ৯। ছোট সন্তানদের হাতে নগদ টাকা না দিয়ে তাদের চাহিদার বস্তুটি অভিভাবকদের সামর্থ্য অনুযায়ী কিনে দেওয়া। ১০। সন্তানকে শারীরিকভাবে আঘাত না করে শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে বা মৌখিকভাবে শাসন করা। ১১। খাওয়া, লেখাপড়া, ইবাদত/প্রার্থনা, ঘুমানো, বিনোদন ও অন্যান্য বিষয়ে একটি

রুটিন করে দেওয়া এবং রুটিন মতো তা করছে কিনা সে বিষয়ে নিয়মিত তদারকি বা খোঁজ খবর নেওয়া। ১২। বাইরে বেড়ানো ও বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া ও খেয়াল রাখা। ১৩। ছোটদের ডিজিটাল মোবাইল বা ল্যাপটপ এর অপব্যবহার থেকে বিরত রাখা। ১৪। রাতে ঘুমানোর পূর্বে মোবাইল বা ল্যাপটপ অভিভাবকের কক্ষে জমা রাখা। ১৫। মোবাইলে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা বলার পরামর্শ দেওয়া। ১৬। নিজের সন্তানের সাথে কারো ঝগড়া বা মনোমালিন্য হলে নিজের সন্তানের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তাকে শুধরিয়ে দেওয়া। অন্যের ত্রুটি না ধরে তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া। ১৭। দৈনন্দিন হাত খরচের বিষয়ে জবাবদিহিতা থাকা। ১৮। আর্থিক লেনদেনের বিষয়গুলো সন্তানদের কাছে না দিয়ে অভিভাবকদের নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করা। ১৯। সন্তানদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি খেয়াল রাখা। ২০। বাবা মায়ের মধ্যে একজনকে সন্তানদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করা। ২১। সন্তানদের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। ২২। তাদের দায়িত্ববান করে গড়ে তোলা। ২৩। আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করা। ২৪। মহান ব্যক্তিদের জীবনী পড়তে আগ্রহী করে তোলা।

সন্তানদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথম থেকেই উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলে যে কোনো সন্তানই আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠবে। প্রত্যেক মা-বাবাই সন্তানের সুখের জন্য সারা জীবন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা মায়ের সে চেষ্টা কতটা যুক্তিসঙ্গত এবং সন্তানের মঙ্গল বয়ে আনবে তা হয়তো আমরা অনেক অভিভাবকই জানি না। অনেক বাবা মা সন্তানের সুখের জন্য সারাজীবন নিজেরা কষ্ট করে জমি, বাড়ি, গাড়ি ও ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করে রাখেন। অসচেতন অভিভাবকরা সম্পত্তির মোহে আদরের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে ততটা গুরুত্ব দেন না বা সুশিক্ষার পেছনে প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে অনীহা প্রকাশ করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তানের বায়না পূরণ করে থাকেন। সন্তানেরা লেখাপড়া করতে না চাইলে বিদেশে পাঠিয়ে দেন বা দেশে ব্যবসা করতে বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ব্যবসা দেখাশুনা করতে বলেন। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে আদরের সন্তানেরা অর্থ ও প্রাচুর্য পেলে তারা অতীতের সব শিক্ষা ভুলে গিয়ে বর্তমান সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়। ফলে বিভিন্ন লোভ, লালসা ও অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তখন অতি আদরের এই সন্তানেরা বাবা মায়ের জন্য কাল সাপ হয়ে দাঁড়ায়। তখন অভিভাবকদের কল্পিত সুখের পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুঃখ আর অপমানই বেশি পেতে হয়। পৃথিবীতে মায়ের মতো আপন কেউ নেই। কিন্তু এই মা বাবাই হয়ে যায় সন্তানের জন্য বোঝা। তখন বাবা মায়ের আশ্রয় হয় নিজের তৈরি বাড়ির চিলে কোঠা বা বাড়ির দ্বাড়োয়ানের পাশের রুম বা বৃদ্ধাশ্রমে।

বাবা মা ব্যতীত সন্তানকে অন্য কেউ বেশি ভালোবাসে না এই জগতে। কিন্তু বাবা মায়ের আবেগের ভালোবাসা সন্তান ও সংসারকে ধ্বংস করে। তাই সন্তানকে ভালোবাসতে হবে মনেপ্রাণে, বাহ্যিকভাবে নয়। সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাবা মায়ের আত্মত্যাগই হচ্ছে সর্বোত্তম ভালোবাসা। যে সব সচেতন বাবা মায়েরা সন্তানের সুখ শান্তির জন্য ধন সম্পত্তির প্রতি অতি গুরুত্ব না দিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক সহযোগিতা, পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, সেসব সন্তানেরা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়। আর সে সুনাগরিকই হয় ভবিষ্যতের প্রকৃত সম্পদ। যা বাড়ি, গাড়ি, জায়গা-জমির চেয়ে অনেক বেশি দামী ও মূল্যবান। সে সম্পদ অনেক সম্পত্তির জন্ম দিতে পারে।

রক্ত দিন জীবন বাঁচান

মোঃ আইয়ুব আলী
এমএলএসএস

"মানুষ মানুষের জন্য,
জীবন জীবনের জন্য"
মানুষের জীবন যখন হয় বিপন্ন
রক্ত দানে জীবন হতে পারে ধন্য।
মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্ত
রক্তের জন্য মানুষ,
মানুষের জন্য রক্ত
মানুষকে বাঁচিয়ে হতে পারি স্রষ্টার ভক্ত।
রক্ত দানের ফলে
দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে
আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে,
এ ভাবেই মানবতার ফুল ফোটে।
দাতার হৃদয়ে পুলকিত অনুভূতি জাগে,
রক্ত মানুষের অমূল্য সম্পদ
তাই রক্ত দিন জীবন বাঁচান।

গল্প ও প্রবন্ধ

রাগ

এ কে এম রিয়াজুল জান্নাহ (আলাবি)
কলেজ নং : ৮০৮০
শ্রেণি : ৩য়-খ (দিবা)

খুব ছোট এক ছেলে প্রচণ্ড রাগী ছিল। তার বাবা তাকে একটা পেরেক ভর্তি ব্যাগ দিল এবং বলল যে, যতবার তুমি রেগে যাবে ততবার একটা করে পেরেক আমাদের বাগানের কাঠের বেড়াতে লাগিয়ে আসবে।

প্রথম দিনেই ছেলেটির বাগানে গিয়ে ২০টি পেরেক মারতে হল। পরের কয়েক সপ্তাহে ছেলেটি তার রাগের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল, তাই প্রতিদিন কাঠে নতুন পেরেকের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে এল। শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি এল, যেদিন তাকে একটি পেরেকও মারতে হল না। সে তার বাবাকে এই কথা জানালো।

তার বাবা বলল, এখন তুমি যেসব দিনে তোমার রাগকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেসব দিনে একটি করে পেরেক খুলে ফেল। অনেক দিন চলে গেল এবং ছেলেটি একদিন তার বাবাকে জানালো যে, সে সব পেরেক খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

তার বাবা এবার তাকে বাগানে নিয়ে গেল এবং কাঠের বেড়াটি দেখিয়ে বলল, তুমি খুব ভালোভাবে তোমার কাজ সম্পন্ন করেছ, এখন তুমি তোমার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার। কিন্তু দেখ, প্রতিটা কাঠে পেরেকের গর্তগুলো এখনো রয়ে গেছে। কাঠের বেড়াটি আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। যখন তুমি রেগে গিয়ে কাউকে কিছু বল, তখন তার মনে ঠিক এমন একটা আঁচড় পড়ে যায়। তাই নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ। আসলে মানসিক ক্ষত অনেক সময় শারীরিক ক্ষতের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর।

হীরেকলি

মোঃ মুশফিক হাসান
কলেজ নং : ৭৪৮৫
শ্রেণি : ৪র্থ-খ (দিবা)

অনেক দিন আগে পুরান ঢাকার টংপাড়ায় বাস করত এক মুসলিম পরিবার। সেই পরিবারে তিনজন সদস্য ছিল। বুড়িমা, এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেটা বড়, সে তার বোনকে খুব ভালোবাসত। তার নাম মাহি। তার বোন রিজুতা ক্লাস ফোরে পড়ত। তার বারান্দায় গাছ লাগানোর শখ ছিল। তাই তাদের বারান্দা ভরা ছিল গাছ আর গাছ। তাদের বাড়িওয়ালা মিসেস মাহমুদার সাথে রিজুতার ভাব ছিল। তাদের বাড়িতেও অনেক গাছ ছিল। তাই প্রায়ই তারা গাছ বদলা-বদলি করত। একদিন মিসেস মাহমুদা অনেক দাম দিয়ে একটা নাইট-কুইনের গাছ কিনলেন। তিনি গাছটির অনেক যত্ন করতে লাগলেন। কিন্তু অনেক দিন পরও গাছটিতে ফুল ফুটল না। মিসেস মাহমুদা ভাবলেন, যে গাছে ফুল ধরে না সে গাছ আর রেখে লাভ কী; বরং আমি এটা রিজুতার সাথে বদল করে নেব। একদিন রিজুতা টিভিতে নাইট-কুইন ফুল দেখল। ফুলটা তার খুব পছন্দ হল। সে তার ভাই মাহিকে বলল, 'আমাকে একটা নাইট-কুইন গাছ এনে দাও না ভাইয়া।' 'আমাকে বিরক্ত করো না তো,' তার ভাই বলল। রিজুতা কাঁদতে কাঁদতে মিসেস মাহমুদার বাসায় গেল। সে মিসেস মাহমুদার বাসায় একটা নাইট-কুইন গাছ দেখল। সে তাড়াতাড়ি তার প্রিয় গোলাপ গাছটা নিয়ে মিসেস মাহমুদা বাসায় গেল। সে বলল, 'আন্টি আপনাদের নাইট-কুইন গাছটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আপনি কি দয়া করে আমার গাছটা নিয়ে আমাকে আপনাদের গাছটা দেবেন?' মিসেস মাহমুদা খুশি মনে তাদের গোলাপ গাছটা নিয়ে তার নাইট-কুইন গাছটা দিয়ে দিল। কারণ রিজুতার গোলাপ গাছটিতে অনেক ফুল হয়।

রিজুতাও খুশি মনে গাছটি বাড়িতে নিয়ে গেল। সে গাছটির অনেক যত্ন করল। অনেক দিন পর গাছটিতে ফুল ফুটতে লাগল। তা দেখে মিসেস মাহমুদার হিংসা হতে লাগল। হঠাৎ একদিন সকালে রিজুতা দেখল তার গাছটির ডালে

লাল রঙের কিছু একটা ঝুলছে। সে এটাকে ফল ভেবে মুখে দিল। দাঁত দিয়ে সেটাতে কামড় দেয়ার সাথে সাথেই শক্ত কিছু মনে হল। সে ভয় পেয়ে গেল। সে তার ভাইকে তা দেখাল। তার ভাই অবাক হয়ে বলল, 'এটা তো হীরা।' রিজুতা খুশিতে আত্মহারা। সে সবাইকে তা দেখাতে লাগল। পরদিন সে দেখল অরেকটি হীরেকলি। তারা তা বিক্রি করে টাকা পেতে লাগল; এক সময় বিশাল ধনী লোকে পরিণত হল। এদিকে মিসেস মাহমুদা তো সব দেখে হতাশ। তিনি ভাবলেন, সামান্য ধৈর্য্যের অভাবে আমি রিজুতার সাথে নাইট-কুইনটি যদি না বদলাতাম তাহলে সকল হীরেকলির মালিক তো আমিই হতাম।

আলাউদ্দিন

ইত্তেহাদুল করিম (বিভোর)
কলেজ নং : ৬৯৫৫
শ্রেণি : ৫ম-খ (দিবা)

আলাউদ্দিন আমাদের বাড়ির কাজের লোক। আমাদের বাড়ি সোনাপুর গ্রামে। একদিন আলাউদ্দিন এসে খবর দিল যে, সে একদিন ভোরবেলা বিলে গিয়েছিল। ওখানে নৌকার বৈঠা দিয়ে পানিতে বাড়ি দিতেই দেখে কয়েকটা পাখি মরে আছে। এখন সে বলল, 'একদিন যেতে হবে ভাই।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো হবেই।' আমি আলাউদ্দিনকে বললাম, 'কিন্তু বাবার বন্দুকটা কীভাবে নিব।' যখনকার কথা বলছি তখন বাবাকে কিছু বলতে হলে মায়ের মাধ্যমে বলতে হত। তার এক সপ্তাহ পরে বাবার একটি জরুরি কাজের জন্য সদরে যেতে হবে, তখন সদরে যেতেই লাগত তিন দিন আর কাজ শেষ হতে একদিন, ফিরে আসতে তিন দিন। তার মানে পুরো সপ্তাহই বাবা থাকবেন না। তার মধ্যে একদিন যে দোনলা বন্দুকটা ম্যানেজ করা যাবে না, তা তো হয় না। এরই মধ্যে একদিন আলাউদ্দিনকে বললাম, 'আজ ভোররাতে আমাকে তুলে দিস।' আগেই আম্মুকে ফাঁকি দিয়ে চাবিটা নিলাম। আমি প্রত্যেক দিন নিজের ঘরে ঘুমাই, আজ বাংলো ঘরে ঘুমাব। আলাউদ্দিন ভোররাতে এসে ডেকে নিয়ে যাবে। উত্তেজনায় আমার ঘুম আসছিল না। যখন ঘুমালাম, ঠিক তখন মনে হল দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে, আলাউদ্দিন?' বাহিরে থেকে আলাউদ্দিন বলল, 'হু।' ঝট করে আমি বের হয়ে আসলাম। বন্দুকে গুলি ভরে বললাম, 'চল।' তার পরে দুজনে রওনা দিলাম। বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা। তার মধ্যে আমি আলাউদ্দিনের পিছনে পিছনে চলছি। এত কুয়াশায় কীভাবে পথ চলে কে জানে। তারপর বিলের এই পারে পৌঁছে দেখি এক পাশে আমাদের নৌকাটা বাঁধা। নৌকায় উঠলাম এবং রওনা দিলাম। আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পথ চিনিস তো।' আলাউদ্দিন বলল, 'হু।' কী আশ্চর্য! খালি 'হু', 'হ্যাঁ' বলেই কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। কে জানে, হয়তো রাগ করেছে। বাড়ির কাজের লোক, কোনো কিছু বললে নাও করতে পারে না। অবশেষে আমরা বিলের ওই পাড়ে গিয়ে পৌঁছালাম। আমি তারপর বন্দুক তাক করে গুলি ছুড়লাম। দেখলাম আট-দশটা বুনোহাঁস আহত অবস্থায় পরে আছে এবং লক্ষ লক্ষ বুনোহাঁস কর্কশ শব্দ করে আকাশে উড়ে গেল। আমি বুনোহাঁসগুলো তুলতে গিয়ে শুনলাম একজন মেয়ে কাঁদছে। আমি হঠাৎ চমকে উঠি, হাঁস মারতে গিয়ে কোনো মানুষকে মেরে ফেললাম নাকি! আমি খেয়াল করলাম একজন নয় বেশ কয়জন মেয়ে কাঁদছে, স্বামী মারা গেলে কমবয়সী মেয়েরা যেভাবে কাঁদে ঠিক সেরকম কান্না। আমি আন্দাজে ভর করে যেদিক থেকে এসেছিলাম সেইদিকেই দৌড়াতে লাগলাম। কুয়াশা নেই বলেই মনে হয় তাড়াতাড়ি নৌকাটা পেয়ে গেলাম। হাঁসগুলো আনতে পারলাম না বলে আফসোসও হতে লাগল। নৌকায় উঠে দেখি সেখানে আলাউদ্দিন বসে আছে এবং তার পাশে অনেক আহত বুনোহাঁস। আমি খুশিতে চিৎকার করে বললাম, 'তুই হাঁসগুলি এনেছিস আলাউদ্দিন?' আলাউদ্দিন বলল, 'হ্যাঁ।' আমি হঠাৎ দেখলাম চাঁদ এখন ঠিক আমার মাথার উপরে। আশ্চর্য! এতক্ষণে তো চাঁদ ডুবে যাওয়ার কথা। তবে কী আলাউদ্দিন আমাকে মাঝরাতে উঠিয়ে নিয়ে আসল? আমাদের নৌকা তখন বিলের মাঝখানে। একি আলাউদ্দিন, না অন্য কেউ; তা নিয়ে আমার সন্দেহ হতে থাকে। সে চাদর দিয়ে এমন ভাবে মুখটা ঢেকেছে যে দেখা যায় না। হঠাৎ করে সে নৌকা থামিয়ে প্রথমবার কথা বলল, 'খিদা পাইছে, অনেকদিন তো কিছু খাই নাই।' শুনে আমি তো থ। এ আলাউদ্দিনের গলা নয়। এ কথা ভাবতে ভাবতেই আলাউদ্দিন একটা হাঁস ধরে কড়মড় করে তার মাথাটা খেয়ে ফেলল। আমি একটা আর্তচিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। রাতে এসে লোকজন আমাকে উদ্ধার করেছে। নিশ্চয় আলাউদ্দিন ভোররাতে ডাকতে গিয়ে দেখে আমি নেই। তাই লোকজন নিয়ে দেখতে এসেছে। ওই বিলটার খুব দুর্নাম আছে। বাবার বন্দুকটা বিলের পানিতে হারিয়ে গেছে বলে অনেক বকলেন। আমি খুশিমনে শুনলাম।

পরাজয়

মোঃ সাজিদুর রহমান
কলেজ নং : ১২৯৮৭
শ্রেণি : ৫ম-গ (প্রভাতী)

আমি তখন গ্রামের এক স্কুলে পড়ি। মফস্বল শহর, তবে গ্রাম বলাই চলে। সেখানে যেসব ছাত্র ছিল, তাদের কেউ গ্রামের ছিল না। এমন স্কুলে পড়তে পেরে অনেকে কিছুটা ভাব দেখাতো। স্কুলটা এত ভালো কেন? কারণ সেখানে একজন শিক্ষক ছিলেন। তার নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তার ভয়ে আমাদের সবরকম সমাস-সন্ধি মেনে চলতে হত। ভালোই চলছিল। একদিন তিনি আমাদের ফুটবলের উপর রচনা লিখতে দিলেন। আমরা অনেক কষ্টে যাচ্ছেতাই কিছু একটা দাঁড় করলাম। তিনি যখন খাতা দেখলেন, তখন তিনি যা বললেন তা পড়তে গিয়ে, অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদের অবস্থা নাজেহাল হয়ে গেল। এটা এরকম, 'একটি চর্মগোলককে বায়ুস্ফীত করতঃ একাদশ যুবক মাঠে অবতীর্ণ হইয়া দুইটি কাঠ দান্ডের ভিতর দিয়া গোলকটিকে ঢুকাইবার চেষ্টা করে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন সময় অজপাড়াগাঁ থেকে নতুন একটা ছেলে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল। তার নাম শমসের, সে কিছুটা গ্রাম্য ভাষায় কথা বলত। তাকে ভট্টাচায্যি মশাই-এর বিষয়টা বলতেই সে বলল, 'এত মাস্টারকে ফেল খাওয়াইলাম আর এহন কিনা ভট্টাইসের ডর দেহাও।' তার গ্রাম্য ভাষা শুনে আমরা হাসলাম। সমাস-সন্ধির ব্যাপারটাও জানালাম। সে বলল ভটাচায্যির ব্যবস্থা সে করবেই। টার্ম পরীক্ষা চলছে। এমন সময় শামসের চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার প্রচণ্ড আমাশার বেগ, এহনই ছুটি দেন; নাইলে ছুইটা যাইতাচ্ছি।' এ অবস্থা দেখে স্যার ছুটি দিয়ে দিলেন। এদিকে আমরা তার বাড়িতে গিয়ে দেখি সে মনের আনন্দে আম খাচ্ছে। পরদিন স্যারকে কে যেন বলে দিল। স্যার শামসেরকে তলব করতেই সে জবাব দিল, স্যার আমার আম খাবার আশা হয়েছিল, মানে 'আম+আশা = আমাশা'; স্যার ছেড়ে দিলেন। আমি বললাম, 'হনুমানটা ভালোই খোঁচা দিয়েছে।' এবার শমসের টাকা মেরে দেওয়ার মতলব করল স্যারের কাছ থেকে বিস্কুট কিনে খাবে বলে। ছাত্ররা স্যারের কাছ টাকা চাইতেই স্যার বললেন, 'বিষ+কুট = বিস্কুট'- 'বিষ' তো বিষই, আর 'কুট' মানে বিষ। আমি তোদের বিষ খাওয়ার জন্য টাকা দিতে পারব না।' কিন্তু স্যার বিষ বিষয়। এখানে দুই বিশ মিলে বিষয় হয়েছে তাই স্যারের বিস্কুট মিষ্টি; শমসেরের জবাব। এখন আমরা স্যারের রুমে ঢুকলাম। স্যার বললেন, 'আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারে নি। কিন্তু আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করলাম, এই নাও টাকা।' অবশেষে শমসেরকে আমরা গুরু হিসেবে মানি। তার কারণেই ভট্টাচায্যির অত্যাচার থেকে রেহাই পেলাম। এখন আর সমাস-সন্ধি মেনে চলতে হয় না।

সফর

মুন্সী আল আরাফাত (তানভীর)
কলেজ নং : ৬৫০৭
শ্রেণি : ষষ্ঠ-খ (দিবা)

৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার পর পেয়েছি এক লম্বা ছুটি। বছরের শেষের দিক তাই ছুটি হয়েছে বাবার অফিসও। তবে অফিস থেকে ঠিক হয়েছে যে, তারা একটি সফর করবে সবাই মিলে। আর সেই জায়গা হল কক্সবাজার। অফিস থেকে বলা হল প্রত্যেকের পুরো পরিবারকে নেওয়া হবে কক্সবাজার। তাই আমাদের ছুটি কাটাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। আমরা সকলে নির্দিষ্ট দিনে রাত ৯.০০ ঘটিকায় উপস্থিত হলাম বাবার অফিসে। বাসটি রাত ৯.৩০ ঘটিকায় ঢাকা ছেড়ে কক্সবাজার রওনা হল। মধ্যরাতে অর্থাৎ রাত ২.০০ ঘটিকায় আমাদের বহনকারী বাসটি একটি হোটেলের পাশে পার্কিং করল। আমরা তখন গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটাচলা করলাম ও হোটেলে রাতের খাবার শেষ করলাম। রাত ২.৩০ ঘটিকায় আমরা বাসে উঠে আবার কক্সবাজারের দিকে অগ্রসর হলাম। সকাল ৭.০০টায় আমরা কক্সবাজার পৌছলাম।

সেখানে গিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খাবার খাই। বিকালে আমরা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে ঘুরলাম। দেখলাম সূর্য ডোবার অপরূপ মনোরম দৃশ্য। এরপর আমরা হোটেলে ফিরি ও যথাসময়ে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন আমরা শহরটি ঘুরতে বেরুলাম। সেখানে ছিল সুন্দর সব পাহাড়। তার মধ্যে ছিল হিমছড়ি পাহাড়। হিমছড়ি পাহাড় এর উপরে আমরা উঠলাম। সেখানে দাঁড়ালে মনে হয় আমি পৃথিবীর উচ্চতম স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড় থেকে নেমে আমরা হিমছড়ি ঝর্ণার কাছে গেলাম। হিমছড়ি থেকে তারপর আমরা কক্সবাজারের এক স্থানীয় গাড়ি, যাকে বলে চান্দের গাড়ি,

তাতে করে আমরা গেলাম বাংলার শেষপ্রান্ত টেকনাফে। সেখান থেকে আমরা মুক্তা ও ঝিনুকের বিশেষ কিছু জিনিস কিনে সূর্যাস্ত দেখে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে আমরা নাস্তা শেষ করে গেলাম কক্সবাজারের বিখ্যাত Barmiz Market-এ। সেটা এমনই এক Market, যেখানকার সব কিছুই মায়ানমার (বার্মা) থেকে আমদানি করা। Barmiz Market থেকে আমরা ঘরের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জিনিসপত্রসহ বিভিন্ন খেলনা ও বিখ্যাত Barmiz আঁচার কিনলাম। তারপর হোটেলে ফিরে সমুদ্রে গোসল করার জন্য নামলাম। গোসলের সময় আমার ডুবে যাওয়ার বেশি আশাঙ্কা ছিল, কারণ আমি সাঁতার জানতাম না। তবুও আমি সমুদ্রে ফুটবল খেলেছি। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ মাঝে মাঝে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমি কম পানি সম্পন্ন সমুদ্রস্থানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। তখন যেন আমি সমুদ্রের তলায় চলে যাচ্ছিলাম। আমি দ্রুত সরে দাঁড়ালাম। গোসল শেষে যখন হোটেলে ফিরব তখন লিফটে লেখা দেখলাম, দয়া করে ভেজা কাপড় নিয়ে লিফটে উঠবেন না, তাই সিঁড়ি ব্যবহার করেই ৭ম তলা পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল আমাদের। তারপর একেবারে পরিষ্কার হয়ে কিছু খেয়ে আমরা কিছুক্ষণ ফুটবল খেললাম। বিকালের দিকে আমরা হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে হোটেলে টেলিভিশন দেখলাম। বাসায় ফেরার সময় ছিল ঐদিন রাত ৯.০০টায়। তাই আমরা তৈরি হয়ে রাত ৮.৫৫ ঘটিকায় বাসে উঠলাম এবং ৯.০০ টায় বাস ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হল। সকাল ৭.১৮ ঘটিকায় আমরা বাসায় ফিরলাম। আমাদের এই সফরটি খুব মজার হয়েছিল। আমরা খুব আনন্দ করেছিলাম। কক্সবাজারের বায়ু এবং পরিবেশ নির্মল ও অপূর্ব সুন্দর। আমার তো ইচ্ছে হয়েছিল সেখানে সারা জীবন থেকে যাই। তবে এই ইচ্ছা সারাজীবন ইচ্ছাই থাকতে পারে, আবার সত্যিও হতে পারে। যদি সত্যি হয় তবে আমার খুব মজা হবে।

অপ্রাপ্তির বছর

মোঃ আবরার জাহিন
কলেজ নং : ১২৫৮৭
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ-গ (প্রভাতী)

বছরটি ২০১৩। আমি পড়ি পঞ্চম শ্রেণিতে। চতুর্থ শ্রেণি হতে ৮ম স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। শাখা ভাগ হবার পর 'খ' শাখায় স্থান পেয়েছি। বছরটাও কাটছিল ভালোই। স্বাভাবিকভাবেই পড়াশুনা চলেছে। স্কুলে পড়ছি, টিউটরের কাছে পড়ছি। সব মিলিয়ে সবকিছু ভালোই চলছে। মার্চেই চলে এল প্রথম মডেল টেস্ট। প্রস্তুতি ভালোই; ফলাফল প্রকাশের পর দেখি প্রথম হয়েছি। আমি খুশিতে আত্মহারা। প্রথম স্থান পাওয়ার প্রেরণায় আমি আরো জোরেসোরে পড়ছিলাম। এভাবেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মডেল টেস্টেও প্রথম হয়েছিলাম। প্রথম সাময়িক পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছিলাম। কিন্তু বৃত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে দেখি, আমাকে দ্বিতীয় বানিয়ে দিয়েছে। যাক, কিছু বললাম না! কোনো প্রতিবাদ করি নি। কিন্তু মনে মনে ক্ষোভ থেকে গেল। ফাইনাল মডেল টেস্ট এর উপর ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া নির্ভর। আমি পরীক্ষা ভালোই দিচ্ছি। চারটি পরীক্ষা শেষ, দুটি বাকি। অন্যদের তুলনায় ভালোই দিয়েছি। কিন্তু, পঞ্চম পরীক্ষা আর দিতে পারলাম না। চতুর্থ পরীক্ষা শেষে মা'র কাছে দৌড়ে আসছি। হঠাৎ, ঘটে গেল দুর্ঘটনা। আমি আমার ভারসাম্য হারালাম। পড়ে গেলাম। হাসপাতালে গিয়ে এক্স-রে করে দেখা গেল, ডান হাতের কবজির হাঁড়ে বড় ফ্র্যাকচার হয়েছে। পুরো ডান হাতই ডাক্তার প্লাস্টার করে দিলেন। ফাইনাল মডেল টেস্ট দিতে পারলাম না। সমাপনী দেয়াটাও অনিশ্চিত। একটা এভারেজ নাম্বার দিয়েও আমিই প্রথম হলাম। আল্লাহর অশেষ রহমতে নিজ হাতে সমাপনী ভালোভাবে দিতে পারলাম। বই বিতরণী উৎসবে উপস্থিত হলাম মনে অনেক খুশি নিয়ে। প্রথম পুরস্কার বইটি পাব এবং সচিবের নিকট থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির বই নিব। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীরা পুরস্কার নিল, আমার নাম এল না। মনে কষ্ট নিয়ে বাসায় ফিরলাম। জীবনে কেউ যেন এত কষ্ট না পায়।

রহস্যময় কাহিনী

সাখাওয়াত শাহিন মাহামুদ
কলেজ নং : ১১৯৫১
শ্রেণি: সপ্তম-খ (প্রভাতী)

প্রতিদিন কত অলৌকিক ঘটনাই না ঘটছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এসব ঘটনা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু সত্য বিশ্বাস করতেই হয়। তেমনি কিছু রহস্যময় ও সত্য ঘটনা রয়েছে মমি (Mummy) কে নিয়ে। মমিকে নিয়ে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য ২টি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হল: মিশরীয় রাজা-রানীরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় দেহে ফিরে আসে তাই তাঁরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের মৃতদেহ মমি করে কফিনে রেখে দেওয়া হত। এই মিশরের ফারাওদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম 'তুতেন খামেন'। তিনি অল্প বয়সে মারা যান এবং প্রথা অনুযায়ী তার মৃতদেহ প্রচুর ধনরত্ন মনিমুক্তা সহকারে সোনার কফিনে মমি করে রাখা হল। এরপর ১৯২২ সালের ২৬ শে নভেম্বর বিশিষ্ট প্রত্নতাত্তিক মিঃ হাওয়ার্ড ও তাঁর পার্টনার কর্নারভানকে সাথে নিয়ে তুতেন খামেনের এই মমি আবিষ্কার করেন। আর তখন থেকেই ঘটতে থাকে সব রহস্যময় ঘটনা। তুতেন খামেনের মমি আবিষ্কারের ৫ মাসের মধ্যে অজ্ঞাত রোগে মারা গেলেন কর্নারভান। ডাক্তাররা ব্যর্থ হন রোগ নির্ণয়ে। একই সাথে ঘটল আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা। যে সময় তিনি মারা গেলেন, সেই সময় কায়রো শহরের সব কটি বৈদ্যুতিক বাতি রহস্যজনকভাবে নিভে যায়। এখানেই শেষ নয়, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কুকুরটি গোটা তিনেক ডিগবাজি দিয়ে উল্টে মারা যায়। এরপর বিজ্ঞানীরা এক অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করেন। মমির গায়ে মশার কামড়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ছিদ্র ছিল তা কর্নারভানের গায়েও ছিল। কিন্তু বিপরীত কাণ্ডটি ঘটেছে মূল আবিষ্কারকের ক্ষেত্রে। তিনি ১৯৩৯ সালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। এবার রহস্যময় কাহিনীর ২য় পর্ব: খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে মিশরের রাজকুমারী আমেনারী মৃত্যুবরণ করেন, রাজকুমারী মৃতদেহকে নিয়ম অনুসারে মমি করে রাখা হয়। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এই রাজকুমারীর মমি কেনার জন্য ৩ জন ইংরেজ মিশরে আসেন, তাদের মধ্যে ১ জন কয়েক হাজার পাউন্ড খরচ করে মমিটি কিনে নেন। মমি কেনার ১ ঘণ্টা পরে তাকে মরুভূমির দিকে যেতে দেখা যায়। তিনি আর ফেরেন নি। অপর দুইজন মমি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরেন। এদের মধ্যে একজন ফিরে এসে দেখেন তার সব সম্পত্তি জাল করে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং অপরজন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তার চাকুরি চলে যায়। জানা যায় শেষ জীবনে সে ব্যক্তিটি দিয়াশলাই বিক্রি করতেন। এই মমিটি জাদুঘরে রাখা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই মমি স্পর্শ করেছে সেই দুর্ভোগে পড়েছে। মমিটির মুখ পরিষ্কার করে এক মহিলা। এক সপ্তাহের মধ্যে তার ছেলে অলৌকিকভাবে মারা যায়। গোসল করার জন্য পুকুরে যায় কিন্তু আর ফেরে নি। পরে পানিতে কাপড় ভাসতে দেখা যায়। এরপর এক ফটো সাংবাদিক মমির ছবি তোলেন। ডেভলপ করে দেখতে পান রাজকুমারীর মুখের বদলে বিভৎস, বিকৃত মুখাবরণ। তিনি সেই রাতেই আত্মহত্যা করেছিলেন। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এই খবরটি জানতে পেরে মমিটি প্রর্দশন বন্ধ করে দেন এবং তা স্থান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়ে একজন প্রধান নির্বাহী নিযুক্ত করেন। কিন্ত এই প্রধান নির্বাহীকে টেবিলের উপর মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায়। মানুষের শখ অনন্ত। এক ইংরেজ মমিটি কিনে নিয়ে বাড়ি আসেন। কিন্তু দু'দিন পর তার স্ত্রী, ছেলে ও কাজের লোকসহ সবাইকে একই সঙ্গে ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁসি দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর লোকটি মমিটিকে বাইরে ফেলে দেয়। কিছুদিন পর তাকেও অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তার গায়ে এক অদ্ভুত পোকা দেখা দেয় এবং তার সমস্ত শরীর খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। তার মৃত্যুর পর সেই একই পোকা মমির গায়ে দেখা যায়। কী পাঠক, ভয় পাচ্ছেন? ভয় পেলে শেষ প্যারাটি পড়ুন। তারপর বইটি বন্ধ করে গান শুনতে থাকুন, দেখবেন ভয় কেটে গেছে। হায়রে মানুষের শখ। এর আর শেষ নেই। এক আমেরিকান পর্যটক মমিটি কিনে স্বদেশে ফেরার জন্য নিউইয়র্কগামী এক বিখ্যাত জাহাজের কেবিন ভাড়া নেন এবং ঠিক সময়ে সেই জাহাজে আরোহন করে। ওটা সেই জাহাজের প্রথম যাত্রী। হ্যাঁ, পাঠক ঠিক বুঝতে পেরেছেন। জাহাজটি আমাদের সবার চেনা টাইটানিক, রহস্যজনক নয় কী ???.....

ভণ্ড ফকিরের শাস্তি

আব্দুল্লাহ আল যুবায়ের
কলেজ নং : ৫৭৬৯
শ্রেণি : সপ্তম-সি (দিবা)

এক গাঁয়ে এক মৌসুমে প্রচুর বক আসে। তারা পুকুরের মাছ এবং শস্যদানা অতিরিক্ত মাত্রায় খেতে শুরু করে; যার ফলে কৃষকদের এবং জেলেদের অনেক লোকসান হয়। তাই সবাই গ্রামের নামকরা ফকিরের কাছে যায়। তারা জানত না যে সে একজন ভণ্ড ফকির-যা গ্রামের একটি ছেলে জানত। তবে সে ছোট বিধায় তার কথায় কোনো গুরুত্ব দেয়া হল না। সেই ছেলেটি আর কেউ নয়। সে ছিল দিনু, গ্রামের সবচেয়ে সাহসী ও বুদ্ধিমান ছেলে। ভণ্ড ফকির টাকা পেয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করল। এদিকে গ্রামের উপর দিয়ে তখন ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। এতে সব বক মারা গেল। কিন্তু ফকির বলল তার মন্ত্র কাজ করেছে। দীনু সেখানেই উপস্থিত ছিল। এবার সে বলে উঠল, 'ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' এতে গায়ের লোকেরা বুঝতে পারল, আসলে ঝড়েই বকগুলো মারা গেছে। তারপর তারা ভণ্ড ফকিরকে মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

নিশীথ রজনীতে বটবৃক্ষ

অরণ্য অথই চৌধুরী
কলেজ নং : ৫৭৮২
শ্রেণি : ৭ম-সি (দিবা)

এই ঘটনাটি আমার বাবার বন্ধুর কাছ থেকে শোনা। তিনি মাঝে মধ্যেই আমাদের বাড়িতে আসেন। তেমনি ভাবে বছর তিনেক আগে আমাকে একটি ঘটনা শোনান। তখন আমি চতুর্থ শ্রেণির চৌকাঠ সবেমাত্র পেরিয়েছি। একদিন আমি বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে অবসর দিন কাটাচ্ছি। তখন কাকু এলেন। কাকু খেয়ে দেয়ে যখন পত্রিকা পড়ছিলেন তখন আমি তাকে বললাম, 'কাকু ভূত বলতে আদৌ কিছু আছে কি?' কাকু বললেন, 'ধুর, ভূত বলতে কিছুই নেই, আছে খালি দৃষ্টিবিভ্রম বা মনের ভুল।' তিনি কিছুক্ষণ থেমে বললেন, 'আমার কাজ তো তুমি জানই, আমি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যখন তখন বদলি হয়ে যায়। ২০১০ সালে আমার ট্রান্সফার হয় অজ পাড়াগাঁয়ে। নাম ছিল নবীনগর। সেই সময়কার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লে গায়ে আজও শিহরণ জাগে, এটি ভূত না অন্যকিছু তা আমি জানি না।' এই বলে তিনি একটু থেমে পরে বললেন, ট্রেন ছিল সকাল দশটাতে; পৌছানোর কথা ছিল বিকাল চারটাতে, কিন্তু পৌছে গেলাম রাত বারোটার পর। ফোন করে বলে দেওয়া ছিল যে, শওকত নামের একজন লোককে পাঠানো হবে, কিন্তু গিয়ে দেখলাম কেউ নেই। অগত্যা হেঁটেই অগ্রসর হলাম। হাঁটতে হাঁটতে যখন পা টনটন করছে, তখন একটু দূরে দেখলাম একটি বটগাছের মতোন কী যেন একটি গাছ। ও নিয়ে তেমন মাথা ঘামালাম না। কিছুক্ষণ পর, যখন গাছ থেকে আমার দূরত্ব ১০০ মিটার; তখন আমি যা দেখলাম, তা স্বচোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। দেখলাম গাছের মাঝামাঝি ডালে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ওমা! তারপর দেখলাম তা মানুষ নয়, তা মৃতদেহ এবং তা গাছের একটি মোটা ডালে দড়িতে গর্দান দিয়ে ঝুলে আছে। হয় সে আত্মহত্যা করেছে, নয় তাকে কেউ ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। এর পর কাকু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ থেকে পরে বললেন, আমি দৌড়াতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু মনে হল আমার পা যেন অসাড় হয়ে গেছে, হাঁটতে পারছি না। তবুও দেহের সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ দূরে একটা ক্ষীণ আলোর ইশারা দেখলাম। সেই আলো দেখে মনে আশার আলো ফুটল। দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটি একটি বাসা। আমি দরজায় কড়া নাড়লাম। একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। তার কাছে আমি একটু পানি চাইলাম এবং একগ্লাস পানি খেলাম। তারপর তারা আমাকে থাকার জন্য একটি ঘর দিলেন। খাওয়ার জন্য ভাত ও মাছ দিলেন। খেতে খেতে তাকে আমি সমস্ত ঘটনা বললাম। আমি সব কিছু বলে কাছে থাকা বিছানাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কাকু বললেন সকাল বেলা উঠে দেখলাম তারা নাস্তা সাজিয়ে বসে আছেন। নাস্তার টেবিলে ভদ্রলোকটি বলতে শুরু করলেন, ১৮১৫-১৮১৬ সালের দিকে ইংরেজরা এই অঞ্চলের কৃষকদের অত্যাচার করত। অত্যাচারের মাত্রা সইতে না পেরে একজন কৃষক ডালে দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করে। তারা এও বললেন, এখনও তাকে ওই ভাবে দেখা যায়। কাকু তখন দেখলাম স্থির হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। পরে বললেন আজ এখানেই শেষ ঘুমিয়ে পড়; রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়। আমি ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার সময় খালি ওই স্বপ্নই দেখছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি অবিনাশ কাকু চট্টগ্রাম চলে গেছেন। সাতটার ট্রেন ধরে গেছেন। এর মাঝে কাকু আর আসেন নি।

এশিয়া কাপের গল্প

রাইয়ান নোমান খান
কলেজ নং : ১৩৯৯৭
শ্রেণি : অষ্টম-গ (প্রভাতী)

এশিয়ার ক্রিকেট উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার ক্রিকেট বোর্ড প্রধানদের আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। পরে ক্রিকেটের প্রসার এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে আয়োজন করে প্রথম এশিয়া কাপ। ১৯৮৪ সালে সদ্য বিশ্বকাপজয়ী ভারত, পরীক্ষিত শক্তি পাকিস্তান এবং উদীয়মান দেশ শ্রীলংকাকে নিয়ে তখনকার জনপ্রিয় ভেন্যু সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় বসে এশিয়া কাপের প্রথম আসর। টানা দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ১৯৮৩ সালে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয় করা ভারতীয় দল শ্রীলংকাকে ১০ উইকেট এবং পাকিস্তানকে ৫৪ রানে পরাজিত করে জিতে নেয় প্রথম এশিয়া কাপের শিরোপা। দু'বছর পর শ্রীলংকার মাটিতে অনুষ্ঠিত হয় ২য় এশিয়া কাপ। সেই এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে জয়ী হয় শ্রীলংকা। ১৯৮৮ সালে ৩য় এশিয়া কাপ আয়োজনের সুযোগ লাভ করে বাংলাদেশ। সেবার প্রথম এশিয়া কাপে ৪টি দল অংশগ্রহণ করে। এবারও শ্রীলংকাকে ৪ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় ভারত। এভাবে চলতে থাকে এশিয়া কাপ সিরিজ। গত বছর ২০১২ বাংলাদেশের মাটিতে বসে একাদশ এশিয়া কাপ এর আসর। নিজেদের দেশে আয়োজিত ৩য় এশিয়া কাপ বাংলাদেশ স্মরণীয় করে রাখে ভারত ও শ্রীলংকাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার মাধ্যমে। কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে অদম্য লড়াকু টাইগাররা অল্পের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে ব্যর্থ হয়। মিরপুর শের-ই বাংলা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের কাছে মাত্র ২ রানে হেরে গিয়ে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পুড়লেও দুর্দান্ত স্পিরিট সম্পন্ন বাংলাদেশ দল সম্পর্কে ক্রিকেট বিশ্বে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এক যুগ পর পাকিস্তান ২য় বারের মতো এশিয়ার সেরা দলের মর্যাদা লাভ করে। কাকতালীয় ব্যাপার হল, এর আগে পাকিস্তান ২০০০ সালে প্রথম এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশের মাটিতে। এ বছর ২০১৪ সালে এশিয়া কাপের আসর বসে বাংলাদেশে। এবারই প্রথম এশিয়া কাপে আফগানিস্তান সহ ৫টি নতুন দল অংশগ্রহণ করে। এ এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২য় বারের মতো এশিয়া কাপের শিরোপা জিতে শ্রীলংকা। ১৯৮৮, ২০০০, ২০১২ সহ চতুর্থ বারের মতো এশিয়া কাপের আয়োজক হয় বাংলাদেশ।

বাল্যবন্ধু ভয়ংকর

মুন্সী আল আরাফাত
কলেজ নং : ৬৫০৭
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ (দিবা)

আজ দু'দিন হল আমরা এখানে এসেছি। আমরা বলতে আসলে বোঝাচ্ছি আমাকে আর আমার খালাত ভাই তুষানকে। তুষান ভাইয়া আমার চেয়ে ৩ বছরের বড়। আমি পড়ি ৫ম শ্রেণিতে আর ওঁ পড়ে ৮ম শ্রেণিতে। তবে, আমার চেয়ে ৩ বছরের বড় হলে কী হবে- ওঁর উচ্চতা, বুদ্ধি, শক্তি সব আমার চেয়ে অনেক বেশি; প্রায় বড়দের সমান বুদ্ধি। আমরা গত পরশু এসেছিলাম আমাদের এক খালার বাড়ি। গ্রামাঞ্চল হলেও আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাকে ছোটখাট শহরই বলা চলে।

আমি আর তুষান ভাইয়া এখানে এসেছিলাম একটু হাওয়া বদল করতে। আমরা দু'জনেই ঢাকা থাকি। সেখানে ফার্মের মুরগির মতো জীবনযাপন করতে আমারও যেমন খারাপ লাগে, তেমনি তুষান ভাইয়ারও। যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা, তা প্রায় পূরণ হলেও আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল; যা মনে হচ্ছিল পূরণ হবে না। সেই ইচ্ছাটি ছিল তুষান ভাইয়ার গোয়েন্দাগিরি করার ইচ্ছা। তবে সেটা শেষ দু'দিনেই পূরণ হবে তা ভাবতেও পারি নি।

একদিন আমি আর তুষান ভাইয়া বসে আছি চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে। এখানে বসে আশপাশটা দেখছিলাম। দু'জন লোক এসে আমাদেরই পাশে বসল। একজনকে এখানকার সবাই চেনে বলে মনে হল। তার নাম জয়নাল আবেদীন। আরেক জনকে মনে হল আমাদেরই মতো নতুন লোক, যদিও আমি এখনও তার নাম জানতে পারি নি। তাদের দু'জনের কথা বার্তা ছিল একটু সন্দেহজনক। জয়নাল লোকটি বলল, 'আমার আবার শত্রু হবে কোত্থেকে?'

অন্যজন বলল, 'তাহলে, এটার মানে তুমি বার করতে পারবে?' জয়নাল তখন আবার ঝিমিয়ে পড়ল। মিনিট চারেক পর তারা ওঠে চলে গেল। আমরা এসেছিলাম পাঁচটায়। তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা, তুষান ভাইয়ার নির্দেশে আমি উঠে পড়লাম। দু'জনই বাড়ি-মুখো হলাম। যেতে যেতে, তুষান ভাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটার নাম জানিস?' আমি বললাম, 'জানি বই কী? জয়নাল তো।' তুষান ভাইয়া হালকা রেগে গিয়ে বলল, 'তোর মাথা! ঐ লোকটার নাম, যে তার পাশে বসা ছিল.....।' আমি সোজাসুজি বললাম, 'জানিনা।' তুষান ভাইয়া বলল, 'মোঃ রমজান হোসেন।' আমি বললাম, 'বুঝলে কীভাবে?' তার সোজা উত্তর, 'ভিজিটিং কার্ড দেখে।' ভিজিটিং কার্ড মানে আমি জানি। কিন্তু সে লোক তো তুষান ভাইয়াকে কোনো কার্ড দেয় নি। উপরন্ত তার সাথে একটি কথাও বলে নি। যাই হোক পৌনে ছ'টায় বাড়ি পৌছালাম। তুষান ভাইয়া সোজা খালুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জয়নাল লোকটি থাকে কোথায়?' খালু বললেন, 'জয়নাল.... কে, কোন জয়না ----ল! আচ্ছা। জয়নাল মিয়া তো ভারী রহস্যজনক লোক, একা থাকে। তা তোমার কী দরকার তার সাথে?' তুষান ভাইয়া বলল, 'এমনি। এত রহস্যজনক লোক, একবার যদি দেখা করতে পারতাম ভালো লাগত।' খালু বললেন, 'আমাদের বাড়ির পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে সোজা যাবে। তারপর ডাইনে যাবে। বড় বটগাছটা পেরিয়ে। ওই খানে শুধু একটাই বাড়ি। ওটাই জয়নাল মিয়ার।' তুষান ভাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করে, 'লোকটাকে সম্বোধন করব কী বলে?' খালু একচোট হেসে পর বললেন, 'চাচাই বলো।' তুষান ভাইয়া ধন্যবাদ বলে চলে এল। ঠিক হল আমি আর তুষান ভাইয়া পরদিন সকাল ন'টায় যাব জয়নাল চাচার বাড়ি। পরদিন সকাল ৮টায় ঘুম ভাঙল। আমি আর তুষান ভাই নাস্তা খেয়ে গরম কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কনকনে শীত। তার ওপর গাছ পালায় ঘেরা এই জায়গাটিকে খুবই ভুতুড়ে লাগছে। ভেবে অবাক হলাম এমন এক ভূতুড়ে জায়গায় জয়নাল চাচা একা থাকেন। সত্যি লোকটার সাহস কম না। বটগাছ পেরিয়ে, ডইনে ঘুরে আমার চোখ তো ছানাবড়া! এমন জায়গায় এত বড় আলিশান বাড়ি। প্রথমেই প্রকাণ্ড বাগান, তারপর বা বাঁদিক দিয়ে ঘুরে মূল ফটকে গিয়ে বেল টিপলে ঘরে ঢোকা যায়। আমি আর তুষান ভাইয়া বেল টিপতেই দরজা খুললেন রমজান হোসেন নামক লোকটা। তুষান ভাইয়া বলল, 'আমি একটু জায়নাল চাচার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' আমি ঝটপট বললাম, 'আমিও!' লোকটি নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। বাড়িটার গঠন সর্ম্পকে একটা ধারণা দিই। গেট দিয়ে ঢুকেই একটা সোজা প্যাসেজ। এর বাঁয়ে একটা ঘর, ডানে বৈঠকখানা। আরো সামনে গিয়ে ডাইনিং রুম। তারপর আর দেখতে পারি নি। জয়নাল চাচা আমাদের দেখে বললেন, 'তোমরা কে বাছারা?' তুষান ভাইয়া বলল, 'আমরা খান বাড়ির লোক। আতিক খান আমার খালু।' জয়নাল চাচা চিনতে পারলেন। আমাদের নাম জানতে চাইলেন, নাম বললাম। আগেই বলেছি, তুষান ভাইয়ার হাবভাব একদম বড়দের মতো। সে জানতে চাইল, 'আপনি এখানে কদিন আছেন?' চাচা বললেন, 'প্রায় বছর দশেক।' তুষার ভাইয়া বলল, আপনার সাথে আর কে থাকে?' চাচা জবাব দিলেন 'কেউ থাকে না, আমি একাই থাকি। তবে ইনি কিছুদিন হল এখানে এসেছেন।' তুষান ভাইয়া একবার তার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি করেন?' এবারে চাচা বলে উঠেন, 'বাবাজিরা! তোমরা কী পুলিশের লোক নাকি? কখন থেকে জেরা করছ?' তুষান ভাইয়া খোঁচাটা অগ্রাহ্য করে বলল, 'আপনি যে উদ্বিগ্ন, তা বোঝা যাচ্ছে। সেটাই দূর করতে চাচ্ছিলাম।' চাচা বললেন, 'তোমরা কী আর বুঝবে? আমার কোনো শত্রু নাই, নাই মিত্রও। আর আমাকেই হুমকি।' তুষান ভাইয়া বলল, হুমকিটি কী ধরনের?' চাচা রমজান হোসেনের দিকে তাঁকিয়ে বললেন, 'রমজান ভাই বলব নাকি এদের?' ঐ লোকটি বলল, 'বলে ফেলো।' তারপর চাচা বললেন, 'প্রায় চারদিন আগে আমি বাইরে বেরিয়ে ছিলাম। ঘরে এসে বিছানায় বসতে গিয়ে দেখি এক টুকরা কাগজে লেখা, তোমার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত থাক। আশ্চর্য হল, প্রত্যেকটি শব্দ বইয়ের পাতা থেকে কেটে নেয়া।' তুষান ভাইয়া বলল, 'একবার আমি চিঠিটি দেখতে চাই।' চাচা বলল, 'অবশ্যই, দেখতে চাও তো দেখ।' রমজান নামের লোকটি ওটা নিয়ে আসল আর বলল, 'আমি ইলেক্ট্রনিকের কাজ করি ঢাকায়।' তুষান ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'এনাকে আপনি চিনেন?' লোকটি বলল, 'না তবে তার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।' সে বলল একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আসতে। তুষান ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাড়ি কেথায়?' ভদ্রলোক বলল, 'রংপুরে।' কাগজটি দেখে আসলে লাভ কিছুই হয় নি। চাচা যে রকম বলেছে সে রকমই। তুষান ভাইয়া চাইল-চাচার শোবার ঘরটা দেখতে। লোকটি নিয়ে গেল। খাটের পাশেই জানালা। সুতরাং জানালা দিয়ে খুব সহজেই কাগজটা ছুঁড়ে মারা যেতে পারে। তুষান ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কবে এলেন?' লোকটি বলল, 'এক হপ্তা আগে।' তুষান ভাইয়া ধন্যবাদ দিয়ে তাদের কাছ

থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরল। আমাকে বলল, 'সেই ছবিটা দেখেছিস?' আমি বললাম, 'চাচার শোবার ঘরে একটি ছবি দেখেছি। মনে হল অনেক আগের।' তুষান ভাইয়া বলল, 'দৌড়া!' দৌড়া বলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বুঝেছি সে কোথায় গেছে। তাই আমিও দৌড়ালাম। ২ মিনিটে চাচার বাড়ি পৌছালাম। ফটক খোলা। তাই ঢুকে পড়লাম। তুষান ভাইয়া চাচাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ছোট বেলার কোনো শত্রু আছে কি? চাচা বলল, 'একবার স্কুলে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ল্যাঙ মেরে বেস্ট রানারকে অকেজো করে দিয়েছিলাম। তাই জিতেও ছিলাম। কিন্তু বেচারাকে ৩ মাস হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়।' 'তারপর কি হল?' তুষান ভাইয়া জানতে চাইল। চাচা বলল, 'তারপর সে কোথায় যে চলে গেল জানি না।' তুষান ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'বেডরুমের ঐ ছবিতে সে লোকটি আছে কিনা আর ঘটনাটি কবে ঘটে?' চাচা শোবার ঘরে যেতে যেতে বলল, 'প্রায় ৪০ বছর আগের ঘটনা।' তারপর ছবিতে একজন ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'এই সেই ছেলে।' ধন্যবাদ জানিয়ে আবার বাড়ি ফিরলাম। এবার আর কোথাও যাব না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমি তো প্রথমবারেও এসব জিজ্ঞেস করতে পারতে। তুষান ভাইয়া বলল, 'ঐ লোকটার সামনে নয়।' বিকালে আবার সে চায়ের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম, রমজান নামের ঐ লোকটা এগিয়ে এল। আমাদেরকে অনেক খাতির করে বলল, 'এ ঘটনা যে কে ঘটাল আল্লাহ জানেন।' লোকটি আরো বলল, 'তবে তো ভালই গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছ, চালিয়ে যাও।' আশা করি তুমি এর কিনারা করতে পারবে।' তুষান ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে যাচ্ছেন?' লোকটা বলল, 'আগামীকাল দুপুরের ট্রেনে।' আমরা আর মিনিট খানেক পর বাড়ি-মুখো হলাম।

পরদিন সকালে আবার চাচার বাড়িতে গিয়ে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। রাত্রে নাকি মুখোশ পরা একটি লোক জানালা দিয়ে তার ওপর আক্রমণ করতে আসছিল। এখন বাড়িতে ডাক্তার এসে তাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পড়িয়ে রেখেছে। তাই ভাইয়া রমজান নামের লোকটাকে বলল, 'চাচা কীভাবে দেখলেন মুখোশধারীকে, জানেন?' লোকটি বলল, 'রাত্রে নাকি বিজলী চমকাচ্ছিল, সেই আলোতেই নাকি দেখতে পায়।' 'উনি চিৎকার দিলে আপনি দৌড়ে গিয়েছিলেন?' লোকটি বলল, 'আমি এক ঘুমেই রাত কাবার করে ফেলি। তাই তার চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে নি। তবে সকালে এসে এই অবস্থায় দেখে ডাক্তার ডাকি।' আপনি রওনা দেবেন ক'টায়?' লোকটা বলল, 'সাড়ে ১১টায়।' তুষান ভাইয়া বলল, 'তাহলে আমিও আপনার সাথে স্টেশন পর্যন্ত যাব।' লোকটি বলল, 'ঠিক আছে কিন্তু তোমার চাচাকে এই অবস্থায় রেখে আমার তো যেতে মন চাচ্ছে না।' সাড়ে ১১টার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরাও স্টেশন রওনা দিলাম। ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীর পকেটটা বেশ ঝুলছে। যাই হোক, ১৫ মিনিটেই স্টেশন পৌছালাম আমরা। লোকটি বলল, 'তাহলে আমি যাই।' তুষান ভাইয়া আর আমি ২ জনেই বাবা-মার শেখানো বুলি আওড়ালাম, 'আবার আসবেন।' তারপর স্টেশন ফটকের বাইরে এসে তুষান ভাইয়া কেন জানি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি দেখলাম রমজান সাহেব একটি দোকানে গিয়ে কী যেন কিনে ট্রেনে উঠলেন। তার সুটকেসে সম্ভবত লেখা ছিল, মোঃ রমজান হোসেন এর প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে। তারপর আমি আর তুষান ভাইয়া বাড়িমুখো হলাম। বাড়ি পৌঁছে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো সমাধান খুঁজে পেলে?' তুষান ভাইয়া বলল, 'ইয়েস! বাচ্চু, ইয়েস!' তারপর বলল, আজ বিকালে চাচার বাড়ি যাব। বিকালে চাচার বাড়ি পৌছে তুষান ভাইয়া বলল, 'চাচা! ও চাচা! আপনি একদম টেনশনমুক্ত থাকুন। অনুমতি দিলে আমি একটু রমজান সাহেবের রুমটা দেখতে চাই।' চাচা আমাদেরকে রুমটা দেখিয়ে দিলেন। আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল। তাই খাটটাতে একটু হেলান দিয়ে বসলাম। হঠাৎ আমার চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় তুষান ভাইয়া একটা মুখোশ এনে আমার উপর ছুঁড়ে মারল। আমি জিজ্ঞেস করলাম করলাম, 'কই পেলে এটা?' তুষান ভাইয়া বলল, 'খাটের নিচে ছিল।' আমাকে সে মুখোশটা দিয়ে দিল। আমি মুখোশটা মুখে লাগালাম। বুঝলাম এতে সিগারেটের গন্ধ রয়েছে, যেটা আমি একদম সইতে পারি না। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমিও। এরপর তুষান ভাইয়া চাচার কাছে গিয়ে বলল, 'চাচা আমি আপনাকে বললাম না টেনশন করবেন না।' চাচা বলল, 'আমার জীবন যায়, আর তুমি বলছ আমি টেনশন না করি।' তুষান ভাইয়া বলল, 'আপনি কাল সকাল পর্যন্তই টেনশন করতে পারবেন। এরপর আর পারবেন না।' আবার ধন্যবান জানিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

'আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো ভাড়াটে গুন্ডার কাজ হতে পারে।' তুষান ভাইয়া বলল, 'নাহ্ কোনো ভাড়াটে গুন্ডার কাজ নয়। এটা মোঃ রাজীব হোসেনের কাজ।' আমি জানতে চাইলাম, 'রাজীব হোসেন কে?' তুষান ভাইয়া বলল,

'বিখ্যাত রোমাঞ্চ সিরিজের লেখক রাজীব হোসেন।' আমি বললাম, 'তুষান ভাইয়া, তোমার মাথা নষ্ট হয়েছে। এই রহস্যটা অনেক জটিল। তোমার দরকার নেই সমাধান করার।' ভাইয়া বলল, 'মন দিয়ে শোন! সেই কাগজটা ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় রাখা যেত। কিন্তু রাজীব হোসেন সেটা ইচ্ছা করেই জানালার পাশে খাটে রেখেছেন, যাতে সন্দেহ পড়ে বাইরের লোকের উপর।' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু রাজীব হোসেন তো বাইরের লোকই।' তুষান ভাইয়া বলল, 'উহু! ঐখানেই সমস্যা, রাজীব হোসেন আসলে মোঃ রমজান হোসেন। তিনি রাজীব হোসেন ছদ্ম নামে লেখেন। আর চাচার শোবার ঘরের ছবিতে তিনি যে লোকটিকে দেখিয়েছেন তিনিই এই রাজীব হোসেন। আসলে সে রমজান হোসেন। আর তার বাড়িও রংপুর নয়। রংপুরের লোকেরা 'র' উচ্চারণ করতে গিয়ে ঠেকে যায়। তারা বলে, 'অংপুর'। তার বাড়ি এ এলাকার আশপাশেই। আমি যখন কাগজটা দেখতে চেয়েছিলাম তখন তিনি সেটা বাঁ হাতে নিয়ে আসেন। ছবিতেও সে কাগজটা; যেটা সম্ভবত তার ফুটবল দলের খেলোয়াড়ের নামের তালিকা সেটাও বাঁ হাতে। আর তিনি যেহেতু লেখক, সেহেতু তার নিজের বইয়ের পাতা থেকে ছিড়ে ঐ শব্দগুলো যোগাড় করা কঠিন নয়। তারপর ঐ রাতের ঘটনা, যেখানে মুখোশধারীর আক্রমণের ঘটনাটি ঘটল। তখন রাজীব হোসেন এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলেই চাচার চিৎকারে সাড়া দিতে পারেন নি। আর বিজলী চমকানোর ঘটনাটি একেবারে ভাওতাবাজি। এই কনকনে শীতের মধ্যে তো আর বিজলী চমকাবে না? ওটা ছিল টর্চের আলো। যেটা রাজীব হোসেন নিজেই নিজের মুখে ফেলেছিল। আর স্টেশনে পৌছে তিনি যেটা কেনেন সেটা ছিল একটি বেনসন.....' বাকিটা আমি চিৎকার করে বলি, 'সিগারেটের প্যাকেট।' 'সাব্বাশ' বলল তুষান ভাইয়া। 'তার পকেটটাও টর্চের জন্যই ঝুলছিল।'

পরদিন সকালে আমরা চাচার বাড়ি গেলাম। চাচা বললেন, 'কী গোয়েন্দা? রহস্যের জট ছাড়িয়েছে, নাকি আমাকে বলতে হবে?' তুষান ভাইয়া বলল, 'ছাড়িয়েছি, তবে রাজীব হোসেন কী লিখলেন সেটা বলবেন না?' চাচার উত্তর, 'না বললেই কী? তুমি তো বুঝেই ..... হা হা হা।'

আত্মখুন

আসিফ মাহমুদ
কলেজ নং : ৮৩৭৩
শ্রেণি : অষ্টম-ঘ (দিবা)

উপরে নীল আকাশে শঙ্খচিলটি ডানা মেলে উড়ছে। নিসর্গ তার ব্যাগ গুছাচ্ছে আর জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎই, নিসর্গ! কী হলো। আসো! স্কুলে যাবে না? আসছি মা। তাদের বাসার কাছেই স্কুল। ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে সে মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, মানুষ মারা গেলে কোথায় যায়?' আল্লাহর দেশে ছিল, আল্লাহর দেশেই চলে যায়।
'তাহলে ঐ বৃদ্ধ লোকটা .....'
কী! কী! কার কথা বলছ তুমি?
না মা কেউ নয়।

নিসর্গ স্কুলে গেল। ঘণ্টাখানেক পর ছুটি হল। বিদ্যালয় হতে বের হতেই দেখে আকাশে ঐ শঙ্খচিলটি ডানা মেলে উড়ছে। সে অনেকক্ষণ তার মায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে সিদ্ধান্ত নেয় এই নিস্তব্ধ পাথর শহরে সে একাই যাবে। সে লক্ষ্য করল শঙ্খচিলটাও তার সাথে আসছে। তার মোটা, ছোটো পায়ে সে বাড়ি পৌছে গেল। এসেই সে মা! মা! করে চিৎকার শুরু করল। যেন শত বছরের অভিযোগ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে পিছনের ঘরে গিয়েও দেখে কেউ নেই। তার বাড়ির ঠিক পাশেই তার খালার বাসা। সে তার খালার বাসায় গেল। খালার বাসায় সে যে দৃশ্য দেখল তা সেই দোযখের মতো; যার কথা মা বলেছিল। নিস্তব্ধ এলাকায় এই ছোট্ট শিশুর মৃদু দীর্ঘশ্বাস যেন আশপাশ কাঁপিয়ে দেয়। এই দীর্ঘশ্বাসের পেছনে আছে শত বছরের আর্তনাদ, তার মায়ের লাশ। সেদিন সে ঘুমাতে পারে নি। গভীর রাতে সে ছাদে ওঠে, কী ভেবে সে ছাদের রেলিংয়ে উঠতে চায়, আর সে আত্মহত্যা করে। পরে তদন্ত করতে এসে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান এক ছায়া এসে তাকে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। নিসর্গ এখন এক চামড়ার ফ্যাক্টরীতে কাজ করে।

মা- বাবার মৃত্যুর পর সে নিঃস্ব; একে তো কলুর বলদের মতো খাটুনি আবার মাইনেও কম। দুঃখে কষ্টে জীবন কাটে তার। সেদিনও ফ্যাক্টরি হতে বের হচ্ছিল। সে হঠাৎই আকাশে নীল শঙ্খচিলটাকে দেখে। এরপর প্রায় প্রতিদিনই সে নীল শঙ্খচিলটা দেখে। সে প্রতিদিনই লক্ষ্য করে একজন বৃদ্ধ

লোক তাকে ফলো করে। একদিন সে সরাসরি বৃদ্ধ লোকটিকে বলে, 'আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন?' 'আমি তোমাকে ফলো করছি না। আমি আর তুমি তো প্রতিবিম্বেরই মতো।'
আপনি কে?
'আমি কে? আমি তোমার প্রতিবিম্ব।'
'আপনি আজগুবি কথা না বলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'তুমি তোমার জীবন নিয়ে হতাশায় ছিলে, হতাশায় আছো, তাই না? তুমি ভাবছ এই জীবনের মানে কী, তাই না? এত কষ্ট নিচ্ছ কেন? শেষ করে দাও নিজেকে।' আপনি বলেছেন আমাকে আত্মহত্যা করতে? 'না না, শুধু নিজেকে শেষ করে দিতে। আমাকে স্পর্শ কর।'

নিসর্গ লোকটাকে স্পর্শ করল। এ যেন এক অসম্ভব আলোর ঝলকানি, মনে হচ্ছিল মহাবিশ্বের সকল তারা এক হয়ে গিয়েছে। নিসর্গ তাকে তার শৈশবকালে আবিষ্কার করল। তার এই দৃশ্য মনে আছে। মায়ের মৃত্যুর দিন সে ছাদে শঙ্খচিলটিকে খুঁজতে এসেছিল। তখনই বৃদ্ধ লোকটির চিৎকার, 'ধাক্কা দেও! ধাক্কা দেও!'

নিসর্গ নিজেকে ছাদ থেকে ফেলে দিল অর্থাৎ তার ছোট প্রতিবিম্বটাকে। এরপর নিসর্গ তার প্রতিবিম্ব যেটা তার অতীতকাল অর্থাৎ বাল্যকালের নিদর্শনসহ এই পৃথিবী থেকে অদৃশ্যহয়ে গেল। ঐ লোকটিও নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল, কারণ ঐ বৃদ্ধ লোকটি ছিল স্বয়ং নিসর্গ। এরপরেই আকাশের তিনটি নীল তারা একটি হয়ে গেল।

ছাত্রজীবন

মুঃ তানযীম সামদানী প্রত্যয়
কলেজ নং : ১৩৯০১
শ্রেণি : অষ্টম (প্রভাতী)

ছাত্রত্ব মানেই জীবনকে শৃঙ্খলার শিকলে আবদ্ধ করা নয় বরং জীবনটাকে নতুন করে শেখা, জানা ও চিনতে পারা। কিন্তু বর্তমানে অনেকের ধারণা, ছাত্রত্ব মানে শুধু একঘেয়ে পড়াশোনা। সারাদিন পড়ো পড়ো মনোভাব রয়েছে দেশের ৮৫% অভিভাবকের। পড়াশোনা মাঝে মাঝে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে হয়রানি ও বিরক্তিকর মনে হয়। ফলে তারা লোক দেখানো পড়াশুনা করে এবং পরবর্তীতে তারা এর ভুক্তভোগী হয়। কিছু শিক্ষকের বিভ্রান্ত ধারণা ও শিক্ষা প্রদানে একঘেয়েমি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাকে বিরক্তিকর করে তোলে। পড়ালেখাকে নিজের জন্য না করে লোক দেখানো ভাবে করে। বর্তমানে দেশে কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেটের প্রভাব বেড়ে চলেছে, ফলে বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার মান ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকরা কর্মাশিয়াল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লেখাপড়ার রীতি হয়ে পড়েছে গদবাঁধা। যদি একটি ক্লাস থ্রি-এর বাচ্চার কাঁধে ব্যাগভর্তি বই ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তা অধিকাংশ সময়ই শুধু পিঠেই থেকে যায়, মাথায় ঢোকে না। এখনকার পরিস্থিতিতে পড়ালেখার প্রতি শিক্ষার্থীদের চেয়ে অভিভাবকদের প্রতিযোগিতাই বেশি। অভিভাবকরা তার সন্তানকে কয়টি কোচিং-এ পড়াতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সব মিলিয়ে শিক্ষা হয় বোঝা। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। তাদের সময় থাকে না বিনোদনের। তারা শিক্ষাকে মনে করে অভিশাপ স্বরূপ। কিন্তু শিক্ষা বা পড়ালেখা আসলেই কী বোঝা বা অভিশাপ? না, কখনই না। শিক্ষা মানব জাতির মেরুদণ্ড, জাতি গঠনের প্রধান উপকরণ। একটি জাতিকে অগ্রসরের জন্য চাই সুশিক্ষা ও সুন্দর মনের শিক্ষা। কিন্তু আজ সেই পবিত্র কর্তব্যকে শিক্ষার্থীরা বোঝা স্বরূপ বয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের মনের দ্বিধা, শঙ্কা শুধু লেখাপড়াকে ঘিরেই। লেখাপড়া হতে হবে আনন্দের খোরাক। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'Education is the backbone of a nation', কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব হয়েছে। আমাদের সকলেরই কামনা, দেশ গড়তে শিক্ষার মাঝে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে। গদবাঁধা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। বেত্রাঘাত, বকা-ঝকা পরিহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বিনোদন ও খেলাধূলার সুযোগ দিতে হবে। সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ গড়তে পারলেই জাতি পাবে সুশিক্ষিত ও সুন্দর মননের ভবিষ্যৎ। যেহেতু, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাই এই ভবিষ্যৎ যেন বইয়ের ভারে নুয়ে না পড়ে, শিক্ষার নির্মল আলোয় আলোকিত হতে পারে তবেই আমরা উন্নতির শিখরে পৌছব ইনশা-আল্লাহ।

নাটিকা : ছাড়পত্র

মো: রাফি আলম
কলেজ নং : ৬৬১০
শ্রেণি : দশম-সি (দিবা)

চরিত্রসমূহ:

১। রফিক সাহেব
২। রফিক সাহেবের ছেলে সাজুয়া
৩। মুরুব্বি
৪। মেছো মফিজ
৫। শ্রেণি শিক্ষক
৬। প্রধান শিক্ষক

প্রথম দৃশ্য

[পরপর তিনবার চতুর্থ শ্রেণিতে ফেল করায় রফিক সাহেব তার ছেলের ছাড়পত্র নিতে স্কুলের দিকে রওনা হলেন। পথে এক মুরুব্বির সাথে দেখা।]

রফিক সাহেব : আস্সালামু আলাইকুম, চাচা।

মুরুব্বি : ওয়া আলাইকুমুস-সালাম। কী খবর রফিক মিয়া? আজকাল তো তোমার ছায়াও দেখা যায় না।

রফিক সাহেব : আর বলবেন না চাচা, ছেলেটাকে নিয়ে ঝুট-ঝামেলা পোহাতে পোহাতে শেষ হয়ে গেলাম।

মুরুব্বি : তা বাছা, কোথায় যাচ্ছ বলো দেখি?

রফিক সাহেব : এইতো চাচা একটু স্কুলের দিকে যাচ্ছি।

মুরুব্বি: বল কি বাছা! এই বয়সে স্কুলে যাচ্ছ, তাও আবার বই কলম ছাড়া। আফিম খেয়ে এসেছ নাকি?

[খিটখিটে মেজাজ, তার ওপর বুড়োর উদ্ভট কথাবার্তা। তবুও এসব হাসিমুখেই সহ্য করলেন রফিক সাহেব।]

রফিক সাহেব : না চাচা, আমার ছেলের স্কুলে যাচ্ছি।

মুরুব্বি : ও বুঝেছি! তার মানে তুমি আর তোমার ছোকরাটা একই স্কুলে পড়ছ। এই তো! হা! হা! হা!

রফিক সাহেব : না চাচা, আমার ছেলে ফেল করেছে; তাই ওর---।

মুরুব্বি : [রফিক সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে] তা বাবা, তুমি আর তোমার ছেলে যখন একই স্কুলে পড়ছ, তখন ছোকরাটাকে পরীক্ষার সময় একটু সাহায্য করলেই পারতে।

রফিক সাহেব : [মনে মনে-ইশ! এই বুড়োটাকে কীভাবে বুঝাই! এবার রেগে একটু জোরে বলল]

আরে চাচা, আমার ছেলেকে ঐ স্কুলে আর রাখব না, তাই ওর ছাড়পত্র আনতে যাচ্ছি।

মুরুব্বি : ছোকরাটা এই বয়সে মাত্র একবার ফেল করল তাতেই ওর ছাড়পত্র নিতে চললে; আর তুমি যে এখনো ওর সাথে পড়ছ তাহলে তুমি ক'বার ফেল করেছ, তা একবার গুনে দেখেছ? তাহলে ছোকরাটা একবার ফেল করলে দোষের কী?

রফিক সাহেব : চাচা, ও একবার নয়, তিন তিনবার ফেল করেছে।

মুরুব্বি : তাতে কী হয়েছে? তোমার চাইতে তো বহুগুণে কম! তবে তুমি মোটেও লজ্জা পেয়ো না। বাপ-ছেলে একসাথে পড়লে আবার লজ্জার কী আছে, বল দেখি। শিক্ষার কোনো বয়স নেই, তা তো সবাই জানে।

রফিক সাহেব : [মনে মনে-নাহ! এই বুড়োটাকে বোঝানো যাবে না, এর হাত থেকে রেহাই পেলেই হয়।]

[বিনয়ের সঙ্গে]

আমি তাহলে যাই চাচা?

মুরুব্বি : যাও, তবে কাজটা কিন্তু তুমি মোটেও ঠিক করছ না বাছা। [বুড়োর প্রস্থান]

[এমন সময় রফিক সাহেবের বন্ধু মেছো মফিজের প্রবেশ]

মফিজ : কীরে রফিক, এত সকালে প্যান্ট-ছাট লাগাইয়া কই যাস?

রফিক সাহেব : আর বলিস না দোস্ত। এই একটু স্কুলের দিকে যাই।

মফিজ : এই বয়সে স্কুলে যাস? মাথা ঠিক আছে তো তোর?

রফিক সাহেব : আরে না আমি তো---

মফিজ : [রফিক সাহেবকে থামিয়ে] হা! হা! হা! হা! দোস্ত, তুই না গ্যাজুয়েট? আবার এই বয়সে স্কুলে যাস ক্যান? থাক, আজ অন্তত তুই আমার নামের শব্দটা রশান করলি, সেটা আমি পারি নাই!

রফিক সাহেব : আহা! কোন ঝামেলায় পড়লাম। কি করে বুঝাই!

মফিজ : এই তুই আমারে কী বুঝাবি রে? আমি কী বুঝি না? বুঝতে বুঝতে মফিজ থেইক্যা 'বর অব বিলকিছ'(বিলকিস এর বর) হইয়া গেলাম গা। আর তুই আমারে বুঝ দিতে

আইছস। এই শোন, মাছ বেইচা, লোকেরে ঠগাইয়া এত বড় হইচি। আমরা সব বুঝি।

রফিক সাহেব : দেখ মফিজ, আমার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবি কিন্তু বলে দিলাম। সকাল থেকে মনটা এমনিতেই খারাপ।

মফিজ : কিল্লাইগা? এই দোস্ত, তোর মন খারাপ আবার কিল্লাইগা? আমারে খুইলা বল। আমি না তোর জিগরি দোস্ত! আরে রাগিস না, বল আমারে।

রফিক সাহেব: [বিরক্তির সাথে] উহ! তুইও না।

মফিজ : ও আচ্ছা, ঠিক আছে! ভদ্রভাবে কই। এই রফিক আমাকে বোলো, কী হয়েচে তোমার? আমাকে কুলে বোলো। এই যে বন্ধু, বলচনা কেন?

রফিক সাহেব : আমাকে এবার দয়া করে যেতে দে।

মফিজ : এই কিরে, কস না ক্যারে? আমারে দেইখ্যা কি তোর মফিজ মনে হইতাসে? আবার উল্টা যাইতে চাস? [কিছু না বলে হঠাৎই মফিজকে সরিয়ে দিয়ে খিটখিটে মেজাজ নিয়ে পুনরায় রফিক সাহেবের স্কুলের পথে রওয়ানা]

মফিজ : এই ব্যাটার হইসে কি! ----- যাই মাছ ধরতে হইব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রফিক সাহেবের স্কুলে প্রবেশ, তার ছেলের শ্রেণিশিক্ষকের সাথে ধাক্কা]

শ্রেণিশিক্ষক : এই ছেলে, দেখে চলতে পার না? আমাকে ধাক্কা মারা হচ্ছে? দাঁড়াও কালই তোমার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করছি।

রফিক সাহেব : কাল নয়, আজ, এক্ষুণি দিন। আর চশমাটা একটু উপরে পড়ুন। আমি ছেলে নয়, ছেলের বাবা।

শ্রেণিশিক্ষক : দুঃখিত! আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। এখানে ছেলেদের পড়ানো হয়, ছেলের বাবাদের নয়।

রফিক সাহেব : এই যে মশাই, ভদ্রভাবে কথা বলুন। একটা ছেলের কয়জন বাবা হয়? আর আমি তো পড়তে আসি নি, ছাড়পত্র নিতে এসেছি।

শ্রেণিশিক্ষক : আরে মশাই, আপনি তো এই স্কুলে ভর্তিই হন নি। তাহলে আপনাকে ছাড়পত্র দিই কী করে বলুন তো? **[রফিক সাহেব এবার রেগে গেলেন।]**

রফিক সাহেব : [চেঁচিয়ে] আমি আমার ছাড়পত্র চাচ্ছি নে, আমার ছেলের ছাড়পত্র চাচ্ছি।

শ্রেণিশিক্ষক : আমি খুবই দুঃখিত, মাফ করবেন। আসলে আমি রেকর্ড সংখ্যক ফেল্টু ছাত্রদের নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম তো, তাই সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

রফিক সাহেব : আপনার রেকর্ড থেকে আমার ফেল্টু ছেলেটার ছাড় দিয়ে দিন না।

শ্রেণিশিক্ষক : কি যে বলেন না! ঐ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের ছাত্রের জন্য আমি আমেরিকার এক ফেল্টু ছাত্রদের শ্রেণিশিক্ষককে টপকে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে শীর্ষস্থান পেয়েছি। আর ওটাকেই TC দিয়ে এত তাড়াতাড়ি রেকর্ডটা ভেঙ্গে ফেলব! এ হতেই পারে না!

রফিক সাহেব : তো মশাই, পাশ করা ছাত্রদের নিয়ে একবার রেকর্ড গড়ে দেখান না!

শ্রেণিশিক্ষক : তা তো আর সম্ভব নয়। কারণ এ স্কুলে কোনো ছাত্রই পাশ করতে পারে না, শুধুমাত্র ছাত্রীরাই পাশ করে! [এমন সময় রফিক সাহেবের ছেলে সাজুয়ার প্রবেশ]

সাজুয়া : আসসালামু আলাইকুম স্যার।

শ্রেণিশিক্ষক : ওয়া আলাই কুমুস-সালাম। এই তো, ভালো ছেলে।

রফিক সাহেব : [মনে মনে] ভালো না পোড়া কচু!

সাজুয়া : কী বাবা, তুমি এখানে ?

রফিক সাহেব: (রেগে) হ্যাঁ এসেছি। তোমার আর স্বচ্ছন্দে ফেল করা হচ্ছে না। তোমাকে আর আমি এখানে রাখছি না। ও! আমি তো ভুলেই গেছি! তোমার কাছে তো ফেলটাই পাশ। সবকিছু তো তুমি আবার উল্টা বোঝ!

শ্রেণিশিক্ষক : কিরে সাজু, কাল স্কুলে আসিস নি কেন?

সাজুয়া : আর বলবেন না স্যার, আমি আসলে স্কুলে আসতে চাই নি। তারপরও ভেবেছিলাম আপনাকে একটু দেখা দিয়ে যাই। কিন্তু------

শ্রেণিশিক্ষক : কিন্তু কী রে বজ্জাত?

সাজুয়া : পথে ঐ সঞ্জীবটা আমার সাথে বাজি লেগে গেল। আমি নাকি দিঘি থেকে পদ্ম তুলে আনতে পারব না। তাই কাজে নেমে পড়লাম, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলাম যে আমিও পারি।

রফিক সাহেব : খুব ভালো করেছ! স্কুল পালানো আর ফেল করা ছাড়া আর কিছু করে দেখাও না একবার।

সাজুয়া : উহুঁ! বাবা, তুমি চুপ করবে? কথা শেষ হয় নি তো! স্যার, বাবাকে একটু চুপ থাকতে বলুন না।

রফিক সাহেব : আচ্ছা বল, এই চুপ হলাম। ফেল করে আবার বড় বড় কথা।

সাজুয়া : আমি না স্যার, আজও স্কুলে অসতে চাই নি। কিন্তু এই যে আমার বাবাকে দেখছেন না? আমার বাবা ---।

শ্রেণিশিক্ষক : হ্যাঁ, তোর বাবা !

সাজুয়া : বাবাই তো আমাকে লাথি মেরে স্কুলে পাঠালো। আর কী বলল জানেন স্যার?

শ্রেণিশিক্ষক : কি বলল?

সাজুয়া : বলল, আজ থেকে নাকি আমার খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ। আচ্ছা স্যার, আপনিই বলুন তো আমি কি উনার বাবার খাই? আমি তো আমার বাবার খাই! তাহলে উনি আমাকে খেতে নিষেধ করার কে?

শ্রেণিশিক্ষক : কী মশাই, ছেলে তো ঠিকই বলেছে!

রফিক সাহেব : আপনি চুপ করুন! আর ওর ছাড়পত্রটা দিন আমাকে। আমি আর ওকে এক মুহূর্তও এখানে রাখতে চাই না।

সাজুয়া : এ মা! একবার বাড়ি থেকে বের করলে, এখন আবার আমাকে স্কুলে থেকেই তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছ? কি ষড়যন্ত্রই না করতে জান তুমি, বাবা! [শিক্ষককে নির্দেশ করে]

আপনিই বলুন স্যার, বাবাকে কি আমার ছাড়পত্র দেয়া যায়?

শ্রেণিশিক্ষক : একদমই না! মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ হয় না। কাজেই মশাই, আপনারও ছাড়পত্রের সাধ পূরণ হবে না।

রফিক সাহেব : ও বুঝেছি। তার মানে আপনি ছাড়পত্র দিতে রাজি নন।

শ্রেণিশিক্ষক : একদম ঠিক ধরেছেন!

রফিক সাহেব : তাহলে আমি প্রধান শিক্ষকের নিকটই যাচ্ছি। আপনি আপনার চাকরি বাঁচান। [সাজুকে নির্দেশকরে] এই তুই ক্লাসে যা।

শ্রেণিশিক্ষক : আরে মশাই শুনুন, হেডস্যারের রুমে ভুলেও যাবেন না। নয় তো আমার চাকরির আগে আপনার মাথাটা যাবে। [রফিক সাহেবের প্রস্থান]

সাজুয়া : [মনে মনে] বাবার মাথাটা গেছে এবার!

তৃতীয় দৃশ্য

[হেডমাস্টার পুরোনো ফাইলগুলো চেক করছেন। রফিক সাহেব উত্তেজিত চিত্তে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। হেডমাস্টার মশাই কানে কম শোনেন]

রফিক সাহেব : এই যে জনাব, ভিতরে আসব?

হেডমাস্টার : কে রে ? ভিতরে কাশতে চায়? আস্পর্ধা কার এত বেশি হল?

রফিক সাহেব : [জোরে] আজ্ঞে মশাই আমি মিঃ রফিক। কাশতে নয়, ভিতরে আসতে চাই।

হেডমাস্টার : দুঃখিত, দুঃখিত। আসুন, ভিতরে আসুন, তা মশাই, আপনি হাসতে চান সেটা আগে বলবেন না? আজকাল এরকম মানুষ কটা পাওয়া যায় যে কি না নিজে থেকে হাসতে চায়! চলুন দুজনে একসাথে হাসি! হা হা হা--

রফিক সাহেব : [মনে মনে] ওরে বাবা! এ যে দেখছি পাগলদের হেড! [ধমক দিয়ে] চুপ করুন। আর ঠিকমত কথা শুনুন আমার। তারপর না হয় হাসতে হাসতে তালতলা, চৌদ্দদলা বানিয়ে ফেলবেন, তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমি সাজুয়ার বাবা। এসেছি -----

হেডমাস্টার : [রফিক সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে] সারওয়ার! আগে বলবেন না যে আপনি ওর বাবা। আরে ও ই তো আমার স্কুলের সবচাইতে ভালো তরুণ শিক্ষক। কী নাম-যশ ওর! আপনি তো গর্বিত পিতা। তা মশাই, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে খুব কম বয়সেই বাবা হয়েছেন! ঠিক বলেছি না, অ্যাঁ? আসলে কি জানেন, আমি সব সময় ঠিক কথাই বলি। কিন্তু নন্টুর মা মানে আমার বউটা আজ পর্যন্ত আমাকে বুঝলই না।

রফিক সাহেব : [চেঁচিয়ে] আরে মশাই আমি সাজুর বাবা; কোন সারওয়ারের বাবা নই।

হেডমাস্টার : দুঃখিত, মাফ করবেন। আমি আসলে বুঝতে পারি নি। তা এত চেঁচিয়ে বলার কী ছিল? আস্তে বললেই তো পারতেন। আমি কী কানে কম শুনি নাকি?

রফিক সাহেব : মোটেও না, আপনি তো কানে অনেক বেশি শোনেন। আর সেইটাই হল মূল সমস্যা। আপনার মতো এত বেশি কেউ শুনতেই পারে না।

হেডমাস্টার : তা তো বটেই! কী বললেন?

রফিক সাহেব : না কিছু বলি নি। শুধু বলেছি যে আপনিই জগতের সেরা শ্রোতা। তবে এবার কান খাড়া করে শুনুন;

এবার বুঝতে পারছি যে পাগলা গারদে ছেলেকে ফেলে গেছি। তাতে তিন বার কেন, শতবার ফেল করাও মন্দ নয়। আমি আর এক মুহূর্তও ওকে এই স্কুলে রাখব না। এবার ওর ছাড়পত্রটা আমাকে দিন।

হেডমাস্টার : মালপত্র?

রফিক সাহেব: [মনে মনে] উঁহু, এখান থেকে কেটে পড়লেই বাঁচি।

[চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে, জোরে] ঘাট হয়েছে মশাই। আমার ছাড়পত্র, মালপত্র কিচ্ছু চাই না। আমি আসছি! এবার দয়া করে আমাকে ছাড় দিন।

হেডমাস্টার : [রফিক সাহেবের প্রস্থান কালে] মার দিব মানে? ----- আরে শুনুন, শুনুন তো -------।

অ্যাডভেঞ্চার ও একটি ভ্রমণকাহিনী

তাহজিদ তাসনিফ রিহাত
কলেজ নং : ১০৬৩৪
শ্রেণি : দশম-ঘ (প্রভাতী)

এই লেখাটা যখন লিখছি তখন সকাল দশটা। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। খুলনা থেকে ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনে নেমে আমরা প্রায় পৌনে নয়টার দিকে কলেজে এসে পৌঁছেছি। তারপর সবাই যার যার বাসায়। তিন দিন জাহাজে থাকার ফলে এখন যেখানেই যাই না কেন, মনে হয় জায়গাটা দুলছে। সৈয়দা খালেদা জাহান ম্যাডাম স্পোর্টস-এর সময় বলেছিলেন সুন্দরবন থেকে ফিরে আসার পর একটা ভ্রমণকাহিনী লিখতে। তাই কাগজ-কলম নিয়ে এই প্রচণ্ড দোলাদুলির মধ্যেই লিখতে শুরু করেছি। এ বছর সুন্দরবন যাওয়ার পরিকল্পনাটি করা হয় স্পোর্টস-এর সময়ে। আগেভাগেই জানা যাচ্ছিল, স্পোর্টস-এর পরে কলেজ চার দিন বন্ধ থাকবে। কিন্তু অনেক টিচারই গতবার সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। তাই এবার তারা এ ব্যাপারে আগ্রহী নন। কিন্তু যাঁরা যান নি তাঁরা, গতবার যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মতো ভ্রমণবিলাসী কয়েকটি পরিবার এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান সুবহানী স্যার এই ভ্রমণটির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। সুন্দরবনে আমরা ছিলাম তিন দিন দুই রাত। শ্বাপদসংকুল পৃথিবীর এই বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে কী ঘটেছিল এই তিনটি দিনে?

৩১ জানুয়ারি ২০১৪ শুক্রবার

স্পোর্টস এর সমাপনী অনুষ্ঠান শেষ করে যার যার ব্যাগপত্র ও লাগেজ নিয়ে আমরা ঠিক সন্ধ্যা ৬ টার সময়ে বাসে করে কমলাপুর রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রিন্সিপ্যাল স্যার ও তাঁর পরিবার বিমানবন্দর রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠবেন। ট্রেন ছেড়ে দিবে সন্ধ্যা ৭ টায়। তাই বাসে সবার মধ্যেই একটা দুশ্চিন্তা কাজ করছিল– ট্রেন যদি মিস করি, তখন কী হবে? খালেদুর রহমান স্যার স্টেশনে ফোন দিলেন। বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের মতো সবাই তাকিয়ে থাকল স্যারের দিকে। কখন রেজাল্ট দেয়া হবে! অবশেষে সবাই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেল। ট্রেন লেট করবে। সোয়া ৭ টার দিকে আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। ট্রেন ছাড়ল ঠিক ৮ টায়। সবার মধ্যেই বনে যাবার প্রবল আনন্দ! রাতের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে ঘুমিয়ে পড়লাম। সবার মতো আমার ঘুমও গাঢ় হল না। বনে যাচ্ছি তো!

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শনিবার

ভোর ৬ টার দিকে আমরা খুলনায় পৌঁছলাম। কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জাহাজের গাইড বাবুল সাহেব আমাদেরকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে নদীর মাঝে নোঙর করা জাহাজে নিয়ে গেলেন। সময় সকাল সোয়া ৭ টা। জাহাজটা নতুন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জাহাজের নিচতলায় প্রিন্সিপ্যাল স্যার, লতিফ স্যার, মঞ্জুরুল হক স্যার, মেসবাহ স্যার, নুরুন্নবী স্যার, রফিক স্যার, শাহাদাত স্যার, মৃধা স্যার, গণিতের রফিক স্যার, হাফিজ স্যার ও আমাদের কেবিন। এই তলার প্রতিটা কেবিনেই অ্যাটাস্ড বাথরুম আছে। কিন্তু বেসিন নেই ! তবু দ্বিতীয় তলার চেয়ে শীত

উল্লসিত শিশুরা

কম। পানি একটু ঘোলা। তবে খাবার পানি পরিষ্কার। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে মাস্টার ব্রিজ। এখান থেকেই জাহাজ চালানো হয়। এর পেছনে ২ টা করিডোরে প্রশান্ত স্যার, সুদর্শন স্যার, জোয়ার্দার স্যার, খালেদ স্যার, লোকমান স্যার, মিরাজ স্যার, সাইফুল স্যার, তালুকদার স্যার, আরিফ স্যার, রানী ম্যাডাম, ইশরাত ম্যাডাম ও নুরুন্নাহার ম্যাডামের কেবিন। মোট সদস্য ৬২ জন। এর মধ্যে ১০-১৫ জন ছোট ছোট বাচ্চা। এত বাচ্চা-কাচ্চা দেখে ভালোই লাগল। নিজেকে এখন সিনিয়র সিনিয়র মনে হচ্ছে। ছাদে উঠলাম, সেখানে সামিয়ানা টানিয়ে ডাইনিং রুম বানানো হয়েছে। সোয়া ৮ টার দিকে আমাদের ব্রেকফাস্ট এর জন্য ছাদে নিয়ে যাওয়া হল। প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস, সাথে গরম গরম খাবার, অন্যরকম অনুভূতি! খাবার পর নিজের চা নিজে বানাতে হবে। টেবিলে টি-ব্যাগ, কনডেন্স মিল্ক, গরম পানি, চিনি রাখা আছে। কয়েকজন স্যার এই সময় ভ্রমণ শেষে ঢাকা ফিরে যাওয়ার টিকিট কিনতে স্টেশনে গেলেন। তাঁরা ফিরে এলে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে শুরু হল সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। জাহাজের চালকের কাছ থেকে জানতে পারলাম- নদীটার নাম পশুর। আশেপাশের এলাকার নাম রূপসা। ধীরে ধীরে সূর্য তার আলোর ভাণ্ডার নিয়ে দেখা দিল। জাহাজ এখন হাড়বাড়িয়ার দিকে যাচ্ছে। ছাদে স্যার, ম্যাডাম ও আন্টিরা রোদ পোহাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে গানের একটা খেলা চলছে। স্যাররাই এগিয়ে! দুপুর ১ টার দিকে কী মনে করে নদীর ঘোলা পানি দিয়েই গোসল করে ফেললাম।

যতক্ষণ আমাদের কোথাও নামানো না হচ্ছে, ততক্ষণ করিডোরে হাঁটাহাঁটি আর গল্পগুজব ছাড়া সেরকম কোনো কাজ নেই। পিচ্চিরা এখন মাস্টার ব্রিজ এর সামনে সোফার উপরে উঠে লাফালাফি করছে। ওনাদের কয়েকটা ছবি তুললাম। দুপুর ২ টায় লাঞ্চ দেয়া হল। অনেক আইটেম! সবারই প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। এজন্য খাওয়ার পরে কারো প্লেটেই অবশিষ্ট কিছু ছিল না।

বিকাল ৪ টার দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল হাড়বাড়িয়ায়। নৌকা থেকে নেমে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কাঠের ব্রিজ পাওয়া গেল। সামনে একজন গানম্যান, পেছনে আরেকজন। মাঝখানে আমরা ভয়ে ভয়ে এক লাইনে হাঁটছি। দুইপাশেই জঙ্গল। গাছপালায় গা ঘেঁষে ঘেঁষে হাত দিয়ে পাতা সরিয়ে বারবার নিচের দিকে তাকাচ্ছিলাম। সাপ-টাপ থাকতে পারে। হঠাৎ মনে হল গাছে একটা সাপ ঝুলছে। চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেলাম। পরে দেখলাম- নাহ! সাপ না। গাছের একটা চিকন বাঁকানো ডালকে সাপ মনে হচ্ছিল। তবে সবাই সবসময় মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। একটু ভয়, একটু আনন্দ, এই সবকিছু নিয়েই সুন্দরবন। এখানে যে কোনো সময়ে যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে। এই কথাটা সবসময় ভ্রমণকারীদের মাথায় রাখতে হবে। তাহলে বিপদের সময় কেউ ধৈর্য হারাবে না, ঠান্ডা মাথায় সবকিছু মোকাবেলা করতে পারবে। এই উপদেশটা আবার বিপুল ভাইয়ের। সময়মতো ওনার কথাও আসবে। ভয়টা একটু কেটে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে চারদিকে তাকাতে শুরু করলাম। স্বাভাবিকভাবেই যা দেখতে পাওয়ার কথা তাই দেখা গেল- কেওড়া, সিংড়া, আমুর, সুন্দরী, পশুর, বাইনসহ আরো অনেক গাছ। সাথে ঘন জঙ্গল। মাটির ওপরে কাদার মধ্যে অনেক শ্বাসমূল। লবণাক্ত পানিতে যখন সবকিছু তলিয়ে যায়, তখন উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য এগুলো বায়ুকুঠুরি হিসেবে কাজ করে। বিখ্যাত গাছগুলোর সাথে সবাই ছবি তুলল। এবার জাহাজে ফেরার পালা। হঠাৎ কে যেন খেয়াল করল- কেউ একজন আসে নি। আমরা ততক্ষণে জাহাজে উঠে গিয়েছি। একজন স্যার পিছে পড়ে গিয়েছেন। তাকে খোঁজার জন্য সাথে সাথে গানম্যান, গাইড, মেসবাহ স্যার, নুরুন্নবী স্যার আবার বনের ভেতর ঢুকলেন। চারদিক দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। শীতও পড়তে শুরু করেছে। আমাদেরকে এখনই জাহাজে ফিরতে হবে। কারণ এই সময়ে বাঘের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি। হঠাৎ পাখিগুলো অস্বাভাবিকভাবে ডাকতে শুরু করল। বনের ভেতরে এক ধরনের হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেলাম। গানম্যান আর ঝুঁকি নিলেন না। ফায়ার করলেন। ইংলিশ মুভির হাজার হাজার অ্যাকশন দেখার পরও বাস্তবে এক পশলা গুলির শব্দ শুনেই ভয়ে চমকে গিয়েছিলাম! এদিকে সবার অবস্থা খুবই খারাপ। এই

জাহাজের ছাদে আড্ডারত স্যার-ম্যাডাম-আন্টিরা

শীতের মধ্যেও ঘেমে টেমে শেষ! এটাই স্বাভাবিক। এখানে কেউ তো আর সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারিস্ট নয়। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল- আমাদের সাথে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। হঠাৎ একটা বাঘ বের হয়ে আসলে কিছুই করার থাকবে না। আবার বাঘের গায়ে গুলি করাও নিষিদ্ধ! অবশেষে স্যারকে পাওয়া গেল। আমরা দ্রুত জাহাজে ফিরে এলাম। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচল। সুন্দরবনের সূর্যাস্ত নাকি খুব সুন্দর। দেখলাম কথাটা সত্যি। সূর্যাস্তের অসাধারণ কয়েকটা ছবি তুললাম। এরপর রাত ৯ টার দিকে ডিনার দেয়া হল। কনকনে শীতের মধ্যে ছাদে না থেকে সবাই খাবার খেয়ে যার যার কেবিনে চলে গেলাম।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রবিবার

ভোর সাড়ে ৫ টায় ঘুম ভেঙে গেল। রাতে ঘুমানোর সময় মাথায় অনেক উদ্ভট চিন্তা কাজ করছিল- যদি রাতে জলদস্যু আক্রমণ করে, যদি জাহাজ ডুবে যায়, যদি জাহাজ ভুল পথে চলে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে? তবে রাতের অন্ধকারের মধ্যে জাহাজ কীভাবে ঠিক পথে গেল, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার! সকাল ৭ টায় চা, বিস্কিট খেয়ে আমরা সুন্দরবনের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এলাকা হিরণ পয়েন্টে গেলাম। নামটা মনে হয় আগে 'হরিণ পয়েন্ট' ছিল। কালের বিবর্তনে 'হিরণ পয়েন্ট' হয়ে গিয়েছে! আমরা যে পথটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তার আশেপাশে এমন গাছ-গাছালি আর জঙ্গল আছে যে পুরো পথটাই শিকড় দিয়ে ঢেকে গেছে। ঠিকমতো হাঁটাও যাচ্ছে না। কবি-সাহিত্যিকের ভাষায় যদি বর্ণনা করি, তাহলে এমন হবে- কাঁটা আর শিকড়ে পরিপূর্ণ সরু পথে বাঘের ভয়ে ভীত একদল ভ্রমণবিলাসীর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাওয়া। সবার হাঁটার গতি তো আর এক নয়। এজন্য মাঝে মাঝেই লাইনের মধ্যে গ্যাপ হয়ে যাচ্ছিল। এটা দেখে মেসবাহ স্যার কঠোর হুঁশিয়ারি জারি করলেন। সবাই ভয়ে বারবার ডানে-বামে তাকাচ্ছে। যারা অতি উৎসাহী তারা মাঝে মাঝে লাইন ব্রেক করে ছবি তুলছে। হঠাৎ একদল হরিণ দেখা গেল। হরিণ! হরিণ! সবার চোখ চকচক করছে। এখন একটা বাঘ দেখলে তাদের জীবন নাকি সার্থক হয়ে যাবে! এটা শুনে গানম্যান একটা ঘটনা বললেন- গতবছর এক সাংবাদিক তার ফ্যামিলি নিয়ে হিরণপয়েন্টে বেড়াতে এসেছিল। তারা নাকি বাঘ দেখবে, হরিণ দেখবে এরকম উচ্চাভিলাষী কথাবার্তা বলছিল। তখন হঠাৎ করেই একটা বাঘ তাদের সামনে এসে পড়ল। এটা দেখে তার মেয়ে ওইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। হতভম্ব ভীত সাংবাদিক ও তার স্ত্রী পেছনের দিকে দৌড় দিলেন। সাথে সাথে গানম্যান ফায়ার করলেন। বাঘ সরে পড়ল। মেয়েটার কিছুই হল না! এই ঘটনা শোনার পর আর কোনো কথাবার্তা নেই। সবাই চুপচাপ সামনে যাচ্ছে। একটা টাওয়ার চোখে পড়ল। এটাকে নাকি বাঘ দেখার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বলে কী! আবার একসাথে নাকি এতে ৬ জনের বেশি ওঠাও যাবে না। আগেই কানে ধরেছি- বাঘ দেখতে চাই না, আগে জীবনটা বাঁচাই। তাড়াতাড়ি নৌকায় করে জাহাজে ফিরে এলাম। এখানে নাকি বাঘের একটা অভয়ারণ্য আছে। নাম 'নীলকমল।' আগে জানলে এখানে নামতামই না। বেলা বেশি হবার কারণে দ্বিতীয় গ্রুপের আর হিরণপয়েন্টে নামা হল না। তারা বেশ মন খারাপ করল। কিন্তু তারা আমাদের চেয়েও বেশি সৌভাগ্যবান। এখানে এসে যে বাঘ দেখবে, সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

দুপুর ১২ টার দিকে আমরা নামলাম দুবলার চরে। এখানে অবশ্য বেশি বন-জঙ্গল নেই। একটু স্বস্তি পাওয়া গেল। চারদিকে শুধু শুঁটকির গন্ধ। এখানে একটা সী-বিচ আছে। যাঁরা নিজেদেরকে সাহসী বলে দাবি করেন, তাঁরা এই ঠান্ডা পানির মধ্যে গোসল করতে গেলেন। আমিও এই দলের অন্তর্ভুক্ত! হঠাৎ পানির স্রোতের সাথে অক্টোপাসের মতো একটা জিনিস তীরে ভেসে আসল। এটা দেখে আর পানিতে থাকা সম্ভব হল না। কিছুক্ষণ পরে এক গ্রুপ জাহাজে ফিরে গেল। দ্বিতীয় গ্রুপে স্যাররা শুঁটকি কিনে বস্তাবন্দি করে জাহাজে নিয়ে আসলেন। শুঁটকি ভেদে কেজি মাত্র ১০০/২০০/২৫০ টাকা। এই শুঁটকি কেনার জন্য কয়েকজন শুঁটকিপ্রেমী স্যার নাকি বিচেই যান নি! দুপুর ১ টার দিকে জাহাজ কটকার দিকে রওনা দেয়। বিকাল ৩ টার সময় আমরা লাঞ্চ করলাম। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। এখন যে ঘটনাটা বর্ণনা করব, তা আমাদের পুরো ভ্রমণটাকেই অন্যরকম করে দিয়েছিল, আর এক একজনকে বানিয়ে

সুন্দরবনের করমজলে লেখক

দিয়েছিল সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারিস্ট! বিকাল সাড়ে ৪ টা। একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শুরু– জাহাজটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। এটাতো হওয়ার কথা না। কটকায় এখনো তো আমরা পৌঁছাই নি। সবার মধ্যেই এক ধরনের চাপা আতঙ্ক কাজ করছে। খবর নিয়ে জানলাম- ভাটার কারণে জাহাজ আর সামনের দিকে যেতে পারবে না। আবার জোয়ার আসতে আসতে নাকি রাত ৮ টা পার হয়ে যাবে। বাচ্চারা কান্নাকাটি শুরু করল। তারা নাকি আর বাসায় যেতে পারবে না!

বিকাল ৪ টা ৫০। জাহাজের গাইড ও লোকজনের পরামর্শে এক নৌকায় ৬২ জনকে ওঠানো হল। অনেকেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা বলল- ২ গ্রুপ করে নিলে অনেক সময় লাগবে। সময়ই যদি লাগে, তাহলে যাওয়ার দরকারটা কী? নৌকা ধীরে ধীরে যাচ্ছে। হঠাৎ সাইফুল স্যার টের পেলেন- ইঞ্জিন ঘরে পানি উঠছে। খবরটা তখন অনেকেই জানে না। নিঃশব্দে বালতি দিয়ে পানি ফেলা হচ্ছে। যারা দেখল তারা ভাবল- ঘটনা তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু এটা আসলেই গুরুতর ছিল। নৌকার ফুটাটা আরও বড় হলে বালতি দিয়ে পানি ফেলার সময় ও সুযোগ কোনাটাই থাকত না।

সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টা। সূর্য ডুবছে। আমরা প্রায় অর্ধেক পথ গিয়েছি। প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস। বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। মায়েরা আতঙ্কে অস্থির। কয়েকজন স্যার এখনও নিয়মিত বালতি দিয়ে পানি কমাচ্ছেন। নৌকায় পানি ওঠার ঘটনাটা যদি সবাই জানত, আর আতঙ্কে অস্থির হয়ে যদি তারা এখন যে ঘটনাটা বর্ণনা করব, তা আমাদের পুরো দাঁড়িয়ে যেত বা নড়াচড়া করত কিংবা নৌকার তলা যদি ফেটে যেত তাহলে নিঃসন্দেহে সলিল সমাধি। যারা ব্যাপারটা জানত, তারা নাকি এরকমই ধরে নিয়েছিল।

সন্ধ্যা ৫ টা ৪৫। সূর্য ডুবে গেছে। কটকায় যেতে আরও ২০ মিনিট লাগবে। কিন্তু রাতে বনে যাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আবার ফিরে যাবারও উপায় নেই। একদিকে নৌকা ডুবতে বসেছে। অন্যদিকে জোয়ার শুরু না হলে জাহাজ আসতে পারবে না। একেই মনে হয় বলে- 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ'। নাহ ভুল বললাম–'নৌকায় জল, জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ।'

সন্ধ্যা ৬ টা ১০। আমরা অবশেষে কটকায় পৌঁছলাম। কিন্তু এখানে আবার আরেক বিপদ। কটকায় ওঠার ডেক আর সিঁড়ি দুইটাই ভেঙ্গে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে সবাই কাদার মধ্যে নামল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় বনটাকে অন্যরকম লাগছে। এই রোমাঞ্চকর পরিবেশে সবাই ভীত, আতঙ্কিত। কটকা খুবই ভয়ঙ্কর জায়গা। গতবার এই জায়গায় আমরা বাঘের গর্জন শুনেছিলাম। এটা অন্যরা জানলে তাদের কী অবস্থা হত, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। গানম্যানের পেছনে পেছনে এসে আমরা ফরেস্ট অফিসে আশ্রয় নিলাম। জায়গাটা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। এক রুমে সবাই চাপাচাপি করে বসে আছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন–জাহাজ কখন আসবে?

রাত সাড়ে ৮ টা। অবশেষে সুসংবাদ পাওয়া গেল। জাহাজ চলে এসেছে। জেএসসির বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েও এত খুশি হই নি। তাড়াতাড়ি সবাইকে জাহাজে ওঠানো হল। আমরা একটা অনাগত বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। অনেকেই নাকি এসে দুই রাকাত নফল নামায পড়েছিলেন। ঘটনাটা পড়ে যদি কারও মনে হয়-এটা কোনো ব্যাপার! তাহলে তাদেরকে আমি প্রকৃত সিচুয়েশনটা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি!

রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আমরা ডিনার করলাম। এরপরেই একটা র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হল। এতে সবাই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যারা প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁরা হলেন: ১ম পুরস্কার- নুরুন্নাহার ম্যাডাম, ২য় পুরস্কার- রফিক স্যার, ৩য় পুরস্কার-মেসবাহ স্যার। আর সবার জন্যই ছিল সান্ত্বনা পুরস্কার।

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সোমবার

গতকাল সবাই অনেক ক্লান্ত ছিল। তাই সবার ঘুম ভাঙল একটু দেরি করে। সকাল ৯ টায় ব্রেকফাস্ট করার সময় হঠাৎ তীরে অনেক বানর দেখা গেল। জাহাজটা তীরেই ছিল। খাওয়া বাদ দিয়ে দৌড় দিয়ে কেবিন থেকে ক্যামেরা নিয়ে আসলাম। এর পরেই শুরু হল 'বানর ফটোসেশন'। সবাই ছাদ থেকে ছোট ছোট পরোটার টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছিল। এর মধ্যে খেয়াল করলাম- পরোটার টুকরোয় কাদা লেগে যাওয়ায় একটা বানর সেটা পানিতে ধুয়ে খেল। ভদ্র শ্রেণির বানর তো! সকাল সাড়ে ৯ টায় আমরা গেলাম আমাদের সর্বশেষ স্পট করমজলে। প্রথমে কিছুদূর মাটির রাস্তা, তারপরে কাঠের ব্রিজ, আবার রাস্তা শুরু হল। দুইপাশেই বন। ব্রিজ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার পাশ দিয়ে একটা বানর মানুষের মত হেঁটে গেল। এই জায়গাটা ছবি তোলার জন্য পারফেক্ট। প্রিন্সিপ্যাল স্যার সহ সবাই এখানে অনেক ছবি তুললেন। হঠাৎ সবাই খেয়াল করলাম- নদীর আরেক তীরে একটা কুমির শুয়ে আছে। সর্বোচ্চ জুম করে খুব কাছ থেকে ছবিটা তোলার চেষ্টা করলাম। দুপুর সাড়ে ১২ টার

দিকে আমরা জাহাজে ফিরে এলাম। দুপুরে খাওয়ার পর একটা ছোট অনুষ্ঠান হল। এরপর প্রিন্সিপ্যাল স্যার সবার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললেন। বিকাল সোয়া ৩ টার দিকে আমরা খুলনায় পৌঁছলাম।

সন্ধ্যা পৌনে ৭ টার দিকে জাহাজ থেকে বিদায় নিয়ে সবাই স্টেশনের দিকে গেলাম। হঠাৎ করেই বিপুল ভাইয়ের সাথে দেখা। তিনি গতবার সুন্দরবন ভ্রমণে আমদের গাইড ছিলেন। অসম্ভব সাহসী একজন মানুষ তিনি এবং একজন অসাধারণ গাইড। তাঁর স্বাস্থ্য দেখলে বাঘও ভয় পাবে। যাই হোক, রাত সোয়া ৯ টার দিকে ট্রেন ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। এর পরের ঘটনা জানতে হলে পাঠকদের আবার প্রথম থেকে পড়তে হবে।

আরো অনেক কিছুই লিখতে চেয়েছিলাম। স্থান ও সময় স্বল্পতার কারণে সম্ভব হল না। আম্মু আবারো শুঁটকি কেনার জন্য দুবলার চরে যেতে চাচ্ছে। আমাদের ভ্রমণটা বড় কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়েছে, এজন্য মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। এর পরের ভ্রমণটা নাকি দেশের বাইরে হবে। প্রিন্সিপ্যাল স্যারের কাছ থেকে সেরকমই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। সবাই অপেক্ষা করছে সেই দিনের। আর আমিও অপেক্ষা করছি আরো একটা ভ্রমণকাহিনী লেখার জন্য...

একাত্তরের মাছ

এইচ এম রহমান আখিয়ার
কলেজ নং : ১০৭৫৫
শ্রেণি : দশম-এফ (প্রভাতী)

সেই অমাবস্যার কালো রাত। আমরা ক্ষুধার্ত পরিবারের খাদ্য সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরলাম মাত্র। আমি, তোর দাদি ও তোর বাবা। বাড়ি ছিল তখন বুড়িগঙ্গার ঘাটে। তখন বোধ করি রাত ১০ টা বাজে। এমনই সময় হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ। ঘাট থেকে সরে গিয়ে, নদীর মাঝখানে গেলাম। দেখলাম আমার প্রতিবেশী ভাইয়েরাও সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে দেখছিলাম, একজন ভয়ঙ্কর চেহারাধারী লোকের নির্দেশে ১০-১৫টি হাতির মতো যানবাহন, যার সামনে শুঁড়ের মতো কিছু ছিল, তা দিয়ে বিকট আওয়াজ করে গুলি ছুঁড়ছে এদেশের সাধারণ নিরীহ মানুষের ওপর। কিছু লোক আবার বন্দুক হাতে গুলি চালাচ্ছিল। দেখলাম, রাস্তা দিয়ে লোকেরা তাদের পরিবার নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। দেখলাম একটা লোক শুধু ছিল, যে ভয়ে পালিয়ে যায় নি। অবশেষে সেও তার রক্ত মাখা দেহ নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাঠ-ঘাট রক্ত ও লাশ দিয়ে আচ্ছন্ন। তোর বাবা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠল। এমনকি থরথর করে কাঁপছিল পর্যন্ত। ওকে বললাম, এই রক্ত আমিও ছোট থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু এই রকম নয়। তখন বাঙালিরা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল বলে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। তোর বাবা জিজ্ঞেস করল, বাবা তখন কত সাল ছিল? আমি বললাম হয়তো ১৯৫২ সাল। এই বিষয়ে যতই বলতে লাগলাম, বুঝলাম ততই ও ভয় পাচ্ছে। এই জন্য এই কথা সেখানেই থামিয়ে দিলাম। ওকে শান্ত হতে বললাম। ওকে হাসানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ওকে হাসালেই কি আর পরিস্থিতি সামলে যায়? তখনই, হঠাৎ করে সামনেরই এক কারখানায় আগুন লেগে তা জ্বলে উঠল। ঢাকার সেই নিরিবিলি পরিবেশ কিছুক্ষণেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দেখলাম, লোকগুলো আমাদের দিকেও গুলি চালাচ্ছিল। দুই একজনের গায়ে গুলি লাগল, কিন্তু আমাদের কিছুই হয় নি। তখন আমাদের মধ্যে ছোটাছুটির প্রবণতা জাগে। আমি তোর বাবার হাত ধরে ছুটছিলাম, আর পাশে ছিল তোর দাদি। আমরা ছুটতে ছুটতে ঢাকার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মাটির নিচের একটি নালা দিয়ে একটি ছোট হ্রদে ঢুকে পড়লাম। ধারে যেতেই দেখি, আমাদের সামনেই কিছু সৈন্য বঙ্গবন্ধুকে আটক করেছে। মনে করলাম, তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে, কিন্তু না; বরং তারা তাকে জিপে তুলে কোথায় যে চলে গেল তার কোনো ইয়ত্তা খুঁজে পাওয়া গেল না। সে রাতে আমাদের ঘুম আর হয় নি। সকালের সূর্য উঠতেই আমরা সেই নালা ধরে আগানোর খানিক পরে শুনতে পারলাম একটি ছোট দোকানের রেডিওতে বলছিল:

গতকাল রাতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও বরিশালে পাকবাহিনী নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে বাংলাকে পঙ্গু করে দেওয়া। এছাড়া গতকাল শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করে নিয়ে পাকিস্তানে জেলবন্দী করেছে। তিনি যাওয়ার আগে রেখে গেছেন তার শেষ বাণী, 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এগুলো শুনে বুঝলাম দেশের অবস্থা ভালো নয়, যুদ্ধ হবে। এজন্য আমরা কয়েকজন আলোচনা করছিলাম। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে আমরা

সবাই আমাদের সন্তানদের একস্থানে গচ্ছিত রেখে দেশের প্রতিটি কোণে অভিযান চালাব। এতে হয়ত আমরা পাক বাহিনীর বেশি ক্ষতি করতে পারব না, তবুও আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব। আমরা আমাদের সন্তানদের সেই বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের হ্রদে রেখে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গঙ্গা ধরে ভয়ে প্রতিবেশী দেশে চলে গেল। আমরা কয়েকজন মিলে একত্রে একটি বৈঠকে বসলাম। তার পাশাপাশি আমাদের মধ্যে নেতাও নির্বাচিত হল। আর সে হল তোরই বন্ধুর দাদা। তার নির্দেশেই আমরা বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাই। প্রথমেই আমরা নিজেদের মৎস্যদলকে ১১টি ভাগে ভাগ করি। প্রতিটি দলে ১ জন করে কমান্ডার ও ৫০ জন করে সদস্য ছিল। আমাদের মধ্যে সবই ছিল, ছিল না শুধু কৌশল। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে বিদেশে অর্থাৎ ভারতে যাই। সেখানে বড় বড় উচ্চপদস্থ সেনাদের নিকট থেকে আমরা প্রশিক্ষণ পাই। এভাবেই প্রায় ২ মাস প্রশিক্ষণের পর আমরা যখন দেশে আসি তখন আমরা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হই। কারণ দেশে আসার পরে আমরা দেখতে পাই, আমাদেরই ভাইয়েরা অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে পরে আছে। সীমান্তে প্রচুর লাশ। তখন আমরা চিন্তা করছিলাম কে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে? কে? কে?

তখনই আমাদের মনে পড়ল যে আমরা আমাদের সন্তানদের যে স্থানে রেখে গেছি, সে স্থানেও কি এমনটাই আমরা দেখতে পাব? এই কথা চিন্তা করেই অনেকের চোখে জল এসে পড়ল। এরপর আমরা আমাদের সন্তানদের স্থানে যাওয়ার পথেও অনেক গোলাগুলির শব্দ শুনছিলাম। সেখানে দেখছিলাম, সারি সারি মাছের লাশ পড়ে আছে এবড়ো থেবড়ো ভাবে। সে স্থানে অর্থাৎ আমাদের সন্তানদের যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে যেতে লেগেছিল প্রায় ২ দিন। আমরা যখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছে হ্রদে গিয়ে উঠি তখন আমরা কেবল চোখের জলই ফেলতে সক্ষম হই। কারণ আমাদের সন্তান ও স্ত্রীর মধ্যে কেবল ৫ কি ৬ জনই বেঁচে ছিল। তার মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে তোর বাবা বেঁচে থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তোর দাদি মারা যায়। কিন্তু তার লাশ আমি কখনোই আর খুঁজে পাই নি। তোর বাবার কাছে শুনি যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে শান্তি কমিটি গঠন করেছে, যারা কিনা এই দেশের মন্দাবস্থায় সুযোগ করে নিয়েছে। আর তাদের মধ্যে কয়েকজন তোর দাদির মৃত্যুর কারণ। জুন মাসের শেষের দিকে আমরা আমাদের প্রথম অভিযান চালাই, টাঙ্গাইলে।

২৯ জুন, রাতের অন্ধকারে আমরা টাঙ্গাইলের পাক বাহিনীর ঘাঁটির নিকট গিয়ে উঠলাম। দেখি ঘাটেই তিনজন পাকসেনা দাঁড়িয়ে টহল দিচ্ছে আর গল্প করছে। পরনে হলুদ পোশাক। এক হাতে একটি টর্চলাইট ও আরেক হাতে একটি বন্দুক। তখন রাত ১১টা। একদল মুক্তিসেনা এই অভিযান সফল করার উদ্দেশ্যে ঘাটের পিছনের রাস্তা দিয়ে আক্রমণ করার জন্য অবস্থান নেয়। তারা ধীরে ধীরে আগাচ্ছিল। একসময় তাদের মধ্যে একজনের অসাবধানতার জন্য পাক হানাদাররা সন্দেহ করল এবং সে রাস্তার দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমরা তখন ভাবলাম এই মনে হয় তারা ধরা পড়ল। আমাদের মধ্যে একজন সিদ্ধান্ত নিল, যে করেই হোক তাদের মনোযোগ সরাতে হবে এবং এ জন্য সবাই তখনই পানির মধ্যে কাতরাতে শুরু করলাম, বিকট আওয়াজ করলাম। এতে পাকবাহিনীর নজর পড়ে পানিতে এবং তারা সেখানে অকাতরে গুলি করতে শুরু করল। আমাদের দুই সঙ্গীর দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল এবং তারা মারা গেল। এই সুযোগে মুক্তিবাহিনীর সেনারা হানাদারদের ওপর অতর্কিতে গোলবর্ষণ করল। এতে সেনারা সেখানেই ঢলে পড়ল এবং আমাদের দুই সঙ্গীর জীবনের বিনিময়ে মুক্তিসেনারা সেই ঘাঁটিটি নিজেদের করায়ত্বে আনে। এভাবেই আমরা প্রথম অভিযানে সফল হই দুইটি প্রাণের বিনিময়ে। এভাবে আমাদের অভিযান চলতে থাকে, দেশের সকল প্রান্তে। এতে আমাদের মধ্যে ১৫০ জন মারা যায়। আমরা আমাদের চেষ্টা দেশের স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চালাই। এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা আমাদের সন্তানদের নিকট গেলাম, সেই বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের নালায়। কিন্তু সেখানে যেতেই আমাদের আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ বিষণ্ন-বিমর্ষ হয়ে গেল। সেখানে দেখি আমাদের সন্তানদের কারও কারও লাশ পড়ে আছে এখানে ওখানে। কিন্তু তোর বাবা ও তার ৪-৫ সঙ্গী সেখানে ছিল না। আমরা ৪-৫ মাস তাদের বহু খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু কিছুতেই তাদেরকে খুঁজে পাই নি।

প্রায় ১০ বছর পর একদিন শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে আমার ও তোর বাবার আকস্মিক ভাবে দেখা হয়। আমরা খানিকটা সময় পরবর্তী সময়ের গল্প করি। আমি সেদিন তোর বাবাকে পাওয়ার কোনো আশাই করি নি। সে দিনটি যেন আমার কাছে স্বাধীনতার অর্জনের চেয়েও বেশি আনন্দময় ছিল। আর এরই ৩২ বছর পর আজ সেই স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা পুনরাবৃত্তি ঘটল, আজকের এই ১৬ই ডিসেম্বরের দিনে। আমাদের দেশের এখন যেই অবস্থা: হয়তো তোরও কোনো না কোনো আন্দোলনের, মুক্তিসংগ্রামের মুখোমুখি হতে হবে। মনে রাখিস তোরা, তোদেরও মুখোমুখি হতে হবে '৫২ ও '৭১ এর মতো বিভীষিকাময় কালের।

গোলক ধাঁধায় রহিনু পড়ে

মোঃ রায়হানুর রহমান
কলেজ নং : ৮২৫৬
শ্রেণি : একাদশ-সি (দিবা)

ঢাকার এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নুসরাত জাহান হীরা। মেডিকেল কলেজের ব্যস্ততম মুহূর্তগুলো পাশ কাটিয়ে সবার সাথে ঈদের আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে দুই বোন স্বর্ণা ও লাকিকে নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামের সেই মজার দিনগুলোকে পেছনে ফেলে কর্মব্যস্ত ঢাকায় ফিরে যেতে মন চাইছিল না। কত মজার দিনগুলোই না কাটিয়েছিলেন গ্রামে! তিন বোন মিলে একসাথে হাসি, আড্ডা, খুনসুটিতে পার করা দিনগুলো যেন তাকে ডেকে বলছে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে। পরমুহূর্তেই কালবিলম্বের এই চিন্তাটাকে প্রবলভাবে শাসিয়ে দিলেন। না, এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটা সেকেন্ড তার কাছে মহামূল্যবান। আর তাই তো অতিরিক্ত যাত্রী থাকা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়েই সে আজ লঞ্চে উঠেছে। পরে লঞ্চের জন্য দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট করার চেয়ে একটু ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়াটাই তার কাছে সঠিক পদক্ষেপ মনে হল। একটা সেকেন্ডও সে নষ্ট করতে চায় না।

হীরাদের এই লঞ্চেরই যাত্রী শামীম। মাওয়া ঘাটে তার অপেক্ষারত স্ত্রী হাবীবাকে নিয়ে সে আবার ফিরবে গ্রামে। এতদিনের অভিমান ভেঙ্গে তার বাবা-মা আজ তাদের বিয়ে মেনে নিয়েছে। শামীমকে বলেছে স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে যেতে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা ঘটা করে পালন করবে। শামীমের যেন আর তর সইছে না। অনেকটা খুশির তোড়েই স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়েই উঠে পড়েছেন লঞ্চে। তার দুঃখের দিন ফুরালো বলে ...। লাশ আর শতাধিক নিখোঁজের এক বিশাল তালিকা। প্রতি বছরই পিনাক-৬ এর মতো শতাধিক প্রাণসমেত বহু লঞ্চ হারিয়ে যায় সর্বগ্রাসী জলরাশির অতল গহ্বরে। তাই না চাইলেও অপেক্ষা করতে হয় আরো একটি নতুন তালিকার জন্য। বছর ঘুরেই বেরিয়ে আসে নতুন হীরা, হাবিব, শেফালিরা। সময় বাঁচাতে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটে বহু সম্ভাবনাময় প্রাণের। আর সেই সাথে সলিল সমাধি ঘটে বহু আশা, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের।

সেই শৈশব থেকেই একটা কথা বহুবার কানে বেজেছে, 'সময় অতি মূল্যবান।' কিন্তু আজ একটা প্রশ্ন বার বার মাথায় খেলে যাচ্ছে- সময়ের মূল্যটা আসলে কতখানি বেশি? সে কী রঙিন স্বপ্নময় একটা জীবনের চেয়েও অধিক। হাবিবের এ লঞ্চেই আরো একজন। দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে লঞ্চে ওঠার সময় ঝুঁকির কথা মাথায় ছিল না সাদি সাহেবেরও। স্ত্রী শেফালী আর দুই শিশু সন্তান আরিফ ও এনামকে বহুদিন পর গ্রাম থেকে ঘুরিয়ে আনতে পেরে তার খুবই খুশি লাগছে। আর ছেলে দুটোর সাথে গল্প করতে করতে ঝুঁকির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। বড় একটা ঢেউয়ে লঞ্চটা যখন দুলে উঠল, তখন অনেকটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। ততক্ষণে আরেকটা ঢেউ নদী ছেড়ে স্থান করে নিয়েছে লঞ্চের একতলায়। ছেলে দুজনকে দুহাতে শক্ত করে ধরে স্ত্রীকে বললেন বেল্টে ধরে থাকতে। ততক্ষণে পদ্মার অতল জলরাশিতে আড়াইশোটা তরতাজা প্রাণ নিয়ে ডুব দিয়েছে পিনাক-৬। আপন শক্তি প্রমাণ করতেই যেন সর্বনাশা পদ্মা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল তার দুই শিশুপুত্রকে। স্ত্রী শেফালীও কখন ভেসে গেছে পদ্মার সর্বনাশা স্রোতে .....। প্রায় 'শ' খানেক যাত্রীর মতো সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় বেঁচে ফিরেছেন শামীম। কিন্তু পিনাক-৬ এর মতো পদ্মার কোনো এক অংশে হারিয়ে গেছে এনাম, আরিফ আর শেফালীরা। তাদের মতোই ফিরতে পারেন নি হাবিব। স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে ফেরা আর হল না। চিরতরেই তার দুখের দিন ফুরিয়েছে। প্রাপ্ত অর্ধশত লাশের মিছিলে যোগ দিয়েছেন হীরা। তার ডাক্তার হওয়াটা আর হলো না ....। মাত্র ৮৫ যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ফিটনেসবিহীন লঞ্চ পিনাক-৬-এ গাদাগাদি করে স্থান নিয়েছিলেন আড়াই শতাধিক যাত্রী।

সায়েন্টিফিক লেটার

আদনান আজম প্রত্যয়
কলেজ নং : ৬৩৮২
শ্রেণি : একাদশ-সি (দিবা)

প্রিয় প্রোটন,

কাগজ আর কলমের সংস্পর্শের শুরুতে তোমাকে জানাই Roduceae গোত্রের সকল গোলাপের শুভেচ্ছা। অক্সিটোসিন হরমোন (যে হরমোন ভালোবাসার বৃষ্টি করে)

ও প্রেমাকর্ষ বলের কারণে তোমার কাছে লিখতে বাধ্য হলাম। তোমার রূপের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বারবার আমার চোখের রেটিনায় ফুটে উঠেছে। শব্দের তীব্রতা লক্ষ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে বলতে ইচ্ছা করছে যে, ভালোবাসি তোমাকে। আমার মনের পিকচারটিউবে শুধু তোমারই ছবি। মনে জাগবে শুধু তোমারই উপস্থিতি। প্রেমে আণবিক ভর (ধনী গরিব) কোনো বিষয় নয়। প্রেম পড়ন্ত বস্তুর মতো সবার জন্য সমান।

তুমি আমার না হলে ডিনামাইট দিয়ে পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দিব। তুমি আমার মনের কিংস অব ক্যামিকেল H_2SO_4 (সালফিউরিক এসিড)। তুমি বাতাসের অক্সিজেনের মতো। তোমাকে ছাড়া শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তুমি আমার সাথে আয়নিক বন্ধন সৃষ্টি করে সমসত্ত্ব দ্রবণের মতো সারা জীবন আমার সাথে থাকবে। আমরা এমন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট পদার্থ হব, যা কোনো তাপমাত্রাতেই গলবে না। তোমার আমার প্রেমের গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা খাদকে হার মানাবে।

তোমাকে হারিয়ে আমি ড্রাইসেল ব্যাটারি হতে চাই না। আমি সোলার লাইটের মতো যারা জীবন ভালোবাসা দিতে চাই আলো রূপে। তুমি আর আমি প্রি-পেয়ারিং ল্যাবরেটরিতে সারাজীবন বসবাস করব। প্রেমে মরিচা ধরলে ইলেকট্রোলাইটিং এর মাধ্যমে তার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তুলব। পিক অফ-পিক সব আওয়ার তোমাকে কাছে পেতে চাই। তোমার জন্য আমাকে ভাইব্রেট করতে হয়। তোমার মিষ্টি স্বর আমার কাছে ক্লাসিক রিংটোন থেকেও সুমধুর। তুমি যাতে আমার মন থেকে হারিয়ে না যাও, তাই আমার মনের আউটগোয়িং লক করে দিয়েছি। তোমার আমার প্রেমের মাঝে কোনো অন্তরক রাখতে দেব না। তোমার প্রতিটি কথা আমার কাছে হীরার চেয়েও তীক্ষ্ণ। তোমাকে একদিন না দেখলে নিজেকে নিয়নের মতো নিষ্ক্রিয় মনে হয়। আর তোমাকে দেখলে হাইড্রোজেনের মতো হালকা মনে হয়। তুমি আর আমি ডিজিটাল প্রেম করতে চাই। তুমি তো ব্লাকহোল। তাই তোমার থেকে নিজেকে বের করতে পারি না। তোমার আমার প্রেমে কোনো ভেজাল থাকতে পারে না। আমাদের প্রেম মার্কিন ফুড এসোসিয়েশন ও WHO দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তুমি জানতে চেয়েছ আমার ভালোবাসার পরিমাণ। স্যার আইজ্যাক নিউটনের সূত্রের মতো তোমার আর আমার প্রেমে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি করে। তাই তুমি আমাকে যতটুকু ভালোবাসো আমিও ততটুকু ভালোবাসি।

তুমি আর আমি বিক্রিয়া সংসার করব। আমাদের যদি কেউ বিক্রিয়া করতে না দেয় তবে পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে পৃথিবী ছারখার করে ফেলব। যদি পৃথিবীর কেউ আমাদের প্রেমে রোধ (Resistant) হয়ে থাকে, তবে মুক্তিবেগ নিয়ে পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল গ্রহে চলে যাব, তোমার প্রভাবক (বাবা-মা) যতই আমাকে বিকর্ষণ করুক না কেন, অতি শীঘ্রই তারা আমাকে কাছে টেনে নিবে। মাঝে মাঝে তোমার গতি সরল রৈখিক নাকি বক্ররেখায় তা বুঝতে পারি না। তবে তুমি যে কারো সাথে যোগ প্রেম গঠন করতে পার না, তা আমি জানি। লোডশেডিংয়ের কারণে তোমার উত্তরের অপেক্ষায় এখানেই শেষ করছি।

ইতি
তোমার আকর্ষণে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন

আই মেসি, আমাকে পাস দিলি না কেন?

মাহমুদুল হাসান
কলেজ নং : ৮২৪৮
শ্রেণি : একাদশ-ডি (দিবা)

আমি মাহমুদুল হাসান। একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। মাত্র কয়েকদিন আগেই শেষ হল বিশ্বকাপ ফুটবল। আর ঘটনাটি তখনকারই। আমি ছিলাম ব্রাজিলের চরম ভক্ত। কিন্তু ব্রাজিলের ফ্যান হলেও আর্জেন্টিনার খেলাও দেখতাম। কারণ পরের দিন আর্জেন্টিনার খারাপ খেলা নিয়ে বন্ধুদের সাথে অঘোষিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যে আমাকেই শ্রেষ্ঠ বক্তা হতে হত। এই গল্পটি আর্জেন্টিনার খেলা ছিল এমন এক দুর্ধর্ষ ভয়ানক রাতের। না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একটু ভূত-এর রাসেল ভাইয়ের মতো বলছি। সেদিনকার খেলা ছিল ভোর চারটায়। আমার আবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার বদ অভ্যাসটি ছিল না। আবার, খেলাও মিস করা যাবে না। তাই ভাবলাম রাত জেগে থাকব। আবার আরেক সমস্যা পরদিন স্কুলের ফুটবল ম্যাচ (তখন স্কুলে পড়তাম)। তারপরও জেগে রইলাম। হঠাৎ করে, পাশের রুমে কার যেন গলার আওয়াজ পেলাম। একটু ভয় ভয় লাগছিল। তাই বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলাম (ঘুমাই নি) আর মাঝে মধ্যে নানা রকম চিন্তা হচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম আমি ঘাসের ওপর বসে আছি, আর মেসি আমার দিকে

তাকিয়ে আছে, ঠিক আমার সামনে, আমার স্কুলের মাঠে! একটু পর দেখলাম আমার বন্ধুরা সবাই আছে। হঠাৎ রাতুল বলল, 'কিরে, তুই কী বসে বসেই খেলবি?' আমি তো অবাক মেসিকে দেখে! মেসি এবার আমার দিকে এসে আমাকে বলল- 'তাড়াতাড়ি ওঠ্। ম্যাচ শুরু কবে হবে। আমার প্রাইভেট আছে!' আমি ভাবলাম এও সম্ভব! যাই হোক, ভাবাভাবির অত সময় ছিল না। কারণ ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি আর মেসি একই দলে। খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রথমার্ধে আমরা পাঁচটি গোল দিয়েছি (আমরা না শুধু মেসি)। কিন্তু আমি আবার ব্রাজিলের সাপোর্টার এবং প্রখ্যাত বিতার্কিক কিনা.....। তাই ব্রেকের সময় সোজাসুজি মেসিকে গিয়ে বললাম অই তুই আমাকে পাস দিলি না কেন? (মেসি আমাকে তুই বলেছে, আমি কী আপনি বলব?) মেসি কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'তোকে পাস দিলে তো গোল হত না।' কী ? আমি খেলতে পারি না? তোর এতবড় সাহস! তুই আমাকে পাস দিলি না কেন, সেটা আগে বল!

হঠাৎ মাঠে তুলকালাম শুরু হয়ে গেল। আর খেলাও ফুলটাইম শেষ হল না। আর আমি তখনও চেচাচ্ছি, 'অই মেসি তুই আমাকে পাস দিলি না কেন?' হঠাৎ আমার ছোট ভাই আমার মুখে এক গ্লাস পানি ঢেলে (উল্লেখ্য বিছানায় বন্যা হয়েছিল) আমাকে বলল, 'এই ভাইয়া, মেসি তো একটা গোল দিয়া দিল। তুই চিল্লাইতেছিস্ কেন? খেলা-দেখবি না? উঠ!' আমি হঠাৎ নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করলাম। হায়রে মেসি, হায়রে বিশ্বকাপ। আমাকে স্বপ্নের মধ্যে মেসির সাথে ফুটবল ম্যাচ খেলিয়ে ছাড়ল।

পৃথিবী ধ্বংসের পর

কাজী নাঈমূল ইসলাম
কলেজ নং : ৮২৭৮
শ্রেণি : একাদশ-ই (দিবা)

মাথাটা কেমন যেন ঝিম ধরে রয়েছে। এমন অবস্থায় আস্তে আস্তে চোখ খুলল আবীর। চারদিকে ভালোভাবে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না সে। এক বদ্ধ স্টিলের তৈরি চারকোণা রুমের মধ্যে কী করছে? এমন সময় একটা দরজা খুলে একটি রোবট ভেতরে ঢুকল। রোবটটার হাতে অনেক রকম ঔষধ ও ইনজেকশন।

রোবটটা তাকে দেখে বলল, 'গুড মর্নিং মি. আবীর। কেমন আছেন? প্রায় ৫০ বছর পর আপনার জ্ঞান ফিরল।' এ কথা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। বিছানা ছেড়ে সে এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে বিভিন্ন রকম অত্যাধুনিক টেকনোলজি ও রোবটদের কাজ দেখতে পেল। এমন সময় একজন অচেনা মানুষ এসে তার সামনে দাঁড়াল।

'হ্যালো, মি. আবীর, আমি জন স্টিফেন। আমার সাথে আসুন।' অচেনা মানুষটি বলল। আবীরও তার সঙ্গে হাঁটা শুরু করল। সে এসব সম্পর্কে হাজারটা প্রশ্ন করল। জন তাকে আস্তে আস্তে সব বলতে লাগল।

কথা শুনে সে বুঝতে পারল যে পৃথিবীর রূপ অনেক পাল্টে গিয়েছে। পৃথিবীকে আরো অত্যাধুনিক বানানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় সবকিছু ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কিছু জ্ঞানী, বিজ্ঞানীকে তাদের জ্ঞানের জন্য শুধু বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের বাদে সব মানুষকেও মেরে ফেলা হয়েছে এবং গাছপালা, জীবজন্তু এদেরও ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড শরীরে প্রেরণ করে, শক্তির ট্যাবলেট ও ইনজেকশনের মাধ্যমে, যার সবটাই ল্যাবে তৈরি করা।

এখানে রয়েছে শুধু রোবট হাউসগুলো। যেখানে সে আছে আর আছে রোবটগুলো। এ রকম অনেক রোবট হাউস পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। সবগুলোকে জন স্টিফেন নিজেই পরিচালনা করে।

কিন্তু তার এ সম্পর্কে কিছুই মনে পড়ছে না কেন? হঠাৎ মাথায় যেন কিছুক্ষণের জন্য একটা ঝটকা খেল। আবার ঠিক হয়ে গেল। সে জানতে চাইল এসব কে করল? তখন জন বলল, আমি। আমি কিছু মানুষদের নিয়ে এই রকম পরিকল্পনা করি এবং মানুষ ও রোবটের সাম্রাজ্য তৈরি করেছি। হা, হা, হা....। আপনিও যোগদান করুন নইলে...'

আবীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জনের দিকে। সে চলে গেল। এ সময় সে তার জানালার কাছে এসে পড়েছিল। অবীর জানালার দিক থেকে বাইরে তাকাল। সবকিছু যেন মরুভূমির মতো। হঠাৎ কিছু রোবোটিক যান দেখতে পেল।

এমন সময়ে তার কিছু কিছু মনে পড়তে লাগল। পৃথিবী এক সময় খুব সুন্দর ছিল। গ্রামের সবুজ শ্যামল, শহরের ব্যস্ত

জীবন, পশুপাখি ও মানুষের সমাগম। তার একটা পরিবার ছিল। সেখানে তার বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান ছিল, কিন্তু তাদের কী হল? জনের কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য যেতে লাগল এবং দেখতে লাগল, মানুষ ও রোবট এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে কাজ করে না, তার থেকে অত্যাধুনিক কিছু যার নাম সে জানে না। চারদিকে শুধু এরকম পরিবেশই ছাপিয়ে ছিল।

অবশেষে জনকে খুঁজে পাওয়া গেল একটা রুমের মধ্যে। তাকে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারল তাদেরও মেরে ফেলা হয়েছে। হঠাৎ রাগে তার পুরো শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হল সবকিছুই সে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু তা না করে পাশের টেবিল থেকে একটি কাচ ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে জনের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বদ্ধ ঘরের মধ্যে তাকে মেরে ফেলল। তার মনে পড়ল এসব কিছু তো জন কন্ট্রোল করত। তাহলে এবার? সে সঙ্গে সঙ্গে অপরেটিং সিস্টেমের কাছে গিয়ে দেখল সে সবই বুঝতে পারছে। তখন তার মনে পড়ল সে অনেক বড় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তাই হয়তো তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কমান্ডিং সিস্টেম তার আন্ডারে নিয়ে আসল।

কয়েক বছর পর ...। আবীর অবশিষ্ট মানুষদের বুঝিয়ে নতুন পৃথিবীর গড়ার কাজে লাগল। মানুষও রোবট মিলে অবশিষ্ট জীবজন্তু গাছপালার ডি এন এ সংগ্রহ করে তাদের কীভাবে জীবন দেয়া যায় সে কথা ভাবছে। তার বিশ্বাস আবার পৃথিবীকে গাছপালা, জীবজন্তু, ও মানুষের সমাগমে ভরে তুলতে পারবে।

মানবতা কোথায়?

সাদমান সাকিব
কলেজ নং : ৮৩৬৯
শ্রেণি : একাদশ, এফ (দিবা)

পৃথিবীটা যদি হয় একটা খেলার মাঠ, যদি হয় দিন শেষে পড়ন্ত বিকাল, মানুষ হবে সেই মাঠের অস্থায়ী কিছু খেলোয়াড়, ঘরফেরা ক্লান্ত পাখ-পাখালি। কিন্তু সেই গুণ যেটি একজন মানুষ ও বনে শিকার করে ঘুরে বেড়ানো পশুর মধ্যে একটি বিস্তর পার্থক্য, বিভেদ গড়ে তুলে; সেটিই যদি এই পৃথিবী থেকে, এই পৃথিবীর মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে বিদায়গ্রহণ করে, তবে সেই পৃথিবী 'পৃথিবী' থাকবে না। থাকবে না সেই সুদৃশ্য মাঠ, থাকবে না সেই সুন্দর পড়ন্ত বিকাল। সেটি ধীরে ধীরে পরিণত হবে দোযখে, যেখানে মানুষ একটি নির্দোষ, নিষ্পাপ শিশুর পা, দুই হাত কেঁটে তাকে পঙ্গুতে পরিণত করতে এক মুহূর্তের জন্যও ভেবে দেখবে না যে, এটি কিছুদিন পর তার নিজ সন্তানের সাথেও ঘটতে পারে।

মানবতা কোথায়? মানবতা কোথায় হারিয়ে গেল? এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা ক্ষোভ প্রকাশ করে, নানারকম কপটচারী কথা মিশিয়ে একটি লোকদেখানো ভাষণ বিশ্বমিডিয়ায় তুলে ধরবে। তারা এর পেছনে একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে দায়ী করবে। তাদের গোষ্ঠীর নির্দোষ, নিষ্পাপ মানুষেরা ভোগ করবে অমানবিক অত্যাচার, যেটা তারা প্রয়োগ করবে। কিন্তু হায়! তাদেরকে কে বুঝাবে, মানবতার হারিয়ে যাওয়ার পেছনে তারাও একটি বিশেষ Role Play করছে। অন্যায়কারীকে সঠিক পথে আনতে শাস্তির বিকল্প নেই। তবে তার জন্য যাতে নিরপরাধেরা অমানবিক অত্যাচারের ভাগীদার না হয়। সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

যোগ্যস্থিত্ব

তাঈম আহমেদ শান
কলেজ নং : ১৪২৪৯
শ্রেণি : একাদশ-এফ (প্রভাতী)

দশম শ্রেণির গণিত শিক্ষক রহমান স্যার শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন ফুরফুরে মেজাজে। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব লেগে আছে তার। কিন্তু .....না ! আর কোনো কিন্তু নেই। নিশ্চয়ই খুব ভালো মেজাজে আছেন স্যার।

হু ইস দ্য বেস্ট বয় ইন দিস ক্লাস? ঢুকতেই স্যারের বিস্ময়কর প্রশ্ন।

ক্লাস নিশ্চুপ। সাধারণভাবে ক্লাস কয়েক মুহূর্ত সময় নেয় নীরবতা আনতে। তাই আজও তার ব্যতিক্রম নয়।

'আই এম দ্য বেস্ট বয় হেয়ার!' নীরবতা ভাঙল নাফি। বেশ ভালো এবং আমি তা জানি। যে সাহসের দ্বারা পূর্ণ, সে

বিশ্বাসের দ্বারাও পূর্ণ। তবে, কোনোকিছুরই অতিমাত্রা শোভনীয় নয়। বুঝতে পেরেছ? শেষ কথাটা আমি সবার উদ্দেশ্যেই বললাম। ইতি টানলেন রহমান স্যার।

ধন্যবাদ, স্যার। আহ্লাদিত নাফির কণ্ঠস্বর। এইটুকু মহৎবাণী প্রচারে স্যারের কি গৌরচন্দ্রিকা! আর তাই বলতেই হয় ক্লাসে এখন কোনো অনুগত ছাত্র থাকলে সে আছে এক- নাফিই।

ক্লাসে নাফি তুলনাহীন। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথমস্থানে বহাল থেকে শাসন করেছে প্রায় নয় বছর। কতটুকু মেধাবী হলে তা সম্ভব, তা নিশ্চয়ই সাধারণ ছাত্রসমাজের বোধগম্য হবার নয়ই বটে।

সামনে এসএসসি পরীক্ষা। সকল ছাত্রছাত্রীদের মাঝেই বিরাজমান উদ্বিগ্নতা। শিক্ষকদের মতে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বোচ্চ ফলাফল আশা করা যায় নাফির থেকেই। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়া ছাড়াও স্কুলে বহুল পরিচিত মুখ নাফি। আর তাই অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় নাফি অবশ্যই এগিয়ে।

তারপর অনেক দিন চলে যায়। সময় আসে, সময় যায়। যার শুরু আছে তার শেষও থাকবে। এ তাগিদেই নাফির পরীক্ষা শুরু হয়। হাসিমাখা কিংবা কখনও সামান্য সন্দেহের উত্তাপে পুড়ে যায় পরীক্ষার সময়টুকু। তবু, পরীক্ষাগুলো শেষ হয়।

জীবন অপেক্ষার, অপেক্ষার জীবন। মানুষের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটে অপেক্ষায়। কখনও অপেক্ষা এনে দেয় অবসাদ আবার কখনও বা ঘটে তার অবসান। নাফি তা ভালো করেই জানে। কাজেই তারও অপেক্ষা ফলাফলের দিনটার জন্য। যখন সে হাসবে, দৌড়াবে হইচই করে, জানবে তার কথা। তার সফলতার বার্তা, তার বিজয়গাঁথা। নিশ্চয়ই সেদিন আর কোনো অম্লানতা থাকবে না।

তারপর যথাসময়েই প্রকাশিত হল নাফিদের পরীক্ষার ফলাফল। খুব একটা চমক নয় বরং তার চাইতেও বেশি কিছু জাপটে ছিল তাতে। নাফিকে ছাপিয়ে স্কুলের বেস্ট বয় বনে গেল রেজা।

আর নাফি? নাফির রেজাল্টই নাকি খুব শোচনীয়। খুবজোড় পাশ করেছিল সে। সে বিস্মিত নয়, হতবাকও নয়; তবে নির্বাক। হঠাৎই অজ্ঞাত কাকে যেন তার জিজ্ঞাসা, রেজা কোথায়?

নাফির মনে তখন হাজার প্রশ্ন, যদিও এ সময়টাতে তার রেজাকে খোঁজাটা অনেকটা মুদ্রার এপাশ থেকে ওপাশে উঁকি মারার মতো, তবুও সে এ কাজটাই এখন করবে।

রেজা তখন স্কুলের সেকেন্ড বয়। ছিপছিপে দেহ, কোমল গড়ন, শ্যামবর্ণের ছেলেটি সবার সাথে কথা বলত খুব কম। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল রেজাকে নিয়ে শিক্ষকদের সকলে না হলেও কারও কারও সুদৃষ্টি তো অবশ্যই ছিল। কোনো শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়া হয় নি রেজার। শ্রেণিকক্ষেই যা একটু পড়াশোনা হত তার। এ সব ভাবতে ভাবতেই খাঁনবাড়ির মসজিদ; কবরস্থান এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল নাফি। হঠাৎই তার চোখ পড়ল, একটি জীর্ণ, অর্ধভগ্ন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রেজার ওপর। নাফি দূর থেকে তাকিয়ে রইল রেজার দিকে আর অপেক্ষা করতে থাকল রেজার ফিরে আসার।

'মা, নিজের সাথে অনেকটা সময় যুদ্ধ করেছি। কখনও জিতেছি কখনও বা হার-জিতের কথা ভেবেছি; তবু আমি জানি আমি হেরে যাই নি। তুমি আমার পাশে ছিলে, তুমি রেখেছ আমায় এগিয়ে। মা; তোমার মনে আছে, বাবা বলতেন, এ ধরণীতে যোগ্যরাই আজীবন টিকে রয়েছে এবং টিকে থাকবে। যোগ্যদেরই বাসস্থান এই চিরচেনা ধরা। Only the fittest can servive....' রেজা বিড়বিড় করেই চলছিল।

নাফি তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে, রেজার চেয়ে পানে রয়েছে। সে নিশ্চয়ই রেজার মনস্তাত্বিক কথোপকথনের কিছুরই ভাগ পায় নি। হঠাৎই তার মনে প্রশ্ন জাগল, কেন তার সাথে এমন হলো? সবকিছু কি এমনই হওয়ার ছিল?

কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই, তবু তার মনও ভাঙল না। সে নিশ্চুপ হয়ে রইল। হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজারও আর সময় ছিল না কিংবা হয়তো রেজার বাবার সেই কথাগুলো বাতাস চুপিচুপি এসে জানিয়ে দিয়েছিল তাকে।

নাফি তবু ও দাঁড়িয়ে রইল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। তবুও সে ভাবতে লাগল গভীরভাবে, আরও গভীরভাবে।

অপেক্ষা

সৈয়দ সাম্য স্বপ্ন
কলেজ নং-৮২৮৫
শ্রেণি : একাদশ-এফ (দিবা)

১. বিশাল একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে শুয়ে আছে সে। উপুড় হয়ে নীল রঙের আকাশ দেখছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাশেই রেল লাইন। লাইনের দুই পাশে ঢালু। এই ঢালু জায়গায় কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় শুয়ে আছে সে। তার উদাসীন মুখে মাঝদুপুরের রোদ ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। সে তার পেটের কাছে শার্টে হাত দেয়। সেখানটায় খুব ভার অনুভব হয় তার। কাদের ভাই অবশ্য বলেছিল এরকমটা হবে। সে হাতটা সরিয়ে নিয়ে তার মাথার নিচে দিয়ে আবার আকাশের দিকে তাকায়। কত রং-বেরঙের ছবি ভেসে ওঠে আকাশে! এই মেঘটায় দেখা যায় তার মায়ের শাড়ি উঠানে মেলে দেওয়া আর ওই মেঘটায় তো তার মাকেই দেখা যায়। রোদের মতো উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে তার বোনকে কোলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশের মেঘটায় তার বোনকে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। মাত্র তো তিনবছর বয়স তার বোনটার, সারা উঠান জুড়ে হেলেদুলে বেড়ায়। সে অন্য পাশের মেঘগুলোর দিকে তাকায়। সেখানে দৌড়ে বেড়ায় তার খেলার সঙ্গী বল্টু, বয়ে যায় একটা নদী, টলমলে তার জল, উড়ছে একটা ঘুড়ি আকাশ জুড়ে; আর দেখা যায় একটা বাজারের ব্যাগ, তাতে রংধনু রঙের লজেন্স। এরপর একটার পর একটা মেঘ আসতেই থাকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসহ্য লাগে তার।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে লাইনের দিকে তাকায়। এই লাইন ধরেই কিছুক্ষণ পরে একটা ট্রেন আসবে। এই ট্রেনটার জন্যই অপেক্ষা করছে সে। ট্রেনটা আসলেই সে বহুদূর চলে যাবে। সেখানে তার ঘুড়িটা আরও রঙিন হবে, ঘাসগুলো আরও সবুজ, তার মায়ের হাসি আরও রোদেলা হবে। সেখানে তার পদক্ষেপগুলো কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। কিন্তু তার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। এত অপেক্ষা অসহ্য লাগে তার।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন আসার আওয়াজ পাওয়া যায়। শব্দ শুনে সে উঠে গিয়ে লাইনের উপর দাঁড়ায়। ট্রেনটা তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

সে দেখতে পায় যেন একটা পতাকা তার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন সময় পতাকাটা তার খুব কাছে চলে আসে। সবুজ আর লাল। ঠিক যেন সবুজ কপালে লাল টিপ। একসময় পতাকাটা তার খুব কাছে চলে আসে যেন এখনই তাকে জড়িয়ে ধরবে।

২. সারাদিন বৃষ্টি ঝরছেই। কালো আঁধারে ঢেকে আছে পুরো অরণ্য। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কাদের বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাদের কমান্ডারের তাঁবুতে ঢুকল।

'স্যার, রতন হ্যাজ সাকসিডেড। ট্রেনভর্তি আর্মস নষ্ট হয়ে গেছে। অল দ্যা বাস্টার্ডস আর ডেড টু।'

অন্ধকারের জন্য কমান্ডারের মুখে অভিব্যক্তি বোঝা গেল না।

ট্রেনটা যখন ছেলেটার কাছ থেকে অল্প কিছু দূরে তখন সে তার শার্ট উঠিয়ে দেখল তার বুকে বাঁধা মাইনটা ঠিক আছে কী না। দেখে নিশ্চিন্ত হল সে। এরপর ট্রেন এসে জড়িয়ে ধরল তাকে।

তারপর প্রকাণ্ড জবাফুলের মত একটা বিস্ফোরণ। পুড়ে গেল সবকিছু।

চীনের প্রাচীর কেন বিখ্যাত

মোঃ আশিকুর রহমান
কলেজ নং: ১৪৩৭৩
শ্রেণি : একাদশ-জি (প্রভাতী)

চীন বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে চীনের প্রাচীরের ছবি। কোনো একটি স্থাপত্যকে যদি একটি দেশের স্মারক চিহ্ন হিসেবে কল্পনা করা যায়, তা হলে ফ্রান্সের 'আইফেল টাওয়ার,' যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' বা ভারতের 'তাজমহলের' সঙ্গে নিশ্চয়ই এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে হবে চীনের প্রাচীরের কথা। বিশালতা ও আয়তন যদি হয় বিচারের মাপকাঠি, তা হলে চীনের প্রাচীরের ধারে কাছে আসবে না পৃথিবীর অন্য কোনো স্থাপনাই। দীর্ঘ ২৪০০ কিঃ মিঃ পথ পেরিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মরুভূমির উপর দিয়ে চলা বিশাল এই প্রাচীর আজও পৃথিবীর এক বিস্ময়; গত ২০০০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়ে। চীনের প্রাচীরের ইতিহাস জানতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে সম্রাট হুয়াংতির আমলে।

কনফুসিয়াসের মৃত্যুর ৩০০ বছর পর সিংহাসনে বসেন হুয়াংতি। তার আগে চীন নামে কোনো দেশ ছিল না। বিভিন্ন উপজাতি ছোট ছোট রাজ্যের শাসন চালাত। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে সব সময়ই লেগে থাকত যুদ্ধ বিগ্রহ। শেষ পর্যন্ত চইন রাজ্য অন্য রাজ্যগুলোর উপর প্রধান্য বিস্তার করে। চীন নামটির উৎপত্তি 'চইন' শব্দটি থেকেই। হুয়াংতির আমলেই প্রথম ঐক্যবদ্ধ চীন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সমস্ত ছোট রাজ্যকে অধিকার করে একদিকে তিনি বাড়িয়ে নেন সাম্রাজ্যের সীমানা, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। গোটা দেশে একই ধরনের বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনেন, প্রচীন চৈনিক লিপিতেও রদবদল ঘটান। সারা দেশে চালু করেন একই ধরনের লিপির ব্যবহার, ফলে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়ে ওঠে সহজতর। সত্যিকারের প্রজারঞ্জক সম্রাট বলতে যা বোঝায় হুয়াংতি ছিলেন তাই। কিন্তু এত করেও সাধারণ মানুষের জন্য তিনি শান্তি আনতে পারেন নি। তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল উত্তর সীমান্তের মোঙ্গল জাতির উৎপাত। সীমান্ত পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে অবাধে হত্যা, লুটপাট করত তারা, বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে ফসল নষ্ট করে চালাত তাণ্ডব। সাধারণ মানুষের চোখে তারা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। এদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই হুয়াংতি পরিকল্পনা করেন প্রাচীর নির্মাণের। এভাবেই সূচনা হয় এই শ্রেষ্ঠ নির্মাণ কর্মের। আর ২০০০ হাজার বছরের স্মৃতি বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে এই সুবিশাল প্রাচীর।

একটি দেশ একটি দুঃস্বপ্ন

শাহির আহমেদ
কলেজ নং : ১২১৮৭
শ্রেণি : একাদশ (দিবা)

২৯ জুলাই ২০১৪। ফজরের আযান শোনার সাথে সাথে আম্মু বিছানা ছাড়লেন। এখনও অনেক কাজ তাঁর বাকি। কারণ আজ যে ঈদ! আব্বু আর আমি সময়মতো নামাজ পড়ে দাদুর বাসায় গেলাম। সারাদিন অনেক আনন্দ হল। খাওয়া-ঘোরা-আড্ডা কোনো কিছুই বাদ গেল না। আনন্দহীন ঈদ আমাদের কল্পনারও বাইরে। যে মানুষটির দুবেলা খাবার জোটে না, সেই মানুষটিও এই আনন্দে যোগ দেয়।

আমার বসবাস বঙ্গোপসাগরের তীরের ছোট্ট এক ব-দ্বীপে। এই ছোট্ট ভূখণ্ডের মানুষ যখন ঈদের আনন্দে মত্ত, তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলছে নিষ্ঠুর গণহত্যার মহোৎসব।

২৯ জুলাই ২০১৪
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা।

শহরে লাশের স্তূপ। স্বজন হারানোর বেদনায় ভারি হয়ে উঠছে গাজার বাতাস, আগের দিনই অর্থাৎ ২৮ জুলাই গাজার মানুষ পালন করেন পবিত্র ঈদুল ফিতর। সেদিনও 'ওরা' গাজাবাসীকে রেহাই দেয় নি। হামলা চালিয়েছে একের পর এক। কামান-বিমান-ট্যাঙ্ক থেকে শেল বিস্ফোরিত হয়ে বিশ্ববিবেককে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। 'ওরা' নবজাতক শিশু থেকে নারী-বৃদ্ধ কাউকে রেহাই দেয় নি। 'ওদের' হাত থেকে বাঁচে নি স্কুল কলেজ হাসপাতালও। ঈদের দিন যখন আমরা একে অপরের সাথে কোলাকুলি করছিলাম ঠিক তখনই হয়তো কোনো গাজাবাসী তার অতি আপনজনকে শেষবার আলিঙ্গন করে কবরে শুইয়ে দিচ্ছিল। আমি যখন বাবার সাথে প্রতি ঈদে দাদির কবর জিয়ারত করি, তখন হয়তো গাজার কোনো এক পিতা তার সন্তানের কবরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। ঈদে আমাদের শপিংমলগুলোতে যখন উপচে পড়া ভিড় থাকে, মানুষের ভিড়ে পা রাখারও জায়গা নেই, তখন হয়তো গাজায় হাজারো গলিত লাশের ভিড়ে নিজের স্বামী-সন্তানকে খুঁজে বেড়ান কোনো ফিলিস্তিনি নারী। বাবা যখন ঈদের নতুন জামা নিয়ে ঘরে ঢোকে তখন বঙ্গবাসী যে কোনো শিশুই আনন্দে তার পিতাকে জড়িয়ে ধরে। সে সময়ই হয়তো ফিলিস্তিনের কোনো পিতা তার মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢোকে। সারা ঘরে শোকের মাতম ওঠে।

একদিন 'ওরা' ফিলিস্তিনিদের সাথে মিলেমিশে ছিল। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে তারা আজ শত্রু। শত বছরের বন্ধু ফিলিস্তিনিরা আজ 'ওদের' শত্রু! ফিলিস্তিনের মতো এই দুঃসহ অবস্থা আমার দেশেও ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালেই সেই দুঃস্বপ্ন বিদায় নিয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া জানাই, আমাকে এই দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে না। এই লেখাটা যখন লিখছি, তখনই হয়ত আমার ভাইয়ের লাশ পড়ছে; একের পর এক। নাহ! আর লেখা সম্ভব না।

অশ্রুসিক্ত মন

হ্যাভেন চৌধুরী
কলেজ নং : ৭২৫৮
শ্রেণি : দ্বাদশ-ক (দিবা)

মায়ের কলিজার টুকরো মারুফ, মায়ের আদরের দুলাল। মা তাকে খুব আদর-সোহাগ করে। জন্মের পরেই মারুফের বাবা মারা যায়। তখন থেকে মারুফের মা মারুফকে খুব কষ্ট করে মানুষ করছে। মারুফ আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। তার মায়ের স্বপ্ন মারুফকে বিলেতে পাঠাবে, সেখানে সে লেখাপড়া শেষ করে ডাক্তারি পাস করে দেশে ফিরবে। কারণ তার বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। কিন্তু সংসারে বড় অভাব ছিল। তাও মা মারুফকে লেখাপড়া করাতে চায়, বড় ডাক্তার বানাতে চায়। মারুফ ডাক্তার হয়ে গরিব অসহায় মানুষের সেবা করবে, এই ছিল মায়ের আশা। মা তার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য তার হাতের বালা, বাড়ির গরু-ছাগল সব বিক্রি করে দিল। বিভিন্ন লোকদের কাছ থেকে ধার-কর্জও করতে হল। মারুফও তার মায়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে লাগল। লেখাপড়ায়ও সে খুব ভালো। একসময় দেশের লেখাপড়া শেষ করে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য বিলেত যাবে। আজ বাদে কাল মারুফ বিদেশে যাবে। মারুফের মা মারুফের বিদেশে যাওয়ার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে বাড়ি-ঘর, জমিসহ সব বিক্রি করল। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুফ বিলেতে গেল। বিলেতে যাওয়ার পর মায়ের সাথে মারুফের অনেক দিন সাক্ষাৎ নেই। মায়ের মন বিচলিত হয়ে পড়েছে মারুফের জন্য; কিন্তু কী করা যায়। মারুফ তো বিলেতে; তখন গ্রামে কোনো মোবাইল ছিল না যে, যার মাধ্যমে মা মারুফের সাথে কথা বলবে। অনেক দিন হয়ে গেল, তবুও মারুফের কোনো চিঠি আসে না। মায়ের মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উঠোন দিয়ে পিয়ন যায়-আসে তবু মারুফের চিঠি আসে না। মায়ের মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মা পথ চেয়ে বসে থাকে। হঠাৎ একদিন পিয়ন মারুফের মাকে ডাক দিল। মারুফের মা হাসি মুখে পিয়নের কাছে গেল। পিয়ন বলল, আজ মারুফ তোমাকে চিঠি দিয়েছে। মা বলল-'কই, কই! দাও তো দেখি! আমার মারুফ কি লিখেছে?' পিয়ন মারুফের মায়ের কাছে চিঠি দিল। মায়ের মনে কত আনন্দ, অনেক দিন পর মারুফের চিঠি এসেছে। মা চিঠি পড়ছে আর দুষ্ট ছেলের মিষ্টি কথা পড়ে হাসছে। চিঠি পড়ে মা খুব আনন্দ পেল। কিন্তু চিঠিতে মারুফ আরও কিছু টাকা চেয়েছে, টাকা না হলে মারুফ পরীক্ষা দিতে পারবে না। মা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। কেমন করে এত টাকা যোগাড় করবে সে! এদিকে মাত্র কয়েকদিন পরেই মারুফের পরীক্ষা। পরীক্ষার ফি জোগাড় না করতে পারলে মারুফের পরীক্ষা দেয়া হবে না। মারুফের মা মারুফের পরীক্ষার ফি জোগাড় করার জন্য বহু চেষ্টা করল, তবুও মারুফের জন্য সম্পূর্ণ টাকা জোগাড় করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত রাস্তার ফুটপাতে নামল মারুফের মা। রাস্তার ফুটপাতে নেমে ভিক্ষা করতে লাগল। মারুফের পরীক্ষার ফি জোগাড় করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করছে মারুফের মা। ভিক্ষা করতে করতে বেশ কিছু টাকা জমা হল। আর কিছু টাকা হলেই মারুফের জন্য পাঠাবে। প্রতিদিনের মতো আজও ভিক্ষার থলি নিয়ে ঘুরছে। সারাদিন পর মারুফের মা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিল। বাম দিক থেকে ডান দিকে রাস্তা পার হচ্ছিল। পথিমধ্যে পেছন থেকে আসা এক গাড়ি তার বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মারুফের মায়ের দেহ। দুই মাস হয়ে গেল, তবুও মা মারুফের পরীক্ষার ফি পাঠায় না। মারুফের মা ফি না পাঠালেও মারুফ তার বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে পরীক্ষা দিল। পরীক্ষায় মারুফ ভালো করল। সে ডাক্তার হয়ে গেল। ডাক্তারি পাসের পর বাড়িতে সে অনেক চিঠি দিল, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না। তার মা যে মারা গেছে এ কথা সে জানে না। সে বাড়ি চিঠি দেয়, কিন্তু উত্তর আসে না; তাই সে চিন্তা করতে থাকে। এর ফলে মারুফ দেশে ফিরে এল। দেশে ফিরে মারুফ তার এলাকার লোকদের কাছে তার মা'র কথা জিজ্ঞাসা করলে সবাই চুপ করে থাকে। তাদের মধ্যে লতিফ চাচা তাকে সব খুলে বলে। তা শুনে মারুফ চিৎকার করে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোমরা আমাকে খবর দাও নি কেন, যে আমার মা মারা গেছে। সবাই বলল, 'তোমার মা মৃত্যুর অনেক আগে বলেছিল যে, আমি যখন মারা যাব, তখন তোমরা মারুফকে খবর দিও না, ওর লেখাপড়া নষ্ট হতে পারে। তাই.....' মারুফ তার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা ...মা মাগো, তুমি কথা বল! তুমি কেন আমাকে এতিম বানালে।' মায়ের কথা মনে পরলেই মারুফ কাঁদে, মা হারানোর ব্যথা কত কঠিন, কত যে যন্ত্রণার; মারুফ সেটা বুঝতে পারে। মারুফ তার মাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না, না কিছুতেই না।

সেদিন কল্পনার জগতে ছিলাম, আজ বাস্তবতার সম্মুখীন

মোঃ নাফিজ মাসরুর
কলেজ নং : ৭২৪৭
শ্রেণি : দ্বাদশ-সি (দিবা)

দুদিন ধরে তপুর এমন মনমরা মনমরা ভাব আমাদের সবার মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল। তপু এমন ধরনের ছেলে না। সারাক্ষণ হৈ হৈ, উল্লাস আর বন্ধুদের সাথে দীর্ঘক্ষণ হাসিমুখে চাপাবাজি করাই তার কাজ। ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব দেড় বছর সময়ের, এই প্রথমবার ওকে এতটা বিষণ্ন দেখলাম। কলেজের সেই প্রথম দিন হতে, যে দিন আমরা সবাই একসাথে ভর্তি হই; সে দিন থেকেই একরাশ হাসিমাখা মুখ ছাড়া আমাদের চোখে আর কিছুই পড়ে নি। ঢাকার বাইরে এক জেলা শহর থেকে ও এসেছিল। উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে বড় কিছু করে দেখাবে। তাই বলে সে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছুটে চলত, এমনটাও না। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সে বদ্ধ পরিকর। পড়ালেখায় শীর্ষ ছাত্রদের তালিকায় তপু ছিল অন্যতম।

সেদিন ক্লাসে আবার দেখা। সেই একই মনমরা দশা, ভাবলাম টিফিনের সময় তপুকে জিজ্ঞাসা করেই ফেলি। আর কিছু না হোক, অন্তত প্রশ্নটার উত্তরটুকু তো জানা যাবে। আর আজকের পরে ঈদের জন্য লম্বা ছুটি। বেচারা তখন আবার তার শহরে চলে যাবে। আর তেমন কোনো সুযোগও হবে না। টিফিনের সময় সাথে সাথেই ওকে ধরলাম, এই তপু। কিন্তু কোনো কথা নেই।
ওই মিয়া, তোকেই বলছি।
হুম, বল।

কি অবস্থা? ইদানিং এমন দুর্ভিক্ষের নায়কের মতো মনমরা অবস্থায় আছ কেন? কী হইছে? কোনো সমস্যা? কিছু না বলেই সেই জায়গা থেকে সরাসরি প্রস্থান করল। আমিও আর তেমন বাড়াবাড়ি করলাম না। তপুর সাথে আমার বন্ধুত্ব অতটা গভীর নয়, যে এত সহজে বলবে। তাই চিন্তা করলাম এ ব্যাপারে আর কিছু না জানাটাই ভালো। কিন্তু পরে তপুর খুব কাছের এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম আসল ঘটনাটা। সময়ের স্বাভাবিকতায় আমাদের এ বয়সে যা ঘটে ওর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দুইদিন আগে এক মেয়েকে ওর ভালো লাগার কথা জানিয়েছে। আর মেয়েটি ছিল ওদেরই জেলা শহরের। অনেক আগে থেকেই নাকি তপু সেই মেয়েটির পেছনে ছিল। দুদিন আগে ঢাকায় এসেছিল এক বিতর্ক কর্মশালায় অংশ নিতে। সেই কারণে সেদিন ক্লাসে না এসে সারা দিন মেয়েটির সাথেই ছিল। শেষে গিয়ে নাকি তার মনের কথাটি বলেও দেয়। বেচারা তপু জানত না যে, তার কপালে না উত্তর আসবে। শুধু তাই নয়, মেয়েটির সাথে আসা বান্ধবীরাও নাকি তপুর এমন প্রস্তাবের বহু সমালোচনা করে। এমন ছেলে (তপু) নাকি ওই মেয়ের জন্য উপযুক্ত না, এমনটা বলে ওঠে। ভেঙে যায় তপুর মন। শুধু তাই নয়, তার সাথে হারিয়ে যায় তপুর সেই হাসি ঘুরানো মুখটাও।

ওই দিন আর তেমন কিছুই করলাম না তপুর ব্যাপারটা নিয়ে। শুধু জানতে পারলাম তপুর এই মনমরা ভাবের কারণ। তার ঠিক পরের দিন থেকেই কলেজ ছুটি। তপু চলে যায় তার জেলা শহরে; ঈদের ছুটি কাটাতে। ছুটির পরে এসে তপুকে দেখে আমি তো পুরোপুরি অবাক। আবারও সেই হাসিমুখের চাপাবাজি, আবারও সেই গল্প আড্ডা। ধরে নিলাম তপু মনে হয় ছুটিতে গিয়ে মেয়েটার সাথে নিজের মনের সংযোগ করেই ফেলেছে। তখন আর কিছুই বললাম না। বিকালে ওর সাথে আমার একটা কোচিং ছিল। ছুটি হলে আমরা একসাথে বাসায় ফিরি। তাই ভাবলাম ঘটনার মোড়টা জেনে যাই ওর কাছ থেকে। কি রে তপু? শেষমেশ মেয়েটাকে জয় করেই ঢাকা আসলি?
তোকে এসব ঘটনা আবার বলল কে?

জানি জানি, সবই জানি। হয়েছে কি সেটা বল। কই কিছু না তো। সবই আগের মতোই আছে। তবে সেই মনমরা ভাব? হয়ত বা কিছুদিনের জন্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। এখন তো কিছুই না। বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে আমার আসল জীবনের ভালোবাসাকে দেখে আসলাম। আমার বাবা-মা। যাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই আমার জীবনের সব। যারা আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। আশা করে অনেক কিছু। তাদের জন্য কিছু করি। এমন মেয়ে আরও কত হবে। এই সময় এই ভবিষ্যৎ কি আর হাতে আসবে।
তাহলে তোর মাঝে আসল ব্যাপারটা এসছে?

এটা তো সবার মাঝেই এক সময়ে আসে। কারও জন্য হয়ত বা এমন সময় আসে যখন তার হাতে আর সময় থাকে না পিছনে ফিরে যাবার। আমার হয়ত বা সেটা হয়েছে সঠিক সময়ে। (আবার সেই হাসিমুখ) বলতে বলতে এমন সময়েই আমি বাসার কাছে চলে আসলাম। আর তপু চলে গেল ওর হোস্টেলে। সেদিন রাতে চিন্তা করলাম। আমাদের অনেক সহপাঠীই আছে, যারা এই সময়ে তাদের ভবিষ্যতের পেছনে না ঘুরে, সময় অপচয় করে অসময়ের নানা অশুভ রঙের স্বপ্নের পেছনে ছুটে। অনেকেই আবার নিজেকে মানিয়ে নেয় মাদক দ্বারা। জীবনের সমস্ত পাওয়া একটি না পাওয়ার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এ সময়ের সঠিক সিদ্ধান্তের ভুলের কারণে অনেকেই ছিটকে পড়ে সবার থেকে। কিন্তু আমাদের উচিত সর্বদা সেই ভবিষ্যৎটা নিয়ে অগ্রসর হওয়া। সে দিন তপুর

সাথে কথা বলে আর কিছু না হোক, অন্তত এটুকু বুঝতে পারলাম যে, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সে আমাদের মনে যে আগুন জ্বলে, তার উপযুক্ত ব্যবহারের গুরুভার আমাদের হাতেই। আমারাই বেছে নিই, এই আগুনে কি আমাদের ভবিষ্যৎ পুড়িয়ে ফেলব, না কি অন্ধকার থেকে সেই আগুনের আলোয় আমাদের ভবিষ্যৎকে খুঁজে নিয়ে আসব। কারণ জীবন আমার, ভবিষ্যৎটাও আমার। তাই দুঃস্বপ্নের পেছনে না ছুটে, সত্যিকারের স্বপ্নটা জয় করতে পারলেই সব সার্থক।

স্বপ্ন

নূর-এ-সাফী আহনাফ
কলেজ নং : ৯৮৩২
শ্রেণি : দ্বাদশ-ই (প্রভাতী)

স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার মিল কতটুকু? সব স্বপ্নগুলোই যদি বাস্তবে পরিণত হত! কী হত তাহলে? মানুষ কী তখন সারাদিনই স্বপ্নই দেখত কেবল? হয়ত বা না। তখন হয়তো বা মানুষের স্বপ্ন দেখবার মতো মন থাকত না। স্বপ্ন কী এতটাই সহজলভ্য? যে কেউ চাইলেই স্বপ্ন দেখতে পারে? না, স্বপ্ন দেখবার জন্য থাকা চাই সুন্দর একটা মন, যে মনের মাঝে ঠাঁই পায় এক টুকরো চাঁদের আলো কিংবা পড়ন্ত বিকেলের রোদ।

কিন্তু সবাইতো স্বপ্ন দেখে, তাহলে কি সবার মনেই ঠাঁই পায় ঐ এক টুকরো চাঁদের আলো কিংবা পড়ন্ত বিকেলের রোদ। হয়তো বা তাই। অবচেতন মন কখন যে এসব ঠাঁই দিয়ে দেয় তার খেয়াল কেউ রাখি না। সেই ক্লাস টু-এর শিশুটি কিংবা সেই বৃদ্ধাশ্রমের পিতা সবাই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখবার অধিকারটুকু সবার আছে। মানুষের অন্যান্য যে অধিকার ক্ষুণ্ন হোক না কেন, অদ্যবধি কেউ কোনো দিন অভিযোগ করেন নি যে তার স্বপ্ন দেখবার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ অধিকার কখনোই ক্ষুণ্ন হয়নি বা কেউ ক্ষুণ্ন করতে পারে নি।

উহ! আর নয়। কতক্ষণ ধরে দার্শনিকদের মত কী সব আবোল তাবোল ভেবে যাচ্ছি। এই ভাবে ভাবতে থাকলে হয়তো বা পাগল হয়ে যাব। আসলে সব দোষ ঐ বৃদ্ধটার। আজ সকালে পার্কে হাঁটতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল। লোকটাকে দেখেই কেন যেন সুবিধের মনে হয় নি। চেহারায় কিছুটা পাগল পাগল ভাব। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, মুখে ইয়া লম্বা দাঁড়ি। চুল-দাঁড়ি কোনোটাই আর কালো নেই, পেকে সবই সাদা হয়ে গেছে। পরনে পাঞ্জাবি-পায়জামা আর গায়ে জড়ানো একটা চাদর। চাদরটা বেশ ময়লা। লোকটার কাঁধে একটা ব্যাগ। ব্যাগটা আবার কী সব কাগজপত্রে ঠাসা। বৃদ্ধ লোকটির পায়ে কোন স্যান্ডেল নেই। খালি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। প্রথম দর্শনে যে কেউ তাকে পাগল ভাববে। তাঁকিয়ে আছি তার দিকে। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই ইশারায় আমাকে ডাকলেন। না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কী এক কারণে যেন পিছু ফিরে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, যেন আমি তার কতদিনের পরিচিত কেউ। ইশারায় পার্কের বেঞ্চে বসতে বললেন। তারপরই বাক্য বিনিময় শুরু। কথায় কথায় অনেক কিছু জেনে নিলেন আমার সম্পর্কে। আমি অবশ্য তার পরিচয়টুকু জানতে চাইলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়ে উঠল না। হঠাৎ কি প্রসঙ্গে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার জীবনের স্বপ্ন কী?' আমি কিছুটা থতমত খেয়ে গেলাম। এমনিতেই লোকটার কথাবার্তা কিছুটা অগোছালো তারপর আবার এই রকম প্রশ্ন। কিছুটা আমতা আমতা করেই বললাম, 'স্বপ্ন!'

'হ্যাঁ, স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ আজো বেঁচে আছে। সবাই কোনো না কোনো স্বপ্ন নিয়েই বাঁচে।' লোকটা শূন্য দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে এসব বলতে লাগলেন। আমি কোনো উত্তর দিচ্ছি না। লোকটা আবার বললেন, 'নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো যে তোমার স্বপ্ন কী? তুমি কোন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছো? তাহলেই তুমি এ বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

লোকটার কথাগুলো কোথায় যেন আটকে যাচ্ছিল। ঠিক কানে এসে পৌছাচ্ছিল না। আর সেদিকে এতটা খেয়ালও ছিল না। ক্ষণিকের জন্য মনটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। কী যেন ভাবছিলাম। লোকটি আবার কিছু একটা বলে বসল। আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল। লোকটি বেঞ্চ থেকে উঠে চলে যাচ্ছিল, যাওয়ার আগে বলল, 'থাক এখনই বলতে হবে না, পরে কোনো দিন দেখা হলে বলো আমায়।'

আমি সাহস করে প্রশ্নটা করেই বসলাম, 'দুঃখিত। আপনি কে? আপনার পরিচয়টা একটু .....'

'আমার পরিচয় জানবার দরকার নেই। আসি, ভালো থেকো আর স্বপ্নের কথাটা কিন্তু আমাকে বলো একদিন।' এইটুকু বলেই হাঁটার পথ ধরলেন বৃদ্ধ লোকটি। তারপর তার সাথে আর কথা হয় নি। কিন্তু সকালের পর থেকেই লোকটার সেই প্রশ্নটা আমায় সারাদিন ভাবিয়ে তুলছে। যদিও প্রশ্নের উত্তরটা ঐ সময়ই দিতে পারতাম, কিন্তু লোকটার কথাগুলো শুনে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। এক অজানা আশঙ্কা ভর করেছিল আমায়, তাই আর উত্তরটা দেয়া হয় নি। লোকটা আসলে পুরোই পাগল। না হলে কোনো স্বাভাবিক মানুষ এসব নিয়ে কথা বলে না, ভাবে না। আমিও তো সারাটা দিন ধরে এসব নিয়ে ভেবে যাচ্ছি। তবে কি আমিও ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছি? জানি না।

তবে লোকটার সাথে আর হয়তো কোনোদিন দেখা হবে না। দেখা হলে তাকে জানিয়ে দিতাম আমার স্বপ্নের কথা।

'আমি পড়ন্ত বিকেলের রোদ হতে চাই'-এটাই যে আমার স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন নিয়েই যে বেঁচে আছি .....

পুনশ্চ: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার উপায়টা তো সবার জানা আছে। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের রোদ হবার উপায়টা কি জানা আছে কারও?

মানুষ মানুষের জন্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে পথশিশুদের ঈদে জামা-কাপড় বিতরণ

একজন মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। শিক্ষা অর্জনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের বিকাশ করা, আর তাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করা মনুষ্যত্বের বিকাশ তথা শিক্ষারই একটি অংশ। তাই মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতি থাকা দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা Humanity নামের একটি গ্রুপ খুলি। আমাদের এই গ্রুপের মাধ্যমেই শুরু হয় সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করা। আমরা গত রোজার ঈদে তেজগাঁও বস্তিতে প্রায় ১৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুকে জামা কাপড় দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটানোর সামান্য চেষ্টা করি। আমাদের এই গ্রুপের লক্ষ্য হচ্ছে ৩-৪ মাস অন্তর অন্তর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাসামগ্রী, জামা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে তাদের সাহায্য করা। আমাদের এই কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা ফেসবুকে Humanity গ্রুপ পেজের মাধ্যমে সংগ্রহ করি। এক্ষেত্রে আমাদের কলেজের শিক্ষকগণ আমাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে থাকেন।

ছড়া ও কবিতা

বৃষ্টি

নাদিব রহমান (অর্ক)
কলেজ নং : ৭৫৫৮
শ্রেণি : চতুর্থ-গ (দিবা)

এ তোমার কি মহান সৃষ্টি।
গ্রীষ্মের গরমে,
মাটি হয় চৌচির
গাছপালা যায় শুকিয়ে।
হঠাৎ! আসে আষাঢ়।
নামে বৃষ্টি
মাটি হয় সুন্দর
গাছ হয় সজীব
কি সুন্দর সৃষ্টি!
বৃষ্টি।

কী লিখব

সাজিদুর রহমান
কলেজ নং : ১২৯৮৭
শ্রেণি : ৫ম-গ (প্রভাতী)

ম্যাগাজিনে কী লিখব, সব যে হলো ভুল,
যা লিখব লিখে গেছেন রবীন্দ্র-নজরুল।
পল্লি নিয়ে লিখব কিছু ভেবে উদাসীন,
পল্লিকবি হয়ে আছেন জসীমউদ্‌দীন।
নদীর ধারে দেখছি বক আর সাদা হাঁস,
পোড়া কপাল, সেখানে আছে জীবনানন্দ দাশ।
বন নিয়ে লিখব কিছু উদাসী বনের বায়,
কলম নিয়ে বসে আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
ভাবছি এবার কবিতা ছেড়ে আঁকব শুধু ছবি,
নইলে আবার ভাত মারবে আমার মতো কবি।

বাংলাদেশ

ঋত্বিক সাহা
কলেজ নং : ১২৫২২
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ-খ (প্রভাতী)

মাগো তোমার বুকের মাঝে
থাকি সবাই মিলে মিশে।
ধরবো মোরা অস্ত্র হাতে
কেউ তোমাকে হানা দিলে।
স্বর্গ সুধা তোমার মাঝে
পেয়েছি মা ভালোবাসা।
সকাল দুপুর সন্ধ্যা বেলা
সুখের হাওয়া করে খেলা।
মনে মনে গর্ব করি
বাংলাদেশে আমার বাড়ি
তোমার বুকে মাথা রেখে
শেষ নিঃশ্বাস যেন ছাড়তে পারি।

ভেজাল

মাহী সাজ্জাদ
কলেজ নং : ৬৬৪৪
শ্রেণি: ষষ্ঠ-গ (দিবা)

আমি একজন ছাত্র
বুদ্ধি নেই মাত্র।
যখন পড়ি বাংলা
হয়ে যাই ল্যাংড়া।
যখন পড়ি সমাজ
ভুলে যাই সব কাজ।
যখন পড়ি বিজ্ঞান
হয়ে যাই অজ্ঞান।
যখন পড়ি ইতিহাস
হয়ে যাই পাতিহাঁস।
যখন পড়ি পৌরনীতি
দেশে দেখি দুর্নীতি।
যখন পড়ি কৃষি
হয়ে যাই ঋষি।

স্বপ্ন

আব্দুল্লাহ আল যুবায়ের
কলেজ নং : ৫৭৬৯
শ্রেণি: সপ্তম-গ (দিবা)

সুন্দর স্বপ্ন, এসেছিল আজ রাতে
এক অপরূপ সুন্দর প্রদীপ নিয়ে হাতে।
ঘুমন্ত নগরী,কেউ ছিল না পথে,
একাই চলে গেলাম সেই সোনার রথে।
স্বপ্ন আমার ভরেছিল এক গন্ধে,
ঘরের আধার কেঁপেছিল এক আনন্দে।
কতবার আমি ভেবেছি, 'উঠি উঠি',
আলস্য ত্যাগ করে পথে বেরোই, ছুটি!
উঠেছি যখন, তখন সময় গিয়েছে চলে-
আজ আর বুঝি যাওয়া হল না স্কুলে।

স্বদেশ

মোঃ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী
কলেজ নং : ১৩৯২৯
শ্রেণি: অষ্টম-খ (প্রভাতী)

প্রেমচিত্তে, মোহনীয় হয়ে, বরণীয় হয়ে আছো তুমি জননী মাগো।
বাঁচিয়া আছি, তোমার পরে, তোমার কোলে
অন্তর মম আজও জাগো
হে প্রিয়া, হে প্রিয়, হে মা, মাগো দিয়াছ প্রাণ, করিয়াছ মান
দিয়াছ আজ অদম্য স্থান
উৎকর্ষ চিত্তে পাগল হইয়াছি আমি
মাগো, হে জননী মা, মাতৃভূমি মা
আজো প্রাণপণে সদা সত্য তোমায় ভালোবাসি।
গ্রহ, তারকারাজি, নক্ষত্রপুঞ্জ
তাহার চেয়েও বেশি!
হ্যা গো মা, হ্যা, শুধু তোমায় ভালোবাসি।
সহিয়াছ তুমি বেশ কর নি তবু দ্বেষ
দিয়াছ ঠাঁই তোমারই চরণে।

এগিয়ে যাওয়ার ছড়া

সালেহ সাদিক
কলেজ নং : ১৪০৪৩
শ্রেণি : অষ্টম-ঘ (প্রভাতী)

যাও এগিয়ে রুখবে না ক
কেউ তোমারে।
যত সব বাধা আছে,
রুখে দিবে এক পলকে।
বীরপুরুষের ন্যায়,
নিয়ে আসবে জয়।
কাপুরুষ হও যদি,
তাহলে পার দিতে জানটা এমনি।
ভয় কোরো না,
আমরা আছি তোমার পাশে; চোখ খুললেই পাবে আমায়,
যত দিন পাচ্ছ না জয়।
তত দিনে লড়ে যাবে,
বীর পুরুষের ন্যায়।

মনের কথা

মোঃ মারুফুল ইসলামঃ
কলেজ নং : ১৩৯৪৫
শ্রেণি : অষ্টম-খ (প্রভাতী)

সূর্য উঠেছে সেই ভোরের প্রহরে
জেগেছে পাখ-পাখালি আর জেগেছে নতুন আলো
আমি উঠে চেয়ে-দেখি, সেই জাগ্রত আলোকে
পাখির মতোই উড়ে যেতে ইচ্ছা করে সেই নব গহীনে।
গাছের ছায়া, প্রকৃতির মায়া মনকাড়ে আমার;
যেন মনে হয়, সেই সবুজ শ্যামলের ছায়ায়
নতুন রঙ, নতুন জীবনের প্রথম পাতা
দিনের সাথে গড়িয়ে যায় সকল খুশির ছায়া।
মনঃকোকনদে যাতে আমি ফুটি যেন স্মৃতি জলে
মধুময় সেই পদ্ম দোলা দিয়ে যায় আমায়।

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ

আসিফ মাহমুদ
কলেজ নং : ৮৩৭৩
শ্রেণি : অষ্টম-ঘ (দিবা)

বুয়েটের কিছু ছাত্র করল এমন আবিষ্কার,
তা দেখে আইনস্টাইনকে মনে হচ্ছিল জোকার,
আবিষ্কারের নামটা তারা দিল টাইম মেশিন,
আর গবেষণা করল তারা দিনের পর দিন।
কিন্তু আমেরিকান চোররা যখন করল এটা চুরি,
তখন ছাত্রগুলো মাথায় হাত দিয়ে বলে, আমরা এখন কি করি?
ভবিষ্যতে পাঠানো হলে তিন নেভিকে,
টাইমেশিনে যাচ্ছিল তারা নির্ভীকে,
যখন তারা পৌছালো সেখানে,
তখন সময়টা যেন ঠিক অপরাহ্নে,
কিছু লোক এসে তুলে নিল তাদের,
ফেলে দিল তারা কিনারা হতে ছাদের।
বর্তমান বিশ্বে শুরু হলো তোলপাড়,
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দয়া করল ১৮ দলকে বার বার,
আরব দেশে বোমা মারল যখন আমেরিকা,
তখন তাদের মেজাজ হয় যেন অগ্নিশিখা,
ঘোষণা করে দেয় তারা যুদ্ধ,
অংশ নেয় আবাল হতে বৃদ্ধ,
জয় হলো মুসলিম জনতা
তারা পেল এই ঋদ্ধি পৃথিবী হতে স্বাধীনতা।
বুয়েটের ঐ ছাত্রগুলোর আগে টগবগ তারা,
আমেরিকা ধ্বংস করা প্রতিজ্ঞা করছিল যারা,
এমন এক রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করে তারা,
আমেরিকা কিছুই থাকেনা; এমনকি এক চারা,
বেচারা ঐ তিন নেভি চলে যায় ঐ *Noman's Land*,
তাই হয়ে গেল তারা *'Noting but Sand'*

দেখা

মোঃ রিফাত সামি
কলেজ নং : ৭৯৬২
শ্রেণি : নবম-গ (প্রভাতী)

তারে দেখিবার তরে,
ফিরি বারে বারে,
উঠি সিঁড়ি বেয়ে।
লয়ে সখি দাঁড়ায়ে আছে সে।
বলিতেছে কথা তাহাদের সাথে।
চেরা দুটি চোখ যেন ঝলমল করে,
ঠোঁটে যেন হাসি খেলা করে,
মুখ যেন অমলিন রূপে তো তুলনাহীন,
কণ্ঠে যেন বাজে বীণ।
হাতের এই কাঁকন
শুনালো গুঞ্জনদিল তাতে ছন্দ,
মনে মোর বাজে আনন্দ
তাহা তো অতন্দ্র আজি মিটিল সাধ
দিবা করে এই সংবাদ।

অভিযাত্রি

সাব্বির আহমেদ (রাব্বী)
কলেজ নং : ৬৯৮০
শ্রেণি: দশম-গ (প্রভাতী)

হে নতুন অভিযাত্রি, এ তিক্ত ধরণীতে
তুমি আসিয়া, হয়ত কিছুটা তিক্ততা কমিয়েছ।
কন্টক পূর্ণ জীবনের কিছুটা কন্টক কমিয়েছ।
মনির জীবনের মুহূর্তকে আনন্দে রাঙিয়েছ।
হে নতুন অভিযাত্রী, তোমার এখনো
দেয়ার অনেক বাকি পৃথিবীটাকে
নিজের মত রাঙানোও বাকি।
স্বাগতম, তোমায় স্বাগতম
এই নতুন পৃথিবীতে স্বাগতম।
স্বাগতম, তোমায় স্বাগতম, এই
চির সবুজ, মুক্ত বাংলায় স্বাগতম।

পহেলা বৈশাখ

তাসিম হাসান খান
কলেজ নং : ৭৬৫২
শ্রেণি : দশম-ঘ (দিবা)

এসেছে নতুন করে দীর্ঘক্ষণ পার করে
বাঙালির পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঘরে।
জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদে সকলে মিলে এক সাথে
বসুধা যেন এই দিন আনন্দের মালা গাঁথে।
হাজারো ব্যস্ততা আর চঞ্চলতার মাঝে
প্রকৃতি যেন এই দিন নতুন রূপে সাজে।
ঘরে ঘরে শুরু হয় উৎসব নবান্ন
নতুন ধানের নতুন চাল, রন্ধনে তা অন্ন
পিঠা, পায়েস, নতুন ক্ষির নবান্নের আয়োজনে
মুখরিত হয় গ্রাম বাংলা জনপদ চরণে।
শিল্পকলা, নাট্যকলা, আছে নৃত্যকলা
দিনটিকে যে মাতিয়ে রাখে বৈশাখি মেলা।

ইচ্ছেঘুড়ি

মোঃ জুবায়ের সিদ্দিকী
কলেজ নং : ১৪৩৮৬
শ্রেণি : একাদশ-জি (প্রভাতী)

আশা তুমি বড়ই অদ্ভূত
জীবনের পদে পদে করে গেছো অভিভূত।
বারবার নিয়ে উচ্ছ্বাস
করেছি তোমায় বিশ্বাস !
বহুবার করেছো নিরাশ
তবু থামে নি জীবনের রাশ।
শিখে গেছি বাঁচতে
এই ভাঙা গড়ার খেলায়।
হয়েছে নতুন আশার সঞ্চার
প্রতি বেলায়।
এভাবেই বেঁচে থাকব
নতুন আশার ভেলায়।
হয়ে এক ইচ্ছেঘুড়ি।

সুদিনের প্রত্যাশায়

মুহাম্মাদ ফাহিম আখতাব
কলেজ নং : ১৪১৭৭
শ্রেণি : একাদশ-এফ (প্রভাতী)

শীতের রাত।
আমি হাঁটছি।
হেঁটেই যাচ্ছি।
গায়ে চাদর, পরনে হলুদ পাঞ্জাবী।
সোডিয়াম লাইটের আলোয়
আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক হিমুর মতো।
কিন্তু আমি জানি আমি কখনই তা হতে পারবো না।
কিন্তু আমাকে যে পারতেই হবে
তাই তো আমি শত বাধা সত্ত্বেও থেমে নেই,
সত্যের সন্ধানে চলেছি অজানার উদ্দেশ্যে,
সকল মায়া-মমতার বাঁধন ছিঁড়ে।
কখনও মন আকুল হয়ে উঠে
কখনও সঙ্গ পাবার জন্য;
দু-দণ্ড কথা বলার জন্য।
কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে আপন কর্তব্য
তখন আমি হয়ে উঠি বজ্রকঠিন, লৌহপাথর।
অভুক্ত দেহ;
শীতের প্রকোপে কেঁপে কেঁপে ওঠে
চাদরটা গায়ে আরো ভালোভাবে জড়িয়ে নেই।
কুয়াশার চাদরে চারদিক ঢাকা।
হিমেল সমীরণ বয়ে চলছে।
চারদিক নিস্তব্ধ, শান্ত
যেন এক অন্য জগৎ।
সেখানে দুঃখ-অশান্তি বলে কিছুই নেই;
শুধুই আনন্দের হিমেল পরশ।
কিন্তু এরই মাঝে লুকিয়ে আছে
অজস্র বেদনার কান্না,
আর্তচিৎকার, হাহাকার,
হতাশা, অপ্রাপ্তির করুণ আর্তনাদ।
মিথ্যা, প্রপঞ্চপূর্ণ এ জগৎ
আমাকে পুড়িয়ে চলেছে নরকের আগুনের মতো।
যেন নরক ফেরত শয়তান
ভর করেছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু একদিন হবে সত্যের জয়
মিথ্যা হবে বিতাড়িত
আনন্দে হেসে উঠবে ধরণী।
আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি .....

তরুণ প্রজ্বলন

তাঈম আবরার শান
কলেজ নং : ১৪২৯৪
শ্রেণি : একাদশ-এফ (প্রভাতী)

এসেছে সময়,
জেগে উঠবার
তারুণ্যের ঐ ডাকে।
দিকে দিকে ফের চেয়ে দেখো ভাই,
সম্ভাবনা জাগে।
আর কত কাল দেখবে চেয়ে
অপরাধ চক্রান্ত?
নীতিবোধ কোথা রেখেছো লুকায়ে
তবে কেন বিভ্রান্ত!
দেশটা যখন যাচ্ছে হারায়ে দুর্নীতির অতলে,
কেউ নেই সব লুটে পুটে নাও,
দুষ্কৃতির দল বলে।
চুপ কেন রও? হে নবীন তুমি
খুঁজে নাও তোমার পথ।
সোনার বাংলা গড়বে তুমি
আজি নাও এ শপথ।

স্বাদ

মোঃ আশফাকউদ্দৌল্লা
কলেজ নং : ৮৩২৯
শ্রেণি : একাদশ-এফ (দিবা)

হঠাৎ অচেনা ভারী শব্দ,
ঘুমন্ত চোখ দুটো খুলে দেখি
চারদিকে লাল বর্ণের হাহাকার,
আর্তনাদ আর চিৎকার,
ঘুম থেকে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল
শত মানুষ;
গ্রহণ করি এক তিক্ত স্বাদ।
হত্যার বিরুদ্ধে কিছু বার্তার
উষ্ণতা বেড়েছে।
বাড়ছে হত্যা, ঢেকেছে আঁধার
বেড়েছে মুক্তির ইচ্ছা।
কারো কথায় অবশেষে,
শুরু মুক্তির ঝংকার।

উঠে ক্ষীণ সূর্য;
তিক্ত জিহবায় উপভোগ করি
নতুন স্বাদ!
একদিকে অস্ত্র আর হাতের শক্ত পেশি
অন্যদিকে মন আর বিশ্বাস, মা আর
ভালোবাসা
চারদিকে মুক্ত পথ সঞ্চার,
তবুও কালোঘেরা অন্ধকার
দেখি মুষ্ঠিবদ্ধ হাত, বরণ করি জেগে ওঠার স্বাদ

কিছু রক্ত ভূমিতে গড়িয়ে যায়,
সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে
আকাশের বুকে উদিত হয় শুভেচ্ছা।
যে অভ্যর্থনা নিজেকে ফিরিয়ে দেয়
নিজের কাছে।

অনুভব করি বিজয়ের স্বাদ।
৪০ বছরের বর্ষপঞ্জিকা ফেলে দিয়েছে পদতলে,
নিজেকে ফিরে পেয়েছি, শুভেচ্ছার কপোল তলে।
তা শুধু মুখ আর
সুর দিয়ে বরণ করেছি,
মাঝখানটায় শুধু শূন্যতা আর বিষাদ।
আপনি কি পেয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ?

ভালবাসার দেশ

মোঃ রায়হান হোসেন রাতুল
কলেজ নং : ৮৩৮২
শ্রেণি : একাদশ-সি (দিবা)

এই যে গাছের ছায়ায়,
জড়িয়ে আছি এক মায়ায়।
এই যে নদীর ঢেউয়ে,
চলছি স্বপ্নের নৌকা বেয়ে।
এই যে ধানের ক্ষেতে,
বাউল যায় গান গাইতে গাইতে।
এই যে ফুলের ঘ্রাণে,
প্রাণে নতুনের ছোঁয়া আনে।
এই যে কবিদের কবিতায়,
মন যে অচিন দেশে হারায়।
এই যে পাখিদের গানে,
মন শুধু ভালোবাসতে জানে।
এই যে দেশের মাটিতে,
গিয়েছি কোথাও হাঁটিতে হাঁটিতে।
এসব কিছু বুনেছে মনে ভালবাসার জাল,
এসব রেখে যেতে হবে সবাইকেই,
আজ নয় কাল।

আজ মুক্তি চাই

আদেল মাহমুদ জাদ্দারী
কলেজ নং : ৮৩৬৬
শ্রেণি: একাদশ-ডি (দিবা)

মুক্তি ওই আকাশের মতো,
মুক্ত হতে ইচ্ছে করে।
বেদনা-ব্যথা, দুঃখ যে আজ
দুচোখ হতে অশ্রু ঝরে।
উড়ন্ত ওই পাখির মতো
ডানা মেলে আমি উড়তে চাই।
দুরন্ত ওই ছেলের মতো,
চার দেওয়াল হতে মুক্তি চাই।
স্রোতস্বিনী ওই নদীর মতো,
নিজের স্রোতে চলতে দাও।
আমায় বাধা দিও না আজ আর,
বাবার হাতটা সরিয়ে নাও।
আমি আজ ওই ঝরনার মতো,
সাদা জল হয়ে বইতে চাই,
আমি আজ ওই পাহাড়ের মতো
মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই।
আমি যেন আজ স্বপ্ন দেখি,
নীল ওই আকাশ ছোঁব।
নিজের আশা, নিজের ভাষায়,
জীবনটা বাড়িয়ে-নেব।
আমি যেন আজ পাড়ি দিতে চাই
মরুভূমির ওই অসীম দূর,
আমায় বাধা দিও না আজ আর
কেড়ে নিও না আপন সুর।
আজ আমি ওই ধানের ক্ষেতে,
সবুজ ঢেউ এ মিশতে চাই।
আমি আজ চাই ভালোবাসতে,
নিজেকে আজ চিনতে চাই।
আমায় আজ আটকিও না,
নিজ গতিতে চলতে চাই।
শ্বেত বরফের পাহাড়ের মতো
সাদা নতুন এক জীবন চাই।
অমি চাই এক জীবন,
স্বাধীনতার সাথে বাঁচতে চাই।
আমি চাই এক বাধাহীন পথ,
যেথায় কোনো বাধা নাই।
এমনই কোনো উক্তি যে আজ,
আমি নিজ কানে শুনতে চাই।

রক্তাক্ত মা

রায়হান হোসেন
কলেজ নং : ৮৫২০
শ্রেণি : একাদশ-ই (দিবা)

বাংলাদেশ!
কেন হাত বাড়িয়ে আছো?
নদী চাও তুমি?
কিসের অভাব তোমার?
প্রাণের বিনিময়ে দিয়েছি স্বাধীনতা
পেয়েছ সার্বভৌমত্ব
দিয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্র।
আর কী চাও তুমি?
কেন হাত বাড়িয়ে আছো?
কিসের অভাব তোমার?
দিয়েছি তোমায় মানচিত্র
পেয়েছ লাল সবুজ পতাকা
পেয়েছ তোমার অধিকার।
কেন হাত বাড়িয়ে আছো?
কী চাও তুমি?
আজ কেন হানাহানি রক্তপাত?
কেন লাল সবুজ পতাকা
আবার রক্তে লাল?
কেন রাজপথ আবার কলঙ্কিত,
কেন ছেলেহারা মায়ের চোখে জল?
কেন আবার রাজপথে পড়ে আছে রক্তাক্ত লাশ?
জবাব দাও? জবাব দাও, মা !

হে তরুণ

মেশকুল জান্নাত
কলেজ নং : ৮৪০৯
শ্রেণি : একাদশ-ডি (দিবা)

হে তরুণ-
উর্ধ্বে তোল হাত
রবির ন্যায় আলোকিত হয়ে,
দূর করো তিমির রাত।
হে তরুণ-
বুকে বাড়াও সাহস
কাঁটা ফোটায় ভয় দূর করে আজ,
ফোটাও তামরস।
হে তরুণ-
সামনে চল পা বাড়াইয়া
যেমন করে গগন চিড়ে,
উড়ে চলে চিড়িয়া।
হে তরুণ-
দূর করো সব শোষণ
ভূপালের ন্যায় মুক্ত করো,
মোদের এই ভুবন।

অনিশ্চিয়তা

মোঃ সাফিউর রহমান
কলেজ নং : ৮৫২২
শ্রেণি : একাদশ-সি (দিবা)

বৃষ্টি ফোঁটার মত রক্ত আজ ঝরছে মোদের শরীর থেকে,
মৃতের ছায়া দেখি সবখানে, এ বিষাদভরা চোখ দিয়ে।
হারিয়ে যাওয়ার সেই ভাবনাটা, যাচ্ছে না এই মগজ ছেড়ে
প্রয়োজনে তবু রোজই পথে নামি, ভয়টাকে সঙ্গী করে।
শিক্ষার সিঁড়ি পার হব, নাকি মাঝপথেই ঝরে যাব,
রাজপথে আমাদের জীবনই সে প্রশ্নবিদ্ধ!

যাচ্ছে জীবন, হচ্ছে প্রাণহানি
গড়ছে নিয়ম, তবু কেউ তা না মানি।
স্বার্থপরতাই আজ শূল, দুর্নীতি,
এর সাথে আরও আছে, যার নাম রাজনীতি।
স্বার্থ হাসিল হলেই খুশি সবাই,
কার কি ক্ষতি হল সেই হুশ নাই।
মেধায় না কাজ হলে অর্থ খাটায়
যোগ্যতা, সততা সব ধুয়ে মুছে যায়।
দূষিত সমাজ ঢেকে গেছে আজ অর্থের চাদরে
শিক্ষাসনদও আজকাল জুটে যায় মামুর জোরে!
আমি সুবিচার চাই, প্রতিবাদের আগুন জ্বালাই!
চাই সে সমাজব্যবস্থা,
থাকবে যেখানে শিক্ষা, শৃঙ্খলা
চরিত্র, দেশপ্রেম আর সেবা।

মুক্তিযোদ্ধা

সিফাত হোসেন ফাহিম
কলেজ নং : ৭৭৬১
শ্রেণি : দ্বাদশ-ক (দিবা)

আমার এ ভাষার মতো
আছে কি কোনো ভাষা?
যার জন্য প্রাণ দিয়েছে
ত্রিশ লক্ষ মুক্তি সেনা।
দীর্ঘ নয় মাস করল যুদ্ধ
মাতৃভূমির জন্য।
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ দিয়েও
আজ সকলে ধন্য।
কে বলে তারা মরেছে
তারা আসলে আছে বুকের ঘরে।
তারাই আছে বাঁচার মত বেঁচে
আমরা আছি মরে।
তাদের মত বাঁচতে পারলে
জীবন হত ধন্য,
তাইতো আমরা হয়েছি আজ
বাংলা পাহারার পণ্য।
মরেছে তারা গর্বের সাথে
গিয়েছে তারা স্বর্গে।
বাংলার মত এমন ভাল মা,
রেখে গেছে মোর ভাগ্যে।
তাদের অনেক আশা ছিল
গড়বে এই দেশ।
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতেই
তাদের জীবন হল শেষ।
তারা মোদের কাছে
স্বাধীনতা রেখেছে গুচ্ছ,
তাদের আদর্শে গড়ব এদেশ
পানির মত করে স্বচ্ছ।
দেশের আসল সন্তানেরা
আসল কথা কি বুঝছ?
দেশের প্রতি ভালো গর্বে
কাঁচের মত স্বচ্ছ।

হোক তারুণ্যের জয়

শেখ শায়খ আল রশিদ (উৎস)
কলেজ নং : ৭৭৯২
শ্রেণি : দ্বাদশ-ঙ (দিবা)

এখনো তুমি ঘুমায়ে রয়েছ অবোধ তরুণ প্রাণ,
উঠবে কবে ঘুম থেকে আর গাইবে নতুন গান?
যে গান গেয়েছিল 'নজরুল' তাঁর স্বপ্ন ভেলায় ভেসে,
স্বপ্ন কি তাঁর করে দিবে ম্লান, অলস ভাবে বসে?
জেগে ওঠ তোমরা, দেখ স্বপ্ন, নতুন করে আজ,
জেগে জেগে যে স্বপ্ন দেখে, সেই তো করে কাজ।
লক্ষ্য অটুট, সাহস খোদার, নাইরে কোনো ভয়,
এগিয়ে যাও বাংলাদেশ, আজ হোক তারুণ্যের জয়।
ইতিহাস তোর লাখো শহিদের, বায়ান্ন আর একাত্তর,
মুজিবের দেশ গড়ি চল, আনবোই আজ নতুন ভোর।
ঘরে ঘরে আজ জন্মাক তবে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী;
বিভেদ ভুলে হই চল সব, লাল সবুজের বীর সেনানী।
ভালবাসা দিয়ে দেশ গড়ি চল, আমরা শেকল ছেড়া,
তরুণ শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ, আজ সকল দেশের সেরা।

শেষ যাত্রা

নূর-এ সাফী আহনাফ
কলেজ নং : ৯৮৩২
শ্রেণি : দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতী)

মৃত্যু এ কেমন এক শব্দ!
মুহূর্তের মাঝেই চারপাশটা
করে তোলে নিস্তব্ধ।
মৃত্যু এ কেমন যবনিকা পতন!
ভালোবাসার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে
এক অজানার উদ্দেশ্যে গমন।
মৃত্যু, এ কেমন অবসান!
নিজের যশ-খ্যাতি, ধন-মান
সবই পৃথিবীকে করে যেতে হয় দান।
মৃত্যু, এ কেমন যাত্রা!
নিজের অস্তিত্বটুকু নিয়ে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া।
তবে এই মৃত্যুই কি মানুষের শেষ যাত্রা?

তারুণ্য

মোঃ আসিফুর রহমান মাহিন
কলেজ নং : ১৩৭৫১
শ্রেণি : দ্বাদশ-চ (প্রভাতী)

হে তরুণ,
অন্ধকারে কেন বসে আছ ভাই একা
অন্ধকার সে বড় নিষ্ঠুর, তা কি নেই তোমার জানা?
অসাধারণ এই ভুবন ছেড়ে এ কোন ভুবনে তুমি!
নেশার রাজ্যে সঁপে দিয়ে নিজেকে, তুমি নেই আর সেই তুমি
সবই যে আজ অন্ধকারময়, তোমার চোখে মুখে
চেয়ে দেখো সেই উজ্জ্বল পৃথিবী থেকে যে কত দূরে!
লক্ষ্যহীন সাময়িক সুখ যদি হয় তোমার নেশা,
তবে কেন হায়, তারুণ্য দিয়েছে তোমায়, সৃষ্টিকর্তা?
তারুণ্যই আজ বাঁচাবে তোমায় এই অন্ধকার থেকে,
নিয়ে যাব এক সুন্দর পৃথিবীতে, অমানিশা থেকে বহু দূরে।
সবই সম্ভব এই ধরণীতে, তরুণ তোমার কাছে;
যদি পারো সব জয় করতে তারুণ্য শক্তি দিয়ে।

হারানো ভাই

শোভন ইউসুফ
কলেজ নং : ৯৭৯৯
শ্রেণি : দ্বাদশ-চ (প্রভাতী)

মনে পড়ে সেই কাল দিনের কথা
দুনিয়া ছিল আলোকোজ্জ্বল, সেই দিনে
তখনও ভাবি নি, কি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে আমার জন্য
হঠাৎ দুপুরে শুনি, আমার ভাই আর নেই।
শুনে আমি বুঝতে পারি নি,
ভাই আমার গিয়েছিল সাতার কাঁটতে
সেই সাঁতারই কাল হলো।
অনেক দিন হয়েছে, সে নেই
কিন্তু আজও ভুলতে পারি নি, তাকে।
অনেক স্মৃতি ছিল তার সাথে
বিলীন হয়ে গেছে তার, অনেক কিছুই।
তবুও সে স্মৃতি হয়ে আছে
আমার হৃদয়ে।
কখনও ভুলতে পারব না তাকে,
যতদিন বাঁচব এ পৃথিবীতে।

টোকাই

টি.এম.সাদমান সাকিব (স্বপ্নীল)
কলেজ নং : ১৪০৬১
শ্রেণি : ৮ম-ঘ (প্রভাতী)

টোকাই তোমার ঈদ আসে না
কে বলেছে, কে?
আমার গায়ের নতুন জামা
তোমায় দেব যে।
এক কাতারে পড়ব নামাজ
মিলাবো কাঁধে কাঁধ,
তোমায় নিয়ে সেমাই খাব
এটাই আমার সাধ।
টোকাই তুমি ঈদের দিনে
আমার বাড়ি এসো,
তোমায় দেব ভালোবাসা
তুমিও ভালোবেসো।

ধাঁধা কৌতুক সাধারণ জ্ঞান

ধাঁধা

মোহাম্মদ আব্দুল হাসিব (জেহাদ)
কলেজ নং : ১৪০২০
শ্রেণি : তৃতীয়-ক (প্রভাতী)

১। চলিতে চলিতে তার চলা হয় ভার,
মাথাটি কটিয়া দিলে চলে সে আবার।
উত্তর : কাঠ পেন্সিল।

২। খোসা আছে বোঁটা নাই, দিনে রাতে তা খাই।
উত্তর : ডিম।

৩। নাই মুখ, নাই মাথা,
টিপে দিলে কই কথা।
উত্তর : রেডিও

৪। কোন সে রসিক চান
নাকে বসে ধরে কান।
উত্তর : চশমা

৫। লাল বুড়ি হাটে যায়,
এগালে ওগালে থাপ্পর খায়!
উত্তর : মাটির পাতিল।

৬। মা রইলো নানির পেটে,
আমি গেলাম বাবুর হাটে।
উত্তর : কলা।

৭। কোন নারি নারী নয়?
উত্তর : ডিকশনারি।

৮। হাত আছে মাথা নাই
পেট আছে ভুড়ি নাই,
উত্তর : শার্ট।

৯। এক ঘরে এক খাম
বল তার কি নাম?
উত্তর : ছাতা ।

১০। বলতে পারো ভাই,
চোখ চেয়ে কোন জন্তু ঘুমায়?
উত্তর : মাছ।

ধাঁধা

নাম : মোঃ রিফাত উজ জামান
কলেজ নং : ১৩৯৪৮
শ্রেণি : তৃতীয়-ক (প্রভাতী)

১। তিন মাথা এক মুখ, ক্ষুধা পেলে চায় না,
যতো দাও ততোই খায়, পেট তবু ভরে না।
উত্তর : চুলা।

২। কাটিলে সকল বস্তু ছোট হয়ে যায়
এমন কী আছে, যাহা বড় হয় ?
উত্তর : পুকুর, কুয়া।

৩। আজব জিনিস হাতে চলে, মাথায় বলে কথা,
পেটের মধ্যে কালো রক্ত, ধাতব তার মাথা।
উত্তর : ঝর্ণা কলম।

৪। এমন কী জিনিস ভাই আছে এ ধরায়,
মুখে দিলে খায় না, না দিলেই খায়।
উত্তর : গরুর মুখের টুনা বা ঠুসি।

৫। চার পায়ে বসি আমি, আট পায়ে চলি,
বাঘ নয় কুমির নয়, আস্তা মানুষ গিলি।
উত্তর : পালকি।

৬। মাটির হাঁড়ি কাঠের গাই,
বছর বছর দোয়াই খাই। জিনিসটা কী?
উত্তর : খেজুর গাছ।

৭। কোন পাখির ডিম নাই, বল দেখি ভাই?
উত্তর : বাদুড়।

৮। হাঁতুড় বাঁটাল বাইসখানা,
তিনটা চোরে নিলে থাকে কয় খানা?
উত্তর : এক খানাও না।

৯। ঘর আছে দুয়ার নাই,
মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর : কবর।

১০। চিরল পাতা, মোটা ডাল;
ফলটি পাকা বিচিটি লাল।
উত্তর : তেঁতুল।

ধাঁধা

আ ফ ম তাবাসুম হাসান নির্জাস
কলেজ নং : ১৩৯০০
শ্রেণি : তৃতীয়-গ (প্রভাতী)

১। ৬ থেকে বিয়োগ করে কীভাবে ৯ করবে?
উত্তর: SIX=6, SIX থেকে S বিয়োগ করলে IX = 9 হয়।

২। ১০০ থেকে ১ বিয়োগ করলে কিভাবে ১০০ই থাকে?
উত্তর: একশত থেকে এক বিয়োগ করলেও শত থাকে।

৩। একদিন তিন সুন্দরী বোন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। সবাই দেখল তাদের গোঁফ আছে। এটা কী করে সম্ভব?
উত্তর: তারা তিনজনই বিড়াল ছিল।

৪। ঠিক ৬টায় দুটি ট্রেন ১টি A থেকে B এবং আরেকটি B থেকে A এর দিকে যাচ্ছে। তারা কোথাও না থেমে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই ১টি লাইন দিয়েই ঠিক সময় নিজের গন্তব্য পৌছাল কীভাবে?
উত্তর: ১টি ট্রেন সকাল ৬ টায় ও আরেকটি ট্রেন বিকাল ৬টায় যাচ্ছিল।

গাণিতিক ধাঁধা

নাজমুস সাকিব
কলেজ নং : ৬৯০০
শ্রেণি: তৃতীয়-গ (দিবা)

১। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্কগুলোকে ৯টি ছক আকৃতির বক্সে এমন ভাবে সাজাবে যেন এক ছকে ২টি একই অঙ্ক না বসে। বক্সের যে কোনো দিক থেকে যোগ করলে যেন যোগফল ১৫ হয়।
সমাধান :

৮	৩	৪
১	৫	৯
৬	৭	২

২। তাবিন বাসার ছাদে বসা। একটি পাখি আকাশে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক পাখিকে প্রশ্ন করল তোমরা ঝাঁকে কত পাখি আছ? ঝাঁক থেকে উত্তর এল 'আসছি যত আসবে তত, তার অর্ধেক তার পাই; তোকে নিয়ে শতেক ভাই। এখানে পাই মানে এক চতুর্থাংশ।

সমাধান : ৩৬টি পাখি

ধাঁধা

মাহী সাজ্জাদ
কলেজ নং : ৬৬৪৪
শ্রেণি : ষষ্ঠ-গ (দিবা)

১। যে লঙ্কা খাওয়া যায় না।
উত্তর : শ্রীলঙ্কা।

২। যে তারে সংযোগ নেই।
উত্তর : ডাক্তার।

৩। নিজের জিনিস নিজে ব্যবহার করে না অন্যরা ব্যবহার করে তা কি?
উত্তর : নাম।

৪। ভেবে চিন্তে বল ভাই, কোন গ্রামে মানুষ নাই?
উত্তর : টেলিগ্রাম।

৫। স্বার্থহীন জিনিস ভাই, নিজে খায় না অপর কে খাওয়ায়, আমি কে?
উত্তর : চামচ।

ধাঁধা

সাহিদুল্লাহ আনসারী
কলেজ নং : ৬৫৬২
শ্রেণি : ষষ্ঠ-খ, (প্রভাতী)

১। পরিচিত প্রাণী নিয়ে, ধাঁধা হল এই,
ছোটবেলায় লেজের মালিক বড় হলে নেই।
আকাশে মেঘ দেখে তারা করে ডাকাডাকি,
তারা উভচরের দলে, নয়তো তারা পাখি।
উত্তর : ব্যাঙ।

২। এদের দিয়ে রোজ,
আয়েশ করে হয় আমাদের ভোজ।
সর্দি যাদের নিত্য সাথী
নেই সে তাদের দলে।
সারাক্ষণই গোসল করে
তার বসবাস জলে।
সারাজীবন জেগে কাটায়
চোখের পাতা নেই বলে।
নতুন কিছু বলব না আর,
থেমে গেলাম এই বলে।
উত্তর : মাছ।

৩। শুরুতেই বলি
এটা একখানা ফল।
এর নাম শুনলেই,
জিভে আসে জল।
ছোট বড় সবার কাছে,
প্রিয় এই ফল।
রংটা কখনো কাঁচা সবুজ
কখনো বা হলুদ।
উত্তর : আম।

৪। ছেলে বুড়া দেখে
দেয় হাত তালি।
একে নিয়ে গল্প লিখেছেন
শ্রদ্ধেয় মুজতবা আলী।
টের পেলে পিছে পিছে আসে।
আকৃতি গোলাকার,
রসে এটা ভাসে।
উত্তর : রসগোল্লা।

৫। সন্ধ্যা হতেই গায় এরা গান
একটাই সুর একটাই ছন্দ
অত্যাচারে তাইতো করি
সব জানালা বন্ধ।
স্বাস্থ্য ভালো ? নাদুসনুদুস!
এরা তাদের ভক্ত।
কামড়ে দিতে ভালোবাসে
প্রিয় খাবার রক্ত।
খুবই খারাপ দশা
এদের জ্বালায় যায় না কোথাও বসা এরা হল ---
উত্তর : মশা।

কৌতুক

মোঃ মোস্তফা তাহজীব
কলেজ নং : ৭৪২০
শ্রেণি : চতুর্থ-গ (দিবা)

১। ডাক্তার : আপনি জোরে শ্বাস নিন।
রোগী : শ্বাস নিতে নিতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। জ্ঞান ফেরার পর-
ডাক্তার : আমি আপনাকে জোরে শ্বাস নিতে বললাম; আপনি জ্ঞান হারালেন কেন?
রোগী : আপনি আমায় শ্বাস নিতে বলেছেন কিন্তু ছাড়তে তো বলেন নি!

২। হাসান : আচ্ছা হাসিব, বল তো সবচেয়ে হাসি-খুশি প্রাণী কোনটা?
হাসিব : কোনটা?
হাসান : হাতি।
হাসিব : কেন?
হাসান : কেন, দেখিস না; সব সময় হাতির দাঁত বের হয়ে থাকে তাই।

কৌতুক

দিহান ইসলাম ধ্রুব
কলেজ নং : ৭০৫৪
শ্রেণি : পঞ্চম-ক (দিবা)

১। স্ত্রী: আমি মরে গেলে তুমি কী করবে?
স্বামী : আমি পাগল হয়ে যাব।
স্ত্রী : মিথ্যা কথা। তুমি আবার বিয়ে করবে।
স্বামী : পাগলে কী না করে?

২। শিক্ষক : বল তো ছোটন, ঢাকা কোথায় অবস্থিত।
ছোটন : খাটের নিচে।
শিক্ষক : এসব কী বল!
ছোটন : বাড়ির মালিক যখন ভাড়া চাইতে আসেন, তখন আম্মু বলেন আব্বু ঢাকায় গেছেন। তখন আব্বু খাটের নীচে থাকে।

কৌতুক

সাদিদ জিয়াদ সবুর (জিতু)
কলেজ নং : ৬৯৩৭
শ্রেণি: পঞ্চম-গ (দিবা)

১। মা : বাবা, পাশের বাসা থেকে একটু চিনি আনো।
প্রতিবেশি : এই নাও চিনি। তোমার মা আর কি বলেছে ?
ছেলে : মা বলেছে ওই বজ্জাত মহিলা যদি চিনি না দেয়, তাহলে পাশের বাসার ললিতা আন্টির কাছ থেকে নিয়ে আসিস।

২। দুই চোর বাড়িতে ঢুকেছে। হঠাৎ টেবিল পড়ে গেল।
লোক : অ্যাই কে? অ্যাই কে?
চোর-১ : মিঁআউ, মিঁআউ। আবার টেবিল পড়ে গেল।
লোক : আবার কে?
চোর-২ : আমিও মিঁআউ।

৩। দীপু, কুদ্দুসকে বলল : হই কুদ্দুইসা, তোর গরুর যখন ডায়রিয়া হয়েছিল তখন কি খাওয়াইছিলি?
কুদ্দুস : পান আর চুন।
কয়েকদিন পর দীপু রাগান্বিত হয়ে আসল।
দীপু : হই কুদ্দুইসা, আমার গরুতো মাইরা গেছে।

৪। এক ভিক্ষুক এক লোকের কাছে ভিক্ষা চাইল।
ভিক্ষুক : এক ট্যাকা ভিক্ষা দেন। লোকটি ১০০ টাকা বের করল।
লোক : তোর কাছে ভাঙতি আছে ?
ভিক্ষুক : জি স্যার, আছে।
লোক : তাহলে ওগুলো আগে খরচ কর।

৫। একটা লোকের কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল। তখন লোকটা পুলিশের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাই, আমার কুকুর হারিয়ে গেছে।'
পুলিশ : আপনি পত্রিকায় ছাপান।
লোক : আপনি কি বোকা? আমার কুকুর কী পত্রিকা পড়তে পারে?

৬। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। স্ত্রী এক থাপড়ে ২টি দাঁত ফেলে দিল।
স্বামী বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লিখে দিল, 'এখানে বিনামূল্যে দাঁত ফেলা হয়।'

কৌতুক

তামীম আহসান জামান
কলেজ নং : ৬৯৯৬
শ্রেণি : পঞ্চম-গ (দিবা)

১। রোগী ডাক্তারকে : ডাক্তারবাবু, সবাই ভাবে আমি নাকি ঘোর মিথ্যাবাদী।
ডাক্তার : কিন্তু এই কথাটি সত্য।

২। ডাক্তার : কাল রাতে আপনি কি বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছেন।
রোগী : ক্রিকেট খেলার।
ডাক্তার : আর কোনো বিষয়ে স্বপ্ন দেখেন নি?
রোগী : আমি, অন্য বিষয়ে স্বপ্ন দেখি, আর আমার ব্যাট করার চান্সটা চলে যাক আর কি?

৩। মেয়ে : মা, আমি পুকুরে গোসল করতে যাব?
মা : না, তুমি সাঁতার এখনো শেখ নি।
মেয়ে : কিন্তু বাপী তো সাঁতারই জানে না, বাপী যে গেছে?
মা: সোনামণি, তোমার বাপীর জীবন-বীমা করা আছে।

কৌতুক

নাহিয়ান আবরার অমিয়
কলেজ নং : ৭০০০
শ্রেণি : পঞ্চম-গ (দিবা)

১। তিন বন্ধুর নাম যথাক্রমে Some body, Nobody এবং Mad. একদিন Some body আর Nobody এই দু জনের মধ্যে ঝগড়া লাগল। এক পর্যায়ে Some body Nobody কে মেরে ফেলল। এ ঘটনার Mad থানায় ফোন করে-

Mad : Hello, police station?
Police : Yes.
Mad : Listen, some body has killed Nobody.
Police : Are you mad?
Mad : Yes, I am mad.

২। বাংলাদেশের কাঁঠাল বিক্রেতা ও এক ইংরেজ ক্রেতা।
বিক্রেতা : আহেন স্যার, ভালো কাঁঠাল আছে।
ইংরেজ ক্রেতা : আই সি!
কাঠাল বিক্রেতা : আইছেন যহন, বহেন (পিড়ি এগিয়ে দেয়)।
ইংরেজ ক্রেতা: ওকে, ওকে।
কাঁঠাল বিক্রেতা : ও আমার ভাতিজা, স্যার নেন, এই কাঁঠালটা বেশি মিষ্টি।
ইংরেজ ক্রেতা : মিটসুবিশি ? ইজ ইট এ কার?
কাঁঠাল বিক্রেতা : বিশ্বাস করেন, এগুলো আমার।

৩। বাবা-মা ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তাই তিন বছরের করিমের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তিনটি জিনিস টেবিলের উপর রাখলেন : টাকা, ধর্মের বই, বোতল এবং স্থির করলেন করিম যদি টাকা ধরে তাহলে ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। যদি ধর্মের বই ধরে তাহলে ধার্মিক হবে। যদি বোতল ধরে, তাহলে ছেলে গাধা হবে। আশ্চর্য করিম একই সাথে তিনটি জিনিসই ধরল। এবার করিমের বাবা বললেন, যা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করেছি তাই; ছেলে রাজনীতিবিদ হবে।

৪। গ্রামবাসী : আচ্ছা মিন্টু মিয়া, তুমি বিদেশে গিয়ে কোনো ইংরেজি-টিংরেজি শিখ নি?
মিন্টু মিয়া: শিখি নি মানে, সবই শিখেছি ।
গ্রামবাসী : তাহলে শোনাও তো।
মিন্টু মিয়া : আচ্ছা শোনো,
গ্রামবাসী : ও-ই, বুচ্ছি বুচ্ছি। সামসুদ্দিন বেটার তিন নাতি।

কৌতুক

ফারদিন সাদাব অনন্ত
কলেজ নং : ৬৪৬৯
শ্রেণি : ষষ্ঠ-গ (দিবা)

১। ফুটপাতে বাতের ঔষুধ বিক্রি হচ্ছিল। লাতু মিয়া বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই ঔষধে কাজ হবে তো?' বিক্রেতা হেসে জবাব দিল, এ ওষুধ খেলে বাত আপনার শরীর থেকে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবে না।'

অনেকদিন পর উক্ত ঔষুধ বিক্রেতার সঙ্গে লাতু মিয়ার দেখা। সে রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি হে তোমার ঔষুধ খেয়ে তো বাত যায় নি।' বিক্রেতা জবাব দিল, 'কেন আমি তো বলেছিলাম বাত পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবে না।'

২। জমিদারের হাতিটা মরে যাওয়ায় কাঁদবে তো মাহুত, আর জমিদারের লোক হয়ে তুমি কাঁদছ কেন?

আমি সাধ করে কাঁদছি না ভাই; ওটাকে যে কবর দেওয়ার ভার পড়েছে আমারই উপর।

৩। আসলে প্লেনে চড়লে নীচের মানুষগুলিকে একেবারে ছোট ছোট পিঁপড়ার মতো দেখা যায়। তো এক এরোপ্লেনে নতুন চড়া ভদ্রলোক প্লেনে উঠে তার ভেতরে থাকা পিঁপড়া দেখিয়ে বললেন, ঐগুলি কিন্তু মানুষ, কারণ প্লেনে চড়লে মানুষগুলিকে ছোট পিঁপড়ার মতো দেখা যায়। পাশের ভদ্রলোক হা করে সঙ্গের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনি যা দেখছেন সেটা সত্যিকারের পিঁপড়া, কারণ প্লেন এখনও ছাড়ে নি।'

কৌতুক

মোঃ ইশতিয়াক আলম (অমিয়)
কলেজ নং : ৬৫০৬
শ্রেণি : ষষ্ঠ-খ (প্রভাতী)

১। বাসায় আগত মেহমান বাসার ছোট্ট মেয়েটিকে কোনো কথা না বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বড় চুপচাপ।' জেনিফার এবার মুখ খুলল এবং বলল, 'এর কারণ আম্মা আমাকে পাঁচ টাকা দিয়েছেন আপনার থ্যাবড়া নাক নিয়ে কোন মন্তব্য না করতে।'

২। বৃদ্ধ মহিলা বাচ্চা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নতুন ভাইয়ের নাম কি?' মেয়েটি উত্তর দিল, 'আমি জানি না। সে এখনও কথা বলতে শিখে নি।'

৩। শিক্ষক : দশটা আফ্রিকান জন্তুর নাম বল তো দেখি।
ছাত্র : নয়টা হাতি ও একটা জিরাফ স্যার।

৪। রোগী : ডাক্তার সা'ব, ডাক্তার সা'ব, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
ডাক্তার : আমি শিগগিরই আসছি, ওটা বন্ধ করে দেব।

কৌতুক

কাজী নাঈমূল ইসলাম
কলেজ নং : ৮২৭৮
শ্রেণি : একাদশ-ই (দিবা)

*** একদিন বাবা ও ছেলে আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছিল। ছেলেটির আইসক্রিম হঠাৎ খসে পড়ে যাওয়ায় সে তুলতে যাচ্ছিল। এমন সময় তার বাবা বলল, 'না বাবা, ময়লা জিনিস উঠাতে নেই, আমি তোমাকে অরেকটা কিনে দেব।'

আরেকদিন বাবা, মা ও ছেলে একসঙ্গে যাচ্ছিল। বাবা হঠাৎ ড্রেনে পড়ে গেল। মা তাকে তুলতে যাচ্ছিল এমন সময় ছেলেটি বলল, 'ছি! মা, ময়লা জিনিস উঠাতে নেই আমি তোমাকে আরেকটা বাবা এনে দেব।'

*** একদিন স্ত্রী তার স্বামীকে ডেকে বলল, 'বল তো আজ কি এমন বিশেষ দিন? স্বামী বলল, 'কি?' 'আজ আমাদের বিবাহ বার্ষিকী, স্ত্রী বলল। স্বামী বলল, ঠিক আছে এসো তাহলে সে উপলক্ষে দুই মিনিটের শোক পালন করি।'

কৌতুক

মোঃ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী অংকুর
কলেজ নং : ১৩৯২৯
শ্রেণি : অষ্টম-খ (প্রভাতী)

১। শিক্ষক : বল তো পৃথিবীর আকার কী রকম?
ছাত্র : গোলাকার স্যার।
শিক্ষক : বেশ বেশ! এবার প্রমাণ দাও কী করে বুঝলে যে পৃথিবী গোল।
ছাত্র : জোরালো প্রমাণ আছে, স্যার। প্রথম সাপ্তাহিক পরীক্ষায় পৃথিবী চ্যাপ্টা লিখে শূন্য পেয়েছি। দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পরীক্ষায় চৌকোণা লিখেও শূন্য পেলাম। তারপর লিখলাম পৃথিবী লম্বা, তাও আপনি কেটে দিয়েছেন। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে লিখেছিলাম তিনকোণা, তাও আপনি কেটেই দিলেন। তা হলে আর বাকি রইল কী? গোল হওয়া ছাড়া পৃথিবীর আর তো কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

২। শিক্ষক : ঘুম পেলে আমরা বিছানায় যাই কেন ?
ছাত্র : ঘুম পেলেও বিছানা আমাদের কাছে আসে না, তাই।

৩। দুই বন্ধু পান চিবাতে-চিবাতে সিনেমা হলে সিনেমা দেখছিল।
প্রথম বন্ধু : এই, আমার পানের পিকটা কোথায় ফেলি বলতো।
দ্বিতীয় বন্ধু : কেন, তোর পাশের লোকটার পকেটে ফেল।
প্রথম বন্ধু : যদি টের পেয়ে যায় ?
দ্বিতীয় বন্ধু : টের পাবে কেন? আমি যে তোর পকেটে ফেললাম সেটা কি তুই টের পেয়েছিস?

৪। মনিব : কুকুর মারা গেল আমার, আর হাউমাউ করে কাঁদছিস তুই। এত কান্নাকাটির কী হল?
চাকর : আমার কাম অনেক বাইড়া গেল সাহেব। কইতে গেলে ও-ই-তো সব পরিষ্কার কইরা রাখত। চায়ের কাপ, থালা-বাসন সব তো ও-ই চাইট্টা-পুইট্টা সাফ করত। আমি শুধু ওকে তালিম দিতাম।

৫। ছেলে: বাবা, একজন লোক সুইমিং পুল তৈরির জন্য চাঁদা চাইতে এসেছে।
বাবা : ওকে এক গ্লাস পানি দিয়ে দাও।

কৌতুক

রায়হান হোসেন
কলেজ নং : ৮৫২০
শ্রেণি: একাদশ-ই (দিবা)

১। এক বাচ্চা প্রস্রাব ধরলেই সবসময় তার মাকে বলে, 'আম্মা হুতুম, আম্মা হুতুম।' এতে প্রায়ই বাচ্চাটির মাকে অপরিচিত মানুষজনের সামনে লজ্জা পেতে হয়, তাই মহিলাটি তার বাচ্চাকে প্রস্রাব আসলে, 'আম্মু, গান করবো' বলতে শিখিয়ে দেয়। পরদিন রাতে মহিলাটি ঘুমিয়ে যায় এবং বাচ্চার প্রস্রাব ধরে। সে তার বাবাকে এসে বললো, 'আব্বা গান করব, গান করব' বাবা বললো এতো রাতে গান করবি!!! ঠিক আছে আমার কানের মধ্যে গান কর। বাচ্চাটি তার বাবার কানে প্রস্রাব করে দিলো!!

২। ক্রেতা : আলু কত টাকা কেজি?
বিক্রেতা : ২০ টাকা
ক্রেতা : তাহলে বল তো আমার বয়স কত?
বিক্রেতা : ৪০ বৎসর।
ক্রেতা : কিভাবে বুঝলে?
বিক্রেতা : আমাদের এলাকার একটা আধপাগল আছে, তার বয়স ২০ বৎসর যেহেতু আপনি পুরাই পাগল সেই হিসাবে আপনার বয়স ৪০ বৎসর-ই হওয়ার কথা!!!

৩। এক অন্ধ লোক ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। কেরাত পাঠের সময় একটা আয়াতে ইমাম সাহেব বললেন, 'ওয়ামা, ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন।' অন্ধ লোকটি ভাবল ইমাম বোধ হয় তাকে উদ্দেশ্য করে কাফের বলেছেন। সে সহ্য করতে না পেরে নামাযের মধ্যে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওয়ামা, ওয়া ল্যাংড়ানা মিনাল মুশরিকিন'। কারণ ইমাম সাহেব ল্যাংড়া ছিলেন!!!

৪। ১ম পথিক : ভাই, আমাকে ৫ টাকা দেবেন ? আমার মানিব্যাগ হারিয়ে ফেলেছি, বাসায় যেতে পারছি না।
২য় পথিক : আমার কাছে ৫ টাকা খুচরা নেই। ৫০০ টাকার নোট।
১ম পথিক : অসুবিধা নাই, আমি Taxi-তেও যেতে পারব।

৫। ভদ্রলোক : এই রিকশা, যাবেন?
রিক্সাওয়ালা : কই যাবেন?
ভদ্রলোক : ওই যে একটা খাম্বা দেখা যাচ্ছে, ওখানে।
রিক্সাওয়ালা : যামু, ৩০ টাকা দিবেন।
ভদ্রলোক : এই যে খাম্বাটা দেখা যাচ্ছে, এখানের ভাড়া ৩০ টাকা হয়? ১০ টাকা দিব যাবেন?
রিক্সাওয়ালা : আকাশের চাঁদও তো দেখা যায়, এইখান থেকে। ১০ টাকা দিয়া পারবেন ওইখানে যাইতে?
ভদ্রলোক : কথায় না পেরে রিক্সায় উঠলো এবং রিক্সা চড়ে গান শুরু করল 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হবে তুমি বলো তো।'
রিক্সাওয়ালা : আমি যামু না, রিক্সা থেইক্কা নামেন।
ভদ্রলোক : কেন, কী হয়েছে?
রিক্সাওয়ালা : আপনে কইলেন খাম্বাডার ওইহানে যাইবেন, আর অহন কইতাছেন, এই পথ যদি না শেষ হয়।' এই পথ না শেষ হইলে এই পথের ভাড়া কি ৩০ ট্যাকায় হয় ? ? ?

৬। শিক্ষক : হিমালয় পর্বত কোথায়?
ছাত্র : জানিনা স্যার।
শিক্ষক : বেঞ্চের ওপর দাঁড়াও।
ছাত্র : তাহলে কি হিমালয় পর্বত দেখতে পাব, স্যার?

৭। ভদ্রোলোক : বাবা, তুমি কোন ক্লাসে পড়?
ছেলে : ক্লাস এইট, সেকেন্ড ইয়ার।
ভদ্রোলোক : ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।
ছেলে : মানে, এইটেই দুই বছর ধরে আছি।

৮। ঢাকার লোক : শুনলাম নোয়াখালীর মানুষ নাকি পার্থক্যকে হাইর্তক্য বলে!!
নোয়াখালীর লোক : হাইর্তক্য আর হাইর্তক্যের মইধ্যে হাইর্তক্যটা কি?

কৌতুক

মাহী সাজ্জাদ
কলেজ নং : ৬৬৪৪
শ্রেণি : ষষ্ঠ-গ (দিবা)

১। ছেলে : মা আমি ১০০ পেয়েছি।
মা : কোন বিষয়ে বাবা?
ছেলে : গণিতে ১০, ইংরেজিতে ৫, বাংলায় ১৯, ধর্ম ১৫, সমাজ ১১, বিজ্ঞান ১৫, আর্ট ৫, ইতিহাসে ৪, কৃষি ১৬।
মা : যার থেকে নিয়ে এসেছো তাকেই দিয়ে আস।

কৌতুক

সাব্বির আহমেদ
কলেজ নং : ৬৯৮০
শ্রেণি : দশম-গ (প্রভাতী)

১। এক মুরগির খামারের মালিক তার খামারের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। করেছিলেন যার ফলে খামারের কথা দূরদুরান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন তার খামারে এলেন এক জনৈক পরিদর্শক।

পরিদর্শক: আপনার মুরগিগুলোতো বেশ নাদুসনুদুস, তা... কি খেতে দেন ওদের?

[মালিক ভাবলেন একে ভিন্ন তথ্য দিলে সে আমার মত খামারি হতে পারবে না।]

মালিক: জ্বী! আমি রোজ কাজু বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, দারু-চিনি, আখরোট, খুদ ইত্যাদি দেই।

পরিদর্শক: কী? আপনি এত টাকা পেলেন কোথায়? আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, দিন আপনার আয়ের রশিদ দিন। খামারের মালিক বিপদে পড়ে গেলেন।

এরপর থেকে তিনি কথাবার্তায় সাবধান হয়ে গেলেন। এর কিছুদিন পর এলেন আরেক পরিদর্শক।

পরিদর্শক: আপনি মুরগিদের কি খেতে দেন?

মালিক: মুরগিদের বলতে গেলে কিছুই দেই না। এই হালকা খুদ আর চাল দেই। আর না থাকলে কিছুই দেই না।

পরিদর্শক: কী? অবলা জীবের প্রতি অত্যাচার! আমি পশু ক্লেশ নিবারনী সংস্থা থেকে এসেছি আপনার বিরুদ্ধে আমি মামলা করব।

খামারের মালিক আবারও প্রমোদ গুনলো। কোন রকমে এবারও নিস্তার পেলেন। কিছুদিন পর আরও একজন পরিদর্শক এলেন।

পরিদর্শক: আপনি মুরগিদের কী খেতে দেন?

মালিক: জ্বী! আমি রোজ ওদের ৫ টাকা করে দেই ওরা যা কিছু ইচ্ছা কিনে খায়।

পরিদর্শক: কী? আপনি তো মানসিক রোগী। আমি মানসিক হাসপাতালের ডাক্তার। চলুন আপনাকে পাবনা পাঠানোর ব্যবস্থা করি।

২। নতুন বছরের প্রথম দিন এক গার্মেন্টস মালিক তার ম্যানেজারকে বলল-

গতবছর আপনার কাজের অগ্রগতি বেশ ভালোছিল। এইনিন তার জন্য উপহার স্বরূপ ১০,০০০ টাকার চেক। ও হ্যাঁ এ বছরও যদি আপনার কাজের ধারা ঠিক থাকে তবে আগামি বছর চেকের নিচে সাইন করে দেব

সাধারণ জ্ঞান

আ.ফ.ম তাবাসুম হাসান নির্জাস
কলেজ নং : ১৩৯০০
শ্রেণি : তৃতীয়-গ (প্রভাতী)

১। বাতাস কী?
উত্তর : শক্তি।

২। কম্পিউটার কত প্রকার?
উত্তর : ৪ প্রকার।

৩। মানুষ না ঘুমিয়ে কতদিন বাঁচতে পারে?
উত্তর : ১০ দিন।

৪। মানুষ পানি না পান করে কতদিন বাঁচতে পারে?
উত্তর : ৩ দিন।

৫। কোন দেশে সাগরের নিচে ট্রেন চলে?
উত্তর : নেপাল।

৬। কোন মহিলা বিজ্ঞানে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে?
উত্তর : মাদাম কুরী।

৭। এশিয়ার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি?
উত্তর : মালদ্বীপ।

জানা-অজানা

নাহিয়ান আবরার অমিয়
কলেজ নং : ৭০০০
শ্রেণি : পঞ্চম-গ (দিবা)

১। সূর্যের বয়স প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর।
২। আমরা প্রায় প্রতিদিন ২০,০০০ বার চোখের পলক ফেলি।
৩। অক্টোপাসের ১৩টি হৃদপিণ্ড আছে।
৪। জুপিটারের গ্রহে ৬১টি চাঁদ আছে।
৫। ডুমুর গাছে কোনো ফুল হয় না, শুধু ফল হয়।

৬। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল র‍্যাফলেসিয়া।
৭। বিড়াল ১০০ রকম শব্দ করতে পারে, আর কুকুর ১০ রকম।
৮। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ মৃত্যুর জন্য যে প্রাণীটি দায়ী, তা মশা।
৯। অস্ট্রেলিয়ার এমন এক মরুভূমি আছে যার বালুকণা লাল রঙের।
১০। পিঁপড়ে পানির নিচে একনাগারে দুইদিন থাকতে পারে।
১১। পৃথিবী তার নিজ অক্ষে মার্চের চেয়ে সেপ্টেম্বরে দ্রুত ঘোরে।
১২। উটপাখির মস্তিষ্কর চেয়েও চোখ বড়।

জেনে নিই

মুন্সী আল আরাফাত (তানভীর)
কলেজ নং : ৬৫০৭
শ্রেণি : ষষ্ঠ-খ (দিবা)

১। বিশ্বের কোন মহিলা ৯৯ বছর হাসপাতালে থেকে রেকর্ড করেছেন?
উত্তর : মার্থা নেলসন।

২। কোন সাপ উড়তে পারে?
উত্তর : প্যারাডাইস স্নেক।

৩। কোন মাছের গায়ে বিদ্যুৎ আছে?
উত্তর : ড্রাগন মাছ।

৪। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কে?
উত্তর : বিবি খাদিজা (রা)।

৫। বিখ্যাত পর্বত তাজিনডং ও কেওক্রাডং এর উচ্চতার পার্থক্য কত মিটার?
উত্তর : ১ মিটার।

৬। কোন মাছ হাঁটতে পারে?
উত্তর : এ্যাংলার ফিস।

৭। কোন রাজা ২০ মিনিট ক্ষমতায় ছিলেন?
উত্তর : পর্তুগালের রাজা লুই ফিলিপ।

৮। কোন মাছ গান গায়?
উত্তর : ড্রাম ফিস। এদের দাঁতের কড়মড় শব্দ গানের মত শোনায়।

প্যারোডি সংবাদ

আবরার আল মুনতাকিম রাফি
কলেজ নং : ৮০৯৭
শ্রেণি : অষ্টম-ডি (দিবা)

প্রথমে শুনুন সংবাদ শিরোনাম :
১। শীর্ষ সন্ত্রাসী লেজ কাটা চিকারাম নিহত।
২। ভাউয়া ব্যাঙ এর মৃত্যুবরণ।
৩। নিখোজ সংবাদ
৪। রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে সিঙ্গারা ব্লাস্ট। এছাড়াও রয়েছে আবহাওয়ার সংবাদ।

এখন শুনুন বিস্তারিত :
আসসালামু আলাইকুম। সংবাদ পড়ছি আমি আবরার আল মুনতাকিম রাফি। আগারগাঁওয়ে ইঁদুর সন্ত্রাসী লেজকাটা চিকারাম গতকাল স্কুলের বেঞ্চের নিচে ইঁদুর বাহিনীর সাথে কামড়াকামড়ি যুদ্ধে নিহত হয়। জানা গেছে লেজকাটা চিকারাম তার দলবল নিয়ে বেঞ্চের তল দিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় ইঁদুর বাহিনী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। গতকাল পদ্মা নদীতে তিন দিনের জ্বরে ভুগে অর্থমন্ত্রী ভাউয়া ব্যাঙ মৃত্যুবরণ করেন।

নিখোঁজ সংবাদ : মিরপুর ১ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে গুলিস্তান যাবার সময় একটি বি.আর.টি.সি বাস নিখোঁজ হয়। তার চেহারা গোলগাল, মুখমণ্ডল লম্বা, গায়ের রং ফর্সা। ৫ ফুট লম্বা, যদি কোনো ভদ্রলোক বাসটি পেয়ে থাকেন তাহলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।
নাম : মনে মনে
মহল্লা : তুমি আমি
থানা : লুকোচুরি
জেলা: আমি তোমায় চাই, বাস।

গতকাল ক্লাস চলাকালীন সময়ে, টিফিন দেওয়ার সময় রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে গরম সিঙ্গারা ব্লাস্ট হয়ে ১০ জন আহত ও ২০ জন ছাত্র নিহত হয়েছেন। অধ্যক্ষ এই বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখার জন্য তিন জনের একটি কমিটি গঠন করেছেন।

আবহাওয়া : আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০০ মিটার স্থায়ী দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। উক্ত সময়ে সকলকে বড় বড় বিল্ডিং ছেড়ে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। অথাৎ এ ঝড় হতেও পারে নাও হতে পারে।

বাংলা খবর শেষ, আমাদের পরবর্তী সংবাদ শুনবেন দুই চাঙারী দুই বালটি দুই মিনিট বেজে অমাবস্যার চাঁদ উঠলে। খোদা হাফেজ।

English Section

Water

Rubayat Alvee Borno
College Roll : 7979
Class : III-A (Day)

Water is for drinking ,
Washing, cooking and bathing.
All living things need water,
Or else they can't live further
It has no colour,
It helps the flower.
Water is favourite to fish,
It is useful to make a dish.
We drink water at first
When we feel thirst.

Result Card

Mainhajul Alam Rafi
College Roll : 8140
Class : III-A (Day)

Shanto : Father, look, what I have found.
Father : What?
Shanto :A Result card.
Father : What is written in it?
Shanto : Failed in two subjects.
Father : Being my boy how can you fail in two subjects?
Shanto : It's not mine, it's your, father. I found it with the old papers.

Let's Laugh

M.M. Abirur Rahman
College Roll : 7973
Class : III (A) (Day)

1) One day in a ship

Many years ago, when journeys were made by ships, a ship full of religious groups was crossing the sea. The ship was very big and there were many people aboard. Suddenly a little baby fell in the water. Everyone was tensed. Everyone was screaming and running here and there. Then suddenly a brave man jumped in the water and saved the baby. After coming back everyone was praising him. He was speaking in Urdu. So he shouted 'Pehle Mujhe I daso' which means 'First tell me who pushed me!!!'

Note : The man was pushed by someone and after falling in water he thought why he wouldn't save the baby and then got on the ship with the boy.

2) Fake doctor or real doctor?!

One day a doctor came in the city and told people that he could cure any type of problem. So one man thought, 'He must be fake. I'll expose him today.' So he rushed to the doctor and told him that he had a problem. He did not get the taste of anything; so the doctor checked his mouth and told him to drink the medicine on the bottle number 40. The man drank it and said, 'Yuck, it is cow poop!' And he rushed off to house. The doctor taught him a good lesson for lying to him and he said, 'Hmmm, so you do get the taste' and laughed.

Dream

Mahadi Bin Mamun
College Roll : 13892
Class : III-C (Morning)

I was walking in a forest at night. I didn't know where I was going. The place was very dark as there was no light. Some ghosts were coming towards me. I was very scared. The ghosts were screaming loudly. There was a tree-house on the tree. Seeing this, I climbed half of the tree and then fell down. A monkey came down from the tree and chattered. Some bats were flying in the sky. At that time, I became senseless and I couldn't remember anything more. When I woke in the morning, I understood that it was a nightmare.

1. Story of A Fir Tree

Omar Faruk
College Roll : 7415
Class : IV-A (Day)

In a grove of all Oaks was one little fir tree. It was a pretty little tree, but it felt sad. One day it said,

"I do wish I had green leaves.
All the other trees have leaves.
My needles are hard and stiff.
The birds will not nest in them.
Next day , when the little tree
Woke upset, it had green leaves.
It was just like the other trees. Now I am happy',
it said.
But a goat came along and ate all the green leaves.
'Oh, dear!' said the fir tree.
'I wish I had gold leaves. Goats do not eat gold leaves.'
Next day, when the little tree woke
Up, it had gold leaves.
'How happy I am!', it said.
But a man came along to take
Some oak and saw the golden
Fir tree. Then the man stole all the golden leaves.
'Oh dear!', it said.
'I wish I had glass leaves.'
Next day, when it woke up, it had glass leaves.
'How happy I am!', it said.
'See, my leaves shine in the sun'.
But a strong wind sprang up.
'Woo-oo!', said wind.
And it broke the glass leaves. 'Oh dear!',
Said the fir tree. 'I wish I had my needles again.
Goats do not eat them, none will steal
Them or the wind will do no harm.'
Then the tree went to sleep. When it woke up next day, it had all
Its needles again.
'Oh, I never was and never will be happier', said the little fir tree.
Moral: We should never be greedy for anything.

2. If All The Seas

If all the seas were one sea,
What a great sea that would be!
If all the trees were one tree,
What a great tree that would be!
And if a man cut down the tree
And let it fall into the sea,
What a splash, splash, splash that would be!

The Hebrew Civilization

Debnath Suchinta
College Roll : 11115
Class : IV (Morning)

Hebrew nation is a mix-nation. There is no mentionable role of this nation in sector of hostilities and warfare, building masonary or art of painting. But, they played an important role in case of morality and religion. There are different views about the origin of the name 'Hebrew'. Some people deem that this name was originated from the word 'Khabiru or Habiru'. This kind of name was given by the enemy of Hebrew, because, the meaning of this word is foreigner, nomad or lower people. Another view is, the name 'Hebrew' came from the word 'Evar of Ebar'. 'Hebrew' nation usually came from other side of Euphratis river. The ancient abode of Hebrew was in Arab desert. They are the part of Israil nation. They first built city in North-west Mesopotamia by the leadership of Abraham in 1800 A.D. From that time they are known as Israile. After this, they built city in Palestine by the leadership of Jakob, son of Abraham. After some time, this nation took shelter in Egypt when a famine started in 1600 B.C. The Egyptian Faraw captured them and made them servants. Then, they were free by their new leader Musa. When they became free, they started their new life in 'Sinai' island. Here, Musa got idea about God. He preached the idea of one God by the name 'Jehoba'. From then, this nation could not live the life of peace. Once, Canon-nation attacked upon Palestine and captured the Hebrews. They had to free themselves from the capture of Canon after many years. After freedom, this nation was attacked by the soldiers of a nation named 'Filistin'. Again, they started to search for a new place to live. In 1205 B.C. Hebrews along with their new leader 'Savi' started war against the 'Filistin'. But, the result of this war was the suicide of 'Savi'. In that situation, the leadership of Hebrews was taken by 'Nen David'. He was also called 'Dawud'. Dawud built the kingdom of 'Jerujalem'. Dawud reprimanded the Filistinis and established a new kingdom. By this way, Hebrews became strong in the Palestine-Syria region.

In the region of Solomon, son of Dawud Hebrews became more powerful. Solomon could not rule the kingdom for long. Everywhere, there were wars then. The result was the division of Hebrew kingdom into two parts. The name of north side was Israil and South-side was Juda. In this way, Hebrew kingdom became weak. For this, for many years, Hebrews had to leave Jerujalem. After many years when, Persian defeated 'Calodio' nation, Hebrew again came back to Jerujalem. Subsequently, they became a part of Grece and Rome. (Source : Internet)

Olympic Game

Muntasir Mubeen
College Roll : 13030
Class : V-A (Morning)

The Olympic games are the biggest sports competition of the world. More than 200 nations participate in it. It occurs every four years. The tradition of the Olympic games came from

Greece. The Greece first held it at the foot of the Mount Olympus. That was almost 3000 years ago. Baron Piere de Coubertin, a French man, is the father of modern Olympic games. He founded the International Olympic Committee (IOC) in 1894 A.D.

Curious!

1. What is the largest island in the world?
Ans : Greenland
2. Where is Greenland situated?
Ans : Atlantic Ocean
3. Who is the owner of Greenland
Ans : Denmark
4. Where is Guaria water fall situated?
Ans : Brazil

The Creation Of The Earth

Luban Latif
College Roll : 12925
Class : V-A (Morning)

Earth's evolution is not completely understood. It is thought that the current atmosphere of the world is repressable for the volcanic destruction of the Earth. The layers of rock at the Earth's surfaec contain evidence of the evolutionary processes under-gone by this components of the terrestrial environment during the times at which each layer was formed. From the point at which the planet first began to form, the history of the Earth spans approximately 4.6 billion years. The oldest rocks, howerer, have an isotopic age of only about 39 billion years. There is, in effect, a stretch of 700 million years for which a geologic record exists and the evolution of this pre-geologic period of time is not surprising. To understand this little known period the following factors have to be considered such as the age of formation at 4.6 billion years ago, the bombardment on the Earth by meteorites and the earliest zircon crystals Scientists believed that about one hundred billion years ago the Earth, the sun and all the planets of the solar system were nothing but a cloud of cold dust particles swirling through empty space. Gradually these particles were attracted to each other and became a huge spinning disk. As it spun, the disk separated into rings and the furious motion made the particles quite hot. The centre disk became the sun. There are about 40 large basins attributable to meteorite impact known as Maria. These depressions were filled in with basltic lavas caused by the impact induced melting of the lunar Mantle. Many of these basalts have been analyzed isotopically and found to have crystallization ages of 3 9 to 5 billion years. According to the English-born geologist. Joseph V Smith, a minimum of 500 to 1000 impact basins were formed in Earth within a period fo 100 to 900 million years prior to 395 billion years ago. Moreover, plausible calculations suggest that this estimate represents merely the fag end of the declining meteorite bombardment and that about 20 times as many basins were formed in the preceding 300 million years. Such intense bombardment would have covered most of the Earth surface with the impacts causing considerable destruction of the terrestrial crust up to 39 billion years ago. There is, however, no direct evidene of this phase of Earth because rocks older than 39 billion years have not been found or preserved.

(Source : Internet)

Laughters

Sheikh Bidito Haque
College Roll : 13086
Class : V-A (Morning)

Teacher: George Washington not only chopped down his father's cherry tree, but also admitted doing it. Now do you know why his father didn't punish him?

One student: Because Goerge still had the axe in his hand.

2) A man went to sell his dog. A buyer asked him, "Is this dog faithful?"

The man replied, 'Yes, I have sold him 3 times but he has returned to me.'

3) Irritated tenant to the land lord, 'Look! The rain is simply pouring through the roof of my bed room.'

Landlord replied, 'Just as our contract says, running water in every room!'

Medicines For Heart

Md. Mahathir Islam
College Roll : 7120
Class : V-A (Day)

i) Two friends are speaking.
Friend 1 : Fahim, if I had money, I would buy the whole world.
Friend 2 : If I sell, only then you will buy it.

ii) Teacher ; Tell rightly 'I am a good student' which tense is it?
Student : It is past tense.
Teacher : Your answer is false.
Student : Sir, You were student in the past. So it is past tense, isn't it?

Laughing Machine

Leehan Hayder
College Roll : 13034
Class : V-A (Morning)

1) Papa is Pappu's father. He is a police officer.
Papa- I told you to get 95% marks in English. Why did you get 80% marks?
Pappu- Take this 500 TK. Drop the matter.

2) Lambu and Boss are on the road.
Lambu- Please Boss, call me a bus
Boss- Ok, you are a bus.

3) Teacher- I wish you paid a little attention, Potka.
Potka- Yes, I am paying very little attention.

4) Motu- Do you pay tax with a smile?
Patlu- Yes, I do.
Motu- But I heard you do not pay tax.
Patlu- Yes. If tried to pay the by tax a smile instead of giving money.

5) Don- A beggar begged for money.
Kali- What did you do?
Don- He said, I was very handsome. So, I gave him 1000 TK.
Kali- Hmm, I see he was really blind.

6) Prince weds Princess
Prince-My wife is a LAWFUL wife.
But, she did not hear L. She heard AWFUL.
So, misery and sadness continued forever.

7) Chotu - Yesterday was my wife's birthday.
Motu - So, what did you give her?

Chotu- I gave her nothing.
Motu-Why?
Chotu- Because she wanted nothing as the best gift.

8) Teacher- Cows and bulls is eating grass.
Motu- It's a perfect sentence.
Teacher - How?
Motu- Cow is a female. Sir, ladies first.

9) A Lady sees a beggar.
Lady : I think I have seen you somewhere.
Beggar : You have forgotten our friendship.

Unidentified Flying Object

Manhat Mashrafi Pranon
College Roll : 12977
Class : V-A (Morning)

It was the 17th July, 2009. In Canada there was a pilot named Jack Willium. He had a flight on that day. In the afternoon he was going to New York from Canada. In the middle of the journey, he saw a thing like an aircraft. He thought that it was an aircraft. But it suddenly disappeared. After some time, it appeared again. Then he contacted with the air agency.

He said that there was a thing like an aircraft. But its speed was too much. It was made of Aluminium.
The people of air agency thought it was a U.F.O. The line of the pilot was suddenly cut and a sound was coming from the phone um.....um...um.... It was a sound of an electrical thing. But Jack Willium and his plane were not found yet.

On that day a photographer was taking photo in the afternoon. He saw Jack's plane. In his picture he saw a shadow in the sky. The scientists tried to find out what the thing was in the picture. They found that it was a solid thing. It was not found yet what the thing was.

(Source : Internet)

Unlucky Thirteen

Zulker Nyne (Nabil)
College Roll : 12597
Class : VI-A (Morning)

It was the start of the holiday. Shadab and Nabil were walking home. They attended the same school and they lived next door to each other. So they always walked home from school together.

They talked about many things. They chatted about cricket. They moaned about their homework. They gossiped about the latest movie being shown in town. They talked and walked. In fact they talked so much, even in class, that their teacher often told them to be quiet.

Today they were chatting about the subject of Shadab's pet dog who had a strange name.

'Who gave it its name?' asked Bijoy

'My parents,' replied Shadab. 'It comes into our house everyday, which is very odd,' said Bijoy. 'It licks the rubbish bin. It eats all the left over food. It makes a big mess. When we hear a noise we go to check. But the dog is never there. It does a disappearing act!' 'Yes', said Shadab, 'It's a clever dog and very sly.' 'Is

that why they named it cheat? 'asked Bijoy.

'What?' said Mohan with some astonishment. 'What has its name got to do with its being sly?'

'It's a cheat, which is a funny name for the dog!' replied Bijoy. 'It cheats us every time.'
Nabil laughed out loudly.

'Ha-haha!' cried Shadab, holding his stomach as tears streamed down his face. Shadab said, 'It's called Cheetah not Cheat! My parents named it Cheetah because it runs fast. The dog zoomed around a great speed when it was little. It still does.'

'Oh!', said Nabil. 'I always thought 'Cheat' was a funny name to give a dog.' The boy walked on laughing about the dog's name. Soon they arrived at a tall fence. As they walked along it, they heard voices shouting, 'Thirteen! Thirteen! Thirteen!'
'Did you hear that?', Shadab asked Nabil.

'Do you hear those voices?', asked Shadab, 'Someone is shouting 'Thirteen' over and again.'
'Of course, I can hear that', Nabil said giggling.

The boys stopped to listen. 'I think it's coming from behind that garden wall', said Nabil.
Again the voices floated across to them from behind the wall. 'Thirteen! Thirteen!' Thirteen!' Why are they shouting that number in particular?' asked Shadab softly.

'My brother told me that 'Thirteen' is an unlucky number', whispered Nabil.
'Yes it is', agreed Shadab.
Shadab placed both his plams against the wall, spread his leg wide, and bent his back. Nabil clambered on top of his back. There was one or two grunts for Shadab and an 'ouch' and 'watch it!', but apart from that no damage was done to him. Shadab held the wall too as Nabil climbed and stretched, and very slowly and cautiously stood up. He raised his head over the top. Then there was a whoosh!' and he was on drenched in coloured water. Nabil tumbled on to the ground. Coming from behind the wall Shadab and Nabil hurtled down the road at great speed towards their homes. From behind the wall they could hear someone shouting 'Fourteen! Fourteen! Fourteen! Fourteen!'

Mathematics

Eftee Wasit Hadi
College Roll : 12606
Class : VI-B (Morning)

Mathematics! Mathematics!
Everything is mathematics.
I do mathmatics,
You do mathematics.
Count with mathematics,
Measure with mathmatics.

Draw a picture with some geometry.
Build a building with some geometry.

Geometry! Geometry!
Everything is geometry,
A temple is a triangle;
A building is a rectangle;
My ball is circle,
Its cololur is purple.
A photo frame is square.
Mathematics is everywhere.

Greenhouse Effect

Ishtiak Khan
College Roll : 12605
Class : VI-C (Morning)

The environment we live in influences our life and our way of living . It consists of different elements. Of them, trees are very important. But in the recent years there is massive deforestation. Many countries have little or no forests. Trees are cut down and burnt indiscriminately for agriculture, cooking, burning bricks for making habitats, industrialization etc. Besides, forests are vanishing as a result of bush fire.

Deforestation causes droughts. It causes erosion and landslide too. This ultimately leads to heavy deposit of soil in the river beds resulting floods. Large scale deforestation also forces birds, other animals lose their homes. So this is telling upon our ecological system.

Less trees means more and more co_2. It is warming up the atmosphere due to the people who fell trees. It is known as greenhouse effect.

It is high time we stopped deforestation. International laws must be made so that forests do not disappear any further. More vigilance should be ensured so that bush fires are effectively controlled.

If we cut one tree, we should plant more trees.

We must bear it in mind that if all trees are gone, all living beings on this beautiful planet will surely be extinct.

Giggles

Md. Riazul Hoque Arefin
College Roll : 12582
Class : VI-C (Morning)

Son - Dad, What is an idiot ?
Dad - An idiot is a person who tries to explain his ideas in such a strange and long way that another person who is listening to him can't understand him. Do you understand me?
Son - No.

(2)

Once there were three turtles. One day they decided to go on a picnic. When they got there, they realized they had forgotten the soda. The youngest turtle said he would go home and get it if they wouldn't eat the sandwiches until he got back. A week went by, then a month, finally a year, when the two turtles said, 'Oh! 'come on; let's eat the sandwiches.' Suddenly the little turtle popped up from behind a rock and said, 'If you do, I won't go'

(3)

A- Why are all those people running?
B- They are running a race to get a cup.
A- Who will get the cup?
B- The person who wins.
A- Then why are all the others running?

(4)

If big elephants have big trunks, do small elephants have suitcases?

Stealth Black Hawk

Ragib Ahmed
College Roll : 4164
Class : XI-G (Morning)

Five Secret Military Aircrafts :

Shortly after mid-night on May 1, 2011, two unusual helicopters carrying 25 U.S. Navy. SEALS descended on Osama Bin Laden's compound in Abbottoad, Pakistan. The heavily modified skiers UH-60 Black Hawk helicopters were able to fly 200 km undetected from Afghanistan border with neighbours reporting that they didn't hear the helicopters until they were directly overhead. Their existence might have remained secret, had one of the helicopters not crashed on the wall of the compound. U.S force destroyed the crashed Black Hawk with explosives, but a portion of the tail section survived revealing top secret stealth modifications stemming from a program that had supposedly been discontinued in 2006.

BLACKSTAR :

Black Star is a rumoured suborbital space plane project run by the US Intelligence Agencies in 1980s and 1990s and perhaps continuing today. The project was supposedly designed so the US could retain orbital reconaissance capabilities jeopardized by the 1986 challenging disaster. It was a 2-stage orbital system which used a high-speed aircraft to ferry a small orbital vehicle to the age of space which would get separated and enter orbit 300 miles (480 km) above Earth using a rocket motor. The orbital vehicle would then conduct reconnaissance on materials that could be hidden from the paths of spy satellites.

RQ-180

Funded through the US Air Force's classified budget the Northrop Grumman R-180 is the most advanced unmanned aerial system ever developed and designed for intelligence, surveillance and reconnaissance missions behind enemy lines. The RQ-180 could enter operation by 2015. According to official sources, the RQ-180 will carry active, electronically scanned array radon and passive electronic surveillance measures allowing it to conduct penetrating surveillance previously carried out by the SR -71 Blackbird before its retirement in 1998. Based on the size of new testing hangars at area 51, the RQ-180 could have a wingspan of more than 130 ft (39.6m) and designs of the existing RQ-180 suggest that the RQ-180 can fly far more than 24 hours at altitudes as high as 11 miles (17.7 km).

X-37B

Operated by the U.S. Air force the Boeing X-37B is a robotec space plane designed to test reusable space technologies though its pay load and actual mission remain classified. The craft was originally developed by NASA as the X-40, but it was transferred to the military and became classified in 2004. Launched atop an Atlas 5, the 29 ft (8.8m) long X-37B is able to spend more than a year in orbit before gliding to Earth. Theories bout the X-37B's true purpose include it being a space bomber, a spy plane or an anti satellite weapon. Development of the X37B continues, with Boeing recently converted the former space shuttle hangar at the Kennedy

space center into a servicing facility for an entire fleet of the craft.

AURORA :

The name 'Aurora' first appeared when it was inadvertently included in the 1985 U.S budget as a $455 million allocation in 1987. Claims of its existence are based on observations that the U.S has the technology needed to build such a hypersonic. Aurora is also limbed to unusual sonic booms that were recorded at regular intervals by U.S geological survey sensors across southern California which were later analyzed by NASA experts and showed something at 90,000 ft (27.4km) mooing at Mach 4 to Mach 5.2 with sighting starting in the 1980s continuing today. The remotes may encompass multiple top secret aircraft including many that are yet to be revealed.

(Source : Internet)

A True Friend

Abdullah Al Zaber
College Roll : 5751
Class : VII-A (Day)

Long ago, there were two friends. Their names were Damon and Pythias. They lived near a town called Syracuse. The chief man of this town was called Dion. He was really like a king. In those days, the kings could do anything they wanted. One day Damon said that Dion was a bad man. The chief servant of Dion heard it. He then told this to Dion. Dion became very angry. He said to his men, "Bring Demon before me." They brought Damon before him at once. "You must die. I can't let you live if you think and say that I am a bad man", Dion said to him. Damon was not afraid. He said, "I'm ready to die. But I ask one thing to you. Let me go home first to say good bye to my wife and children. My home is in a village. It's not very far. It's only a few kilometers from here. I'll just see them and then I'll be back again". Dion laughed, "Do you think I am a fool? If I let you go from here, you will never come back", he said. Damon said, "That's not true. I don't want to run away. Pythias will be here with you in my place. He'll stay till I come back. If I don't return, you can kill him. I love my friend like a brother. I'll not let him die in my place. So you should believe me. I must come back". Dion said, "I don't believe a man can help his friend. He can fight for him. He can give him most of his money. But surely he does not give his life for him. Everyone wants to live". Then Pythias got up and spoke. He said, "You should believe Damon. We are friends. We love each other. I'm ready to die for him. If he does not come back, you can kill me in his place. Please let him go to say good-bye to his family". Dion looked at the two friends. He thought for a while. Then he said, "All right! Damon can go to see his family. But he must come back in six hours from now. If he does not come, Pythias shall die in his place". It was enough time for Damon to go home and return in four hours. But four hours went by and still Damon was not back. The fifth hour came and went, but Damon did not return. Then came the sixth hour. Everybody said, "Is Damon coming

back"? But last hour ended, Damon was not yet back. Pythias was brought before Dion. "Look, young man! I'm right. Damon will never come back. He only wanted to run away. Now you must die in his place". "I'm not afraid of death. I must die in his place. But you are wrong. He is only late. He must come back," said Pythias. Dion said, 'Okay, I'll wait for two more hours for him.' Two hours passed. Damon was not yet back. So Dion sent his servants to bring Pythias to him. 'I can't wait any longer,' he said to Pythias, 'So get ready to die now. 'Just at that time Damon came in. His hair and clothes were dirty and he looked very tired. He came to his friend and said, 'I'm sorry that I am late. But I am glad that I am not too late. I couldn't come in time because my horse died on the way. I said good-bye to my family. Now I am ready to give my life". But Pythias did not want to change places. 'No, Damon,' he cried, "I can't let you die. You must not give up your life. If you die, your wife and children will be helpless. I've got no wife and no one needs my help. So it is better for me to die. Let me die in your place". Dion sat and listened to them. At last he jumped and shouted, 'Stop! I can't stay here any longer. You'll both live. No one shall die. I know that there are men who are ready to give up their lives for their friends. I know also that it is better to have a true friend than to have all the gold in the world.' (Source : English By Stages)

Mystery In The Pyramid

Md. Muhaiminul Islam
College Roll : 6037
Class : VII-A (Day)

Jhon Kelly, my all time travelling companion, was sitting in the temporary shed house we made in Egypt. I was reading a book but due to humidity and heat of Egypt, I was not able to do it. And Kelly was sitting in there studying the scarlet stone we found below the river Nile. So, a special light was alight in the room, and I was having trouble to read books in there. Suddenly Jhon shouted, 'Ureka!'

I went to ask him,'What's all that commotion?'

He looked in my eyes and said, 'We have found the mystery in the historical stone.'

'We! What is it?' I asked with curious eyes.

We got in the pyramid; it was all dark. Then Jhon gave me a torch.

He started pulling and pushing bricks and ropes and the wall trembled a bit.

'What was that?' was my question in horrified voice.

A door opened and a huge number of rubies, emeralds, gold, crystal, diamonds and scrolls, were revealed.'

John Kelly smiled and said, 'There you go! The treasures of the lost world.'

'What's with the scrolls?'

'The hidden scrolls from the library of Alexendria'.

'Wow!' I exclaimed.

The whole treasure were divided among Cairo, Lauvre and other meuseums. We got the money and we travelled round the world, with money.

Kelly told me that he was working on a book on Egypt, and I am not sure, will the publisher publish his book? His hand-writing is very bad. (Source : Internet)

Spacecraft and Space Exploration

Md. Tawfiquer Rahman Alvee
College Roll : 9670
Class : V-A (Day)

1) Spacecraft: Spacecraft were launched in the late 1950s. They were two types: Salellites and Probes. Satellites go into the orbit and round the Earth. Probes zoom away from Earth to explore other planets. These first spacecrafts had no crew.

All Spacecrafts leave Earth in the same way. They are thrusted into space by huge, powerful ROCKETS. The rockets are in three parts or stages. As one stage runs out of fuel, it falls away and the next stage fires. When all three stages have gone, the spacecraft speeds through space on its own.

Satellites and measuring instruments, cameras, tape recorders and radio transmitters, all these equipments run on solar electricity. The collected information is radioed back to Earth, where scientists study it.

2) Space Exploration: The space age began in 1957 when the soviets launched first artificial satellites. In 1961 came the first manned flight, and only eight years later astronauts were exploring the surface of the moon.

People had long dreamed of escaping the Earth's gravity and flying in space. It was the multi-stage rocket developed in Germany during World War II, that made space flight possible. The Soviets and Americans dominated the early years of space explorations. But Europe has its own space rocket, and other countries such as China and India have also launched satellites.

Americans call their space travellers 'astronauts', while the Soviets call their space travellers 'cosmonauts'. The Americans were the first to build a reusable shuttle, but the Soviets have made much longer flights in their orbital space stations. These flights will show if human travellers can ever voyage to Jupiter. Unmanned spacecraft robot 'Curiosity' has already landed on Mars and sent and are also now sending information and signals back from Mars.

Some Space Pioneers :

1) Konstantin Isioldovsky
2) Robert H. Goddard
3) Wernher Von Braun
4) Sergei Korolyev
5) Yursi Gagarin
6) John Glenn
7) Valentina Tereshkova
8) Neil Armstrong

(Source : Internet)

The Black Magic

Ruposh Rabbi Khan
College Roll : 5774
Class : VII-A (Day)

1. There was a boy named Sagar. He lived in the Chittagong Cily of Bangladesh. He had two friends Sumon and Sohel. They all were the students of a college in Chittagong.

After finishing college Sagar, Sumon and Sohel went to the Dhaka city to be admitted into Dhaka University. There at first they attended the admission test. After a few weeks the results came out. It was seen that only Sohel got the chance. So he got himself admitted into the university. Sagar and Sumon felt a bit depressed. They came back to Chittagong as there were no relatives or friends there. Sohel had to live there in the hostel.

His days were going well. He had a lot of new friends there.

A few years passed by.

2. One day Sohel went to the University library for searching an interesting book. After searching a bit he got a book named 'The Blackmagic' on the shelf No. 27. The book was too worn. He opened the book and looked inside. He was surprised to see that there was a writer's name in the book. He found the book very interesting. So, he took that book to read at the hostel.

On that very day Sohel opened the book at 12:30 am.; he found many rules for Blackmagic. Suddenly he got a script separated from the book. When he looked at that script, he saw many weird drawings and writings he couldn't understood. After some time, he heard the sound of someone's footsteps. He checked outside his door and windows. But there was none. Sohel was very brave. He didn't care about the sound he heard.

Suddenly he noticed that the sun was shining. Then he looked at the clock. It was 11 am. It was very strange. Sohel thought it was a mistake of his mind.

Sohel had a bad feling about that book. So, he went to the library and returned that book. But he did't return the script that he got inside the book.

At night Sohel again opened that script and tried to understand something. He again heard the sound of footsteps. This time it was closer than before. He was very scared. He couldn't understand what was happening around him. He couldn't sleep at that night properly. He heard that sound of footsteps all the night.

Sohel then understood whatever was happening to him was because of that script; so he again went to the library for returning the script. It was very strange that he didn't get that book anywhere in the library. Even the library man could not tell him anything about that book. Sohel was very tensed because of this. At last he decided to tear that script. So, he tore that page and threw it into the dustbin.

3. Sohel regularly took down notes on his daily work and activities in his personal diary. When he opened his diary, he became totally shocked at seeing that all the works and activities done by him were already noted in

his diary by his own hand writing. Even the page that he got from the book was also noted in his diary. He became very scared; he was very worried because of all these.

Sohel went to bed. He couldn't sleep well. At the midnight he felt that he had come to another place. The environment changed. When he opened his eyes, suddenly a shadow like person came in front of him. Sohel became very scared. He tried to shout loudly. But he couldn't; suddenly the shadow started to talk. He said 'You tore the script, right?' Shoel said 'How do you know that?' Then the shadow man laughed loudly and said 'I know everything and for this you have to suffer a lot of punishment. From today you will see me every time at every place in front of you. And the time when you will not see me, you have to die'. Sohel screamed and tried to say something. Suddenly the shadow vanished. Sohel became very scared.

From the next day Sohel had a hard fever. He was becoming weak. He started to see that shadow-man every time at every place.

Day Night

Md. Sameer Chowdhury
College Roll : 12961
Class : VII-A (Morning)

The sun shines
Above our eyes
There are blue skies
We feel very nice.

There are hills and mountains
Rivers, seas and fountains,
There is green land
Even some golden sand.

When it almost gets dark
Green grass on the park,
The wind blows
Even the river flows.

There is moonlight
In the dark night,
There are reflections in rivers
By the cold, our body shivers.

Fantastic Facts

Aryan Andaleeb Azim
College Roll : 5757
Class : VII-A (Day)

Weather Extremes!

The sunniest place of the world :
The Eastern Sahara, with sunshine over 90% of all daylight hours.

The windiest place of the world :
Port Martin in Antarctica, with mean wind speeds of up to 65 mph.

The coldest place of the world :
Vostok, Antarctica where average temperature is -72° F.

The hottest place of the world :
Dallol in Ethiopia where average temperature is 93° F.

The driest place of the world :
The Atacama Desert in Chile of North America with an annual average of just 0.02 inch of rain.

The rainiest place of the world :
Mount Wai-ale Ale in Hawaii with up to 350 rainy days in a year.
(Source : Internet)

A Trip to Dinajpur's Ramsagar

Mirza Tanvir Mahtab
College Roll : 11536
Class : VIII-A (Morning)

It was April, 2013. It was a vacation in our school and summer vacation in other schools. So, I and few of my cousins decided to spend the whole vacation with great enjoyment by visiting some beautiful and interesting places. We all decided to go to Dinajpur Ramsagar with family members. Dinajpur Ramsagar is a big lake with lots of beautiful surroundings which is also a picnic spot. Our parents gave as green signal and we started taking preparations to visit this beautiful place. My uncle and my father hired two microbuses for us and also did all arrangements and booked three rooms in a hotel there. Then it was 10th April, 2013. Our arrangements were all okay; we were ready for the journey. At 7 o' clock the two buses came to take us. In one microbus all of our cousins, my uncle and father got and in other microbus my aunts, my mother took their seats. The journey began at 7:30 am after checking all the things in the microbuses. During our journey we sang songs. I recited a Bengali and an English poem and also played chess with my cousins and my father. We also took some pictures of the green view beside the road. We also did other funny things during the journey. While we reached Tangail, we took some light foods and drinks from a shop. We saw some handmade sarees and cloths in a renowned market of Tangail. Tangail sarees have a huge demand and reputation in the world market. A huge amount of foreign currency is earned through it. We shared some funny jokes and stories also during the journey and laughed a lot.

On Reaching Bogra :

At a beautiful hotel called 'Food Village' our two microbuses took a halt for some time. We all ate lots of foods including some delicious dainties of Bogra district and had some drinks. Among the foods I liked the sweet curd of Bogra, 'Prashiddha'. It was superbly delicious. After finishing our lunch in the 'Food Village,' our journey began for Ramsagar again.

At Dinajpur's Ramsagar :

We reached Dinajpur at 3:30 pm. We all got out from the microbuses. My uncle took a picture of the whole surroundings of the Ramsagar's garden. There were beautiful flowers and some uncommon trees in the garden. The drivers took out our luggages from the car, thanked us and drove away. The hotel boys carried our luggages to the hotel rooms. The hotel was neat and clean and the rooms were much wide. The overview of the surroundings of the Ramsagar from the hotel was truly amazing. The front side of the room was covered with glasses. Thai glasses which are protective from sunburn were attached at the windows. We visited a small museum of Ramsagar in the evening and also learnt some stories of the Ramsagar. There is a history that the king of this place was very worried about this area. There was water scarcity in the area and people were not finding any water even after deep digging. By digging and digging they built almost a big lake. But there was no sign of water. Then in one night the king dreamt that if any beautiful girl was sacrificed in this lake there would be a big

flow of water and there would be no scarcity of water. Follwing this dream, the king did the sacrifice accordingly. And some people believe that there are demons and monsters in the lake. Some lost their lives. But it is nothing but a superstition of the native people. In this age of science and technology there is no story like this. However, as it became almost evening, we returned to the hotel. Dinner was served. After dinner we all went back to sleep. At night while in bed we told many stories and jokes almost till dawn. We had lots of fun. I just slept for only 3 hours that night. I will remember the night all my life. Next day we visited Ramsagar. We got on the boat and sailed about the whole Ramsagar half of the day. My uncle took some pictures of mine with my cousins during rowing the boat. My uncle told his story about his college life. During his college life he visited Ramsagar with his friends several times. He even participated in swimming contest in the Ramsagar. It was so difficult. From one side of the lake to the other side the swimming contest was held. Uncle could win but from the middle of Ramsagar he gave up swimming, because it was too difficult to cross the lake. However, we also swam in Ramsagar. We visited the picnic spot of the Ramsagar the other day. We played games and sports during the visit of Ramsagar. We stayed for four days there. The view of the sunset from the lake shore of the beautiful Ramsagar was remarkable. It was really fascinating. I have a picture of that too. I will miss that scene very much. Also the time I spent with my parents, uncle, cousins will be ever fresh in my mind for the whole life. That was an amazing trip in my school life.

By His Side

Shuvashis Sarker
College Roll : 5269
Class : VIII-B (Day)

Why do I remember most my grandfather
Who hardly spoke a word to me unnecessarily.
You count a chortle of delight
As he revealed his peppermint stash,
His hum while shucking corn
To show the Juicy pearls,
The patient click of his tongue
As he removed my corncrib splinter
I never dreamed.
I would forget my grand father's cndless
Litanies of recipes, patterns and chickens,
Cannigjarn and sassa fras root,
The proper way to turn a hem
How a lady acts in chruon.
Again and again,
My mind settles by his silent side,
The same way
I see an empty church for prayer.

Beyond

Syed Muhaimeen
College Roll : 4908
Class : IX-F (Day)

Do you know?

- Scientists have estimated that smoking 1 cigarette takes 11 minutes?
- 20 takes 3 hours and 40 minutes and a carton takes 1.5 days of your life.

- Studies have shown that, on an average, optimists live 19% longer than pessimists.
- Eating bananas is a natural cure to reduce the effects of stress and anxiety.
- The observable universe is about 94 billion light years in diameter.
- You can only remember 4 things at a time.
- There are 7 different ways in which 'ough' can be pronounced - Rough, dough, plough, Scarborough, slough, coughed and hiccoughed.
- The shortest novel ever written by an Italian named Umberto contains only 7 words. The novel is 'El Dinosaur.' The translation is some what llike 'When he woke up, the dinosaur was still there.'

My Choice

Ayon Al-Ashrafi
College Roll : 14124
Class : IX-A (Morning)

I love my mother
I love my father
I love my country
I love our history.
I love my house.
I love my school
I love my religion.
I live our culture.
But,
I hate lies.
I hate evils.
I hate them
Who just think about themselves.

My Tour to Nepal

Syed Saad Alam
College Roll : 4912
Class : IX-F (Day)

Travelling which means to go from one place to another is an excellent way to enjoy our free time. It can help us to relieve from our monotony and dullness of life. So, we travelled to Nepal, the land of hills and mountains.

Our Junior School Certificate (JSC) Examination was over, we had a free month. My father thought that we should utilize this time in doing something funny, exciting, thrilling and educative. I proposed to my father that we should visit a place or a country. Then my father started making arrangements to go to Nepal. We were all excited and thrilled when my father brought four tickets of Biman Bangladesh Airlines on 22nd December.

Our flight was on the 23rd of December, at 2:30 p.m. We reached Hazrat Shahjalal International Airport at 12: 00 pm with our luggage. After carrying out the necessary airport formalities, we were waiting in the lounge and visited the shops in the airport. We finally boarded the plane BG 701 of Biman Bangladesh Airlines at 2: 00 pm. The plane finally took off at 2. 30 pm. While we were in the air, the landscape started to become quite microscopic. After an hour, at 3:45 local time (of Nepal), we reached the Tribhuvan International Airports, Kathmandu, Nepal. From the ailrport, we went to the

Kathmandu Prince Hotel which was situated in the Thamel area of Kathmandu. After taking some rest, we started travelling around the city.

Kathmandu, which is the capital of Nepal is a very beautiful city. There are many shops full of foods and clothes. There are also outlets of KFC and Pizza Hut. Everything is of good quality there. We visited the shops and malls there. An important benefit in Kathmandu is that there are shops and restaurants selling halal food. We had our lunch and dinner at the Anatolia Restaurant, a renowned restaurant for Halal food. There were many delicious mouth-watering items such as polao, biriyani, chicken, mutton, etc. Among clothes, the clothes made of yak wool were in great demand. They were quite expensive as well. There are also many jewellery shops in Nepal. The Nepalese capital is famous for its attractive temples and palaces. On the outskirts of Kathmandu, in Bhaktpur, we went to an ancient royal city. There are palaces and attractive houses and temples. We were fascinated and amazed seeing the quantity and quality of the earthen and wooden artistic works done on the gates, doors and windows of the palaces and temples.

About 20 kilometres west of Bhaktpur, there is a hilly area named Nagarkot. It is famous for its scenery of sunset. From Nagarkot, a clear view of the Himalayas can be seen. The Himalayas is the main attraction of Nepal. Besides, Nepal is a green country. There are many timber-giving trees on the hills. On the third day, we visited the Royal palace in Kathmandu. It is now a museum. Inside the museum, there are the oil paintings of the kings, queens and royal guests of Nepal. Besides, we also visited the killing spot of king Birendra Bir Bikram Shahdev and his family which has been preserved by the Nepalese to mourn their leader's death. This filled our hearts with grief.

After staying for about four days in Kathmandu, we went to Pokhara, another lovely place in Nepal. Though Kathmandu is much more modern than Pokhara, Pokhara has many natural beauties. The chilly atmosphere and the greeneries thrilled us. The city of Pokhara is situated just at the foot of the Himalayas. We stayed at the Pokhara Hotel in Pokhara. The next day we went to Sarangkot, a hilly area in Pokhara which is famous for its scenery of sunrise. However, we were unlucky as it was a quite cloudy day and we could not see the sunrise clearly. However, from there, we got a wonderful view of the Himalayas. When sunlight falls on the snow of the mountains, the color of the snow turns orange. This creates a wonderful view. In Pokhara, there are also many shops of food and clothes. We also found a food shop offering halal food. The owner of this shop is a man named Ahdullah, a converted Muslilm. He also knew fluent Bangla, as he lived in Kolkata, India. He became a Muslim by staying in Saudi Arabia for 15 years. We were fascinated by hearing his ups and downs of life. The shops of clothes are mainly owned by Indian Kashmiri Muslims who sell Kashmiri products. The quality of their product is very good but they are very expensive. After staying for 2 days in Pokhara, we returned to Kathmandu. The next day we returned to Bangladesh.

The people, nature, climate, atmosphere of Nepal amazed me. My travel to Nepal is actually something I can never forget and it will always be borne in the core of my heart.

Common Misconceptions

Rahul Saha
College Roll : 4927
Class : IX- F (Day)

Not everything that you hear around is true. On the contrary, many wrong ideas based on unscientific beliefs spread everywhere. Let's see how you do in the following exam:

1) Why do seasons change? More importantly, why does summer occur?
2) Are bulls really enraged by the colour 'red'?
3) Can bats see?
4) Is Rubik's cube solved using maths?
5) How long do goldfish remember things?

How did you do? Do you know that most people get around one or two answers correct. Read on to know how well you have done in the test.

Ans 1: Many people believe that proximity to the sun causes seasonal change. But the earth is the farthest from the sun during the summer. Seasonal changes are caused by the earth's axial tilt. When sunlight falls perpendicularly on a region, that part experiences summer season.

Ans 2: Bulls do not hate the colour 'red'. As they are dichromals they cannot see 'red' very brightly. Actually, when a person moves the cap, the bull feels that a danger is awating and gets enraged.

Ans 3: Contrary to popular belilef, bats cannot see. But they mostly use ears to visualize their surroundings.

Ans 4 : Generally no. While group theory can be used to explain the cube, one does not use maths to solve the cube.

Ans 5 : If your answer is within 5-15 seconds, you are wrong. Ha! Goldfish actually have a memory span of two months.

A Tourist

Md. Muntasir Islam
College Roll : 11099
Class IX-F (Morning)

Awoke the sun yawning from its sleep
Refreshed by the surrounding green,
The bushes , the trees, their trunks too green,
Covered by moss and filled with fern,
The air filtered greenly through the leaves ,
The mountains lean towards the crystal clear sky;
An ocean sky!
The water washed over the rocks
As they shredded a feminine grace over the estuary
The stream with a rippling symphony of water
Flowed down the uneven pathway!
The heavenly beauty of paradise-
Blinded me with relief and pleasure.
That which could not be captured
For even a fraction of a moment.
Not as a tourist,
I couldn't.
As I turned around,
A goat frolicked, leaped and swifted past me!
Followed by a young girl,
With a smile as if heaven on earth
Could be seen.
As I walked I heard a melody,
The sound of a magical flute!

As I'd never heard before! I roamed in quest of the origin,
But failed to discover its source.
Rather only finding the beauty of the greenery
As before.
As I stumbled into the village,
The bustle and restlessness
Of the wood astounded me
So much that I could not even fathom
Their cheerfulness or smile!
Such Unity!
Such Inspiration!
Could hardly be caught on camera,
The mountains, not a stone's throw,
Soared up and up with pride.
As I could no longer get impressed
By the pure magical surroundings aside.
with a flutter in my heart
And eyes full of wonder!
I set out once more into the far distance
In a land not forlorn

The Grandeur of English

Shurid Rahman
Collage No : 14414
Class : XI- G (Morning)

English is the leading international language and more than 99 million people all over the world speak and use this language in their daily life. This shows that English has taken a firm root in most of the countries in the world. It is a widely used and well accepted medium of international communication. The use for English is a must and now-a-days in Bangladesh it has become really important for all the people to use as well as to understand it. Recently most of the conferences, international meetings, school debates or contests are held in English. To enjoy and take part in these events we must know English. Even if we want to study abroad we must know English. Many books and journals cannot be translated into our mother tongue; so most of the courses of medicine, engineering and other higher studies are conducted in English. Needless to say that the world of today runs on technology and everything in technology is in English. Moreover it has become a compulsory subject in all educational institutions in Bangladesh. Having a sound knowledge in English can give us good opportunities to get jobs at home and abroad. Every job requires English. Again, to use a computer, internet, fax, email, etc. English is a must. In short, the importance of English in Bangladesh is overwhelming for all of us. So it can be concluded that there is a vast importance of English not only in Bangladesh but also all over the world to make us succeed in every sector of life.

Riddles :

John : What do you call a sleeping bull ?
Jack : A BULL DOZER
John : What is the smallest room in the world?
Jack : A MUSHROOM
John : How do you tame a lion ?
Jack : WHEN IT IS A DANDE LION.
John : Now tell me what it is that can speak in different languages but has no mouth ?
Jack : I know : A BOOK.
John : Now tell me what has no wings but flies to different countries ?
Jack : I know, I know: LETTERS.

Raise Your Hand

Ashfak Rakin
College Roll : 14409
Class : XI-G (Morning)

Raise your hand
To protect the environment
Raise your hand
To save children
Raise your hand
Instead of poverty
Raise your hand
To be wealthy.
Raise your hand
For the poor for caring
Raise your hand
For the patient for saving
Raise your hand
To see a free sky
As well as a
Mind which can freely fly
Raise your hand
To see the Bengal-beauty.

Can We Make It The Other Way?

Md. Ferdaus Al Habib
College Roll : 14374
Class : XI-G (Morning)

Education is the backbone of a nation. It is also one of the most important fundamental human rights. Real education mostly depends on proper education system. Our education system is defective and the discrimination begins from primary stage up to graduation. Firstly, if we think of primary education there are three types of institutions in Bangladesh. They are general schools, madrasas and English medium schools. The students of general schools are normal people. Madrasa students are a special part of community and English mediums are teaching the richest students in the society. They consume all the modern amenities of life. But there is no co-ordination among these three types of institutions. Thus Secondary School Certificate exam is completed in three distinct syllabuses in our country.

After SSC, students have to compete to get themselves admitted into a good institution. On the other hand, in HSC level, the pattern of syllabus and course curriculum are more diverse. In govt. colleges, abhorable student politics affects many innocent students. However, a large number of students pass HSC at an increasing rate of GPA-5. But, if we look at graduation level, the situation is more terrible. Public govt. universities are not adequate in number because govt. cannot afford to open and maintain a large number of public universities.

Session jam is also another common problem with public universities. Besides, they remain closed most of the time for dirty politics. The most mentionable causes are student politics, corrupt and irresponsible authority. Teachers get involved in other jobs instead of their prime duty. Can we get out of these seemingly never-ending peskies of our educational life?

My Beautiful College

Sanad Mirza
College Roll : 11184
Class : XI-G (Morning)

O! my college
You give me so much
But in return my hands are empty
Thou indeed are kind.

Your beauty makes my heart kindle
Your vast field gives me power
My love for you is immense
But your love for me is forever.

Your history makes me proud,
That I am part of it is my pride
I will never forget you
Though I have to leave you.
That thought brings tears in my heart.
Tears are gold, melting from my soul.

You teach me so much
I couldn't learn
Still you make me fit for my life
O! my college
I will return, I will make you proud.

Scary Shadows

Tariq Bin Ahmed
College Roll : 7207
Class : XII - C (Day)

My shadow on a sunny day
When standing clear of any tree
Starts at my feet and makes a shape
Of black that looks a bit like me.
But when it's dark, a table lamp
Will cast a shadow on the wall.
And down the hall the shape it forms
Will hardly look like me at all.
The shadow from a light close -by
Creates a kind of monster-shape
That slithers round the walls and doors
Like vampires in their long black cloaks.
When lights are dim the shapes look weird.
We conjure-up all kinds of gloom.
There are no monsters,vampires, ghosts
It's just the shadows in the room.

Very Easy & Hard

Heaven Chowdhury
College Roll : 7258
Class : XII-A (Day)

Very hard to say 'yes'
Very easy to say 'no'.
Very easy to take a promise
Very hard to keep the promise,
Very easy to say 'sorry'
Very hard to forgive everybody.
Very easy to spend money
Very hard to earn money
Very easy to hate each-other
Very hard to love everyone,
Very easy to tell a lie
Very hard to tell the truth.

স্মৃতির এ্যালবাম

স্মৃতির অ্যালবাম

বোর্ড অব গভর্নরস এর সভাপতি মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ

বোর্ড অব বোর্ড অব গভর্নরস এর সভা

কলেজ পরিদর্শনরত সভাপতি মহোদয়

সভাপতির মহোদয়ের সঙ্গে বোর্ড অব গভর্নরস এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বিদায়ী শিক্ষক প্রতিনিধিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সভাপতি মহোদয়

অধ্যক্ষ কর্তৃক বিদায়ী অধ্যক্ষকে ক্রেস্ট প্রদান

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৩ এ সালাম গ্রহণ করছেন
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

বিদায়ী এবং নবাগত অধ্যক্ষ সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন অত্র কলেজের প্রাক্তন
ছাত্র এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতীক এর হাতে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ও সংস্কৃতি সপ্তাহ-২০১৩ তে বিজয়ী
ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের সহধর্মিণী

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অধ্যক্ষের আগমন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অধ্যক্ষ পত্নীকে ফুলেল শুভেচ্ছা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মশাল প্রজ্জ্বলন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কুচকাওয়াজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যান্ড ডিসপ্লে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ লম্ফ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার হার্ডেলস রেস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বস্তা দৌড়ের দৃশ্য

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ডিসপ্লের একটি মুহূর্ত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মানবসৃষ্ট স্মৃতিসৌধের দৃশ্য

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোরিওগ্রাফি ডিসপ্লে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফ

যেমন খুশি তেমন সাজো (সিনিয়র হাউস)

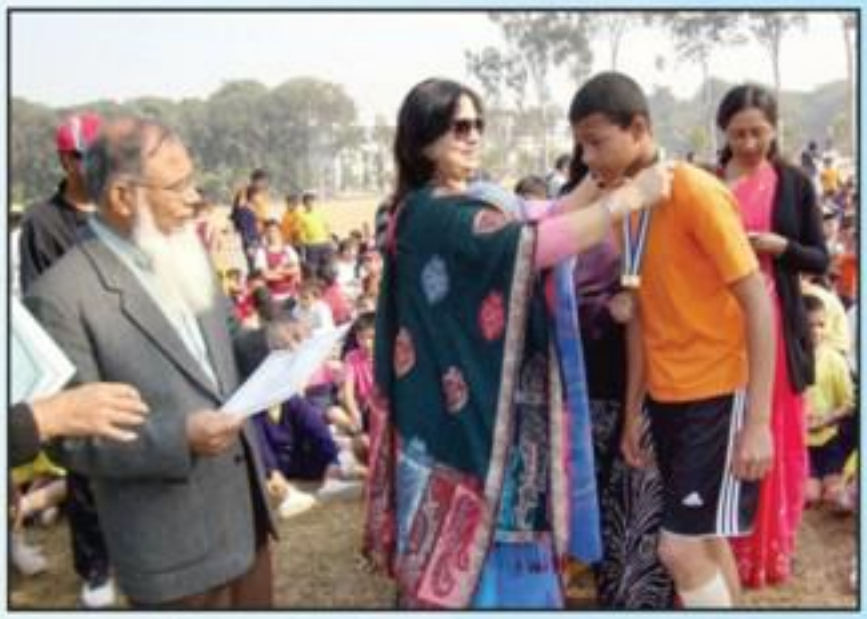

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানে অধ্যক্ষ পত্নী

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৪ এ সমবেত সংগীত

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৪ এ কোরিওগ্রাফি ডিসপ্লে

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ এ চ্যাম্পিয়ন কুদরত-ই খুদা হাউসের পুরস্কার গ্রহণ

আন্তঃ কলেজ বিজ্ঞান মেলায় কৃতী শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান

বিজ্ঞান মেলায় এ কলেজের ক্ষুদে বিজ্ঞানীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আলী আজগর

স্মৃতির অ্যালবাম

প্রভাতফেরী (জুনিয়র হাউস)

শহিদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় জ্বালানী ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ও এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র নসরুল হামিদ এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ

প্রাক্তন শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে নতুন বই গ্রহণ করছে শিক্ষার্থী

বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবকে সম্মাননা প্রদান

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

স্মৃতির অ্যালবাম

আরডিএস এর সদস্যদের সঙ্গে আহ্বায়ক

ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে কলেজ ক্যাম্পাসে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি

ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন নজরুল ইসলাম হাউস

KOICA কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান

জাতীয় হ্যান্ডবলে রানার্স-আপ দল

কলেজ লাইব্রেরিতে পাঠমগ্ন শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্মৃতির অ্যালবাম

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে অনুশীলনরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

রসায়নবিজ্ঞান ল্যাবে অনুশীলনরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

কৃষিশিক্ষা ব্যবহারিক ক্লাসে কর্মব্যস্ত ছাত্ররা

নৈশপাঠ ক্লাসে পাঠ তদারকি করছেন উপাধ্যক্ষ (সিনিয়র)

জুনিয়র হাউস ডরমেটরিতে নৈশপাঠরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

হাউসে ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলনরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীকে মেডেল প্রদান

বিদায়ী শিক্ষকদের সম্মাননা

বিদায়ী শিক্ষককে সম্মাননা

বিদায়ী কর্মচারীকে সম্মাননা

বিদায়ী কর্মচারীকে সম্মাননা

অবসর গ্রহণের পর চূড়ান্ত পাওনা হস্তান্তর

স্মৃতির অ্যালবাম

পহেলা বৈশাখ মেলা উদ্‌যাপন

বায়োলজি স্মার্ট ল্যাব

বাংলা বর্ষবরণ উদ্‌যাপন

বৈশাখী মেলায় ক্যাম্পাসে ক্ষুদে শিক্ষার্থীবৃন্দ

এ কলেজের কৃতি ছাত্র মার্কস অলরাউন্ডার এর হাতে ল্যাপটপ হস্তান্তর

রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

স্মৃতির অ্যালবাম

২০১৫ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের সমাপনী সমাবেশ

আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা

অত্র কলেজে তায়কান্দো প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

তায়কান্দো প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ডিসপ্লে

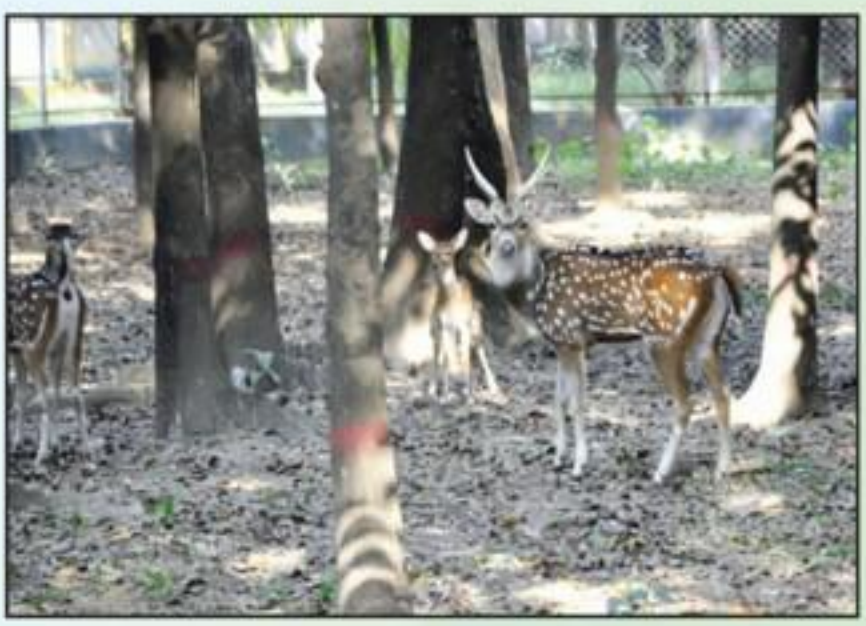

কলেজের অভয়ারন্যে মৃগ ও মৃগশাবক

আর্ট গ্যালারি

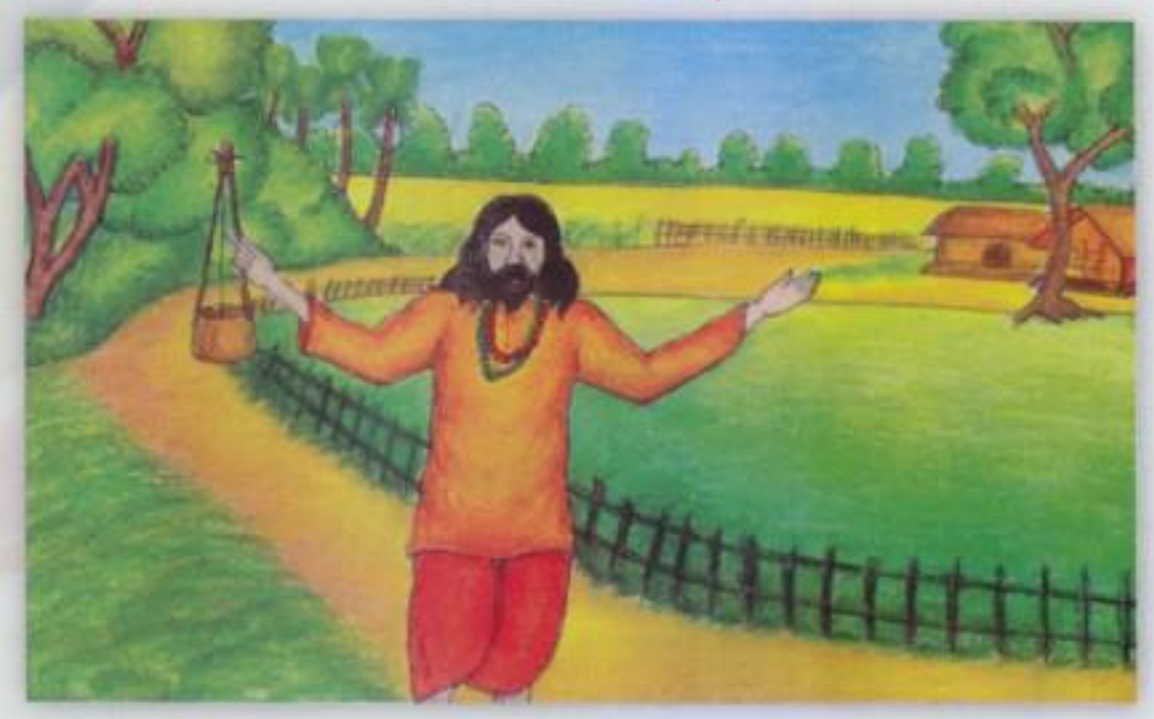

আবরার আল মুনতাকিম রাফি
কলেজ নং : ৮০৯৭, শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : ডি (দিবা)

মোঃ আবু সায়েম
কলেজ নং : ৮০৪৭, শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : সি, (দিবা)

অভিরুপ সরকার
কলেজ নং : ৮০৯৯, শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : এ (দিবা)

আর্ট গ্যালারি

তৌফিক ইফতেখার
কলেজ নং :৭৪৬১, শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : এ (দিবা)

জুনাইদ আহমেদ দেওয়ান
কলেজ নং : ৭০০৫, শ্রেণি : পঞ্চম
শাখা : খ (দিবা)

শেখ ফাহমিদুল ইসলাম প্রমিত
কলেজ নং : ৭৫৩৯, শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : বি (দিবা)

আর্ট গ্যালারি

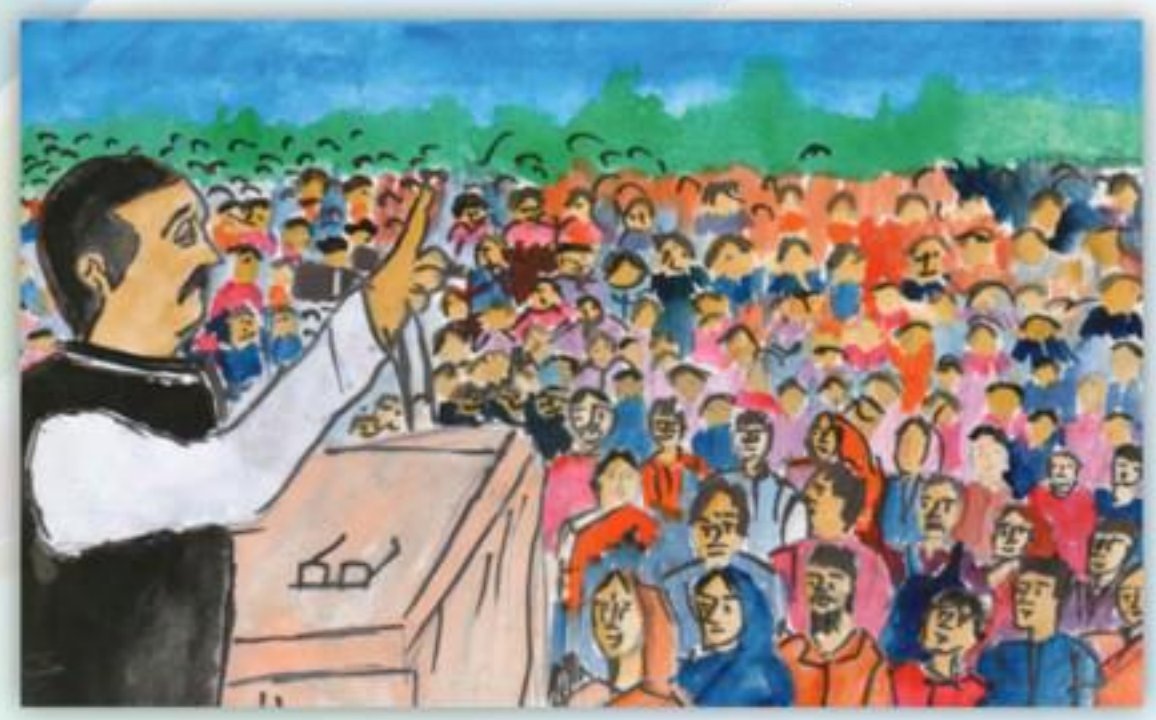

মেহেদী হাসান
কলেজ নং : ১১৪৫২, শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : সি (প্রভাতী)

তামীম আহসান জামান
কলেজ নং : ৬৯৯৬, শ্রেণি : পঞ্চম
শাখা : সি (দিবা)

নাবিল ফারুক (রাফিন)
কলেজ নং : ৬৫০৩, শ্রেণি : ষষ্ঠ
শাখা : বি (দিবা)

কোলাজ

গণিত শেখার, স্বপ্ন দেখার উৎসব

বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়

উৎসবমুখর পরিবেশে চূড়ান্ত আসর শুরু

মজার পরীক্ষা ভাষা প্রতিযোগ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়ালে উল্লাসের ঢেউ

Students of the city's Residential Model School and College rejoicing on the campus on Thursday as the school has secured 4th place in SSC examination under Dhaka Board. ■ NN photo

কোলাজ

সমকাল
রোববার
৮ জুন ২০১৪ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ চ্যাম্পিয়ন

চাই বিজ্ঞানমনস্ক বাংলাদেশ

বিএফএফ-সমকাল
২য় জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ইনকিলাব
ঢাকা, ১৮ মে ২০১৪, রোববার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

ঢাকা বোর্ডে সেরা ২০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার ২৭ বৈশাখ ১৪২১
১০ মে ২০১৪

প্রথম আলো
শনিবার, ৬ এপ্রিল ২০১৩

ভাষা প্রতিযোগ

বাংলা শেখা-জানার দৃপ্ত অঙ্গীকার

বোর্ডে চতুর্থ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭